CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

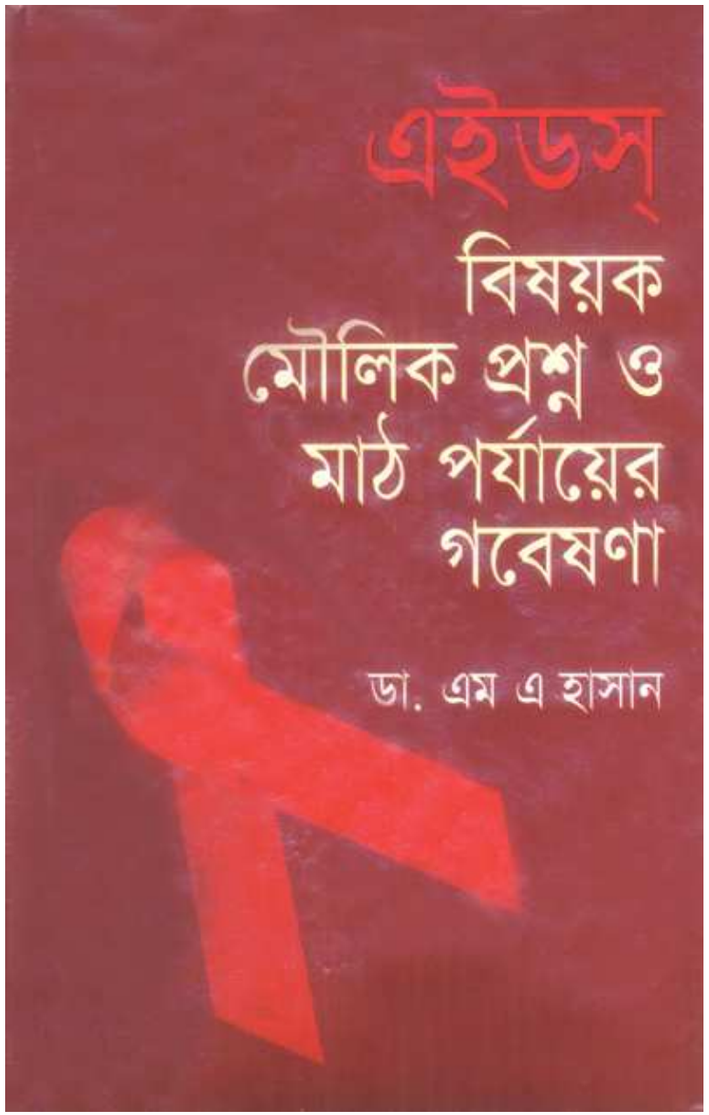
এইডস্
বিষয়ক
মৌলিক প্রশ্ন ও
মাঠ পর্যায়ের
গবেষণা
ডা. এম এ হাসান

এইডস্ বিষয়ক মৌলিক প্রশ্ন
ও
মাঠ পর্যায়ের গবেষণা

"Basic Questions on AIDS & Field Level Research"

ডা. এম এ হাসান

সময় প্রকাশন

এইডস্ বিষয়ক মৌলিক প্রশ্ন ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণা
ডা. এম এ হাসান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৭

সময় ৫৭৯
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা মাত্র

AIDS BISHAYK MOULIK PROSHNO O MATH PORJAYER GOBESHENA (Basic Question on AIDS & Field Level Research) by Dr. M A Hasan. First Published Book Fair 2007 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.comE-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 175.00 Only

উৎসর্গ

আমার বাবা ডা. এম এ সিকদারকে- যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় নানা বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগের কথা বার বার বলে গেছেন এবং আমার জীবনে অন্তহীন প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছেন।

লেখকের কথা

১৯৯৯-এ দেশের মাটিতে আমি এইডস সংক্রান্ত যে গবেষণা শুরু করি তা নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে ২০০৪ সন পর্যন্ত চালিয়ে যাই। এই সময়ে দেশে দেশে এইডস সংক্রান্ত নানা গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত হই। সার্বিক গবেষণায় এইডস রোগের জন্য সাশ্রয়ী চিকিৎসা এবং এইডস প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি নজর দেই। দারিদ্র পীড়িত বিশ্বে এইডস মহামারিরোধের জন্য নানা ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে উপযোগী মনে করে দেশের যৌনকর্মীদের আচরণ এবং এইডস রোগের কো-ফ্যাক্টরগুলো নানাভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করি। সেই সাথে চেষ্টা করি এইডস এর উদ্ভব এবং এর বিস্তারের বিষয়টি উদ্ঘাটনের জন্য। সীমিত অর্থ ও জনবল নিয়ে এই কাজ সম্পাদন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তবুও নিজেকে নিঃশেষ করে কাজটি শেষ করতে চেয়েছি।

প্রাথমিকভাবে এই গবেষণাকে নির্ভর করেই একটি গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নিই। পরবর্তীতে এইডস সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তরগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপনের তাগিদ অনুভব করি। এই গ্রন্থে এন্টিরোট্রোভাইরাল থেরাপি তৈরির কৌশলটি আলোচনায় এনেছি ভবিষ্যতের গবেষকদের যথাযথ অনুপ্রেরণা বাড়াবার জন্য। বইটি লেখা শুরু করি ২০০২ সালে, শেষ করি ২০০৪ সালে। আমার শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে বইটি যথা সময়ে প্রকাশ করা যায়নি।

এই গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় যারা সাহায্য করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার। তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার কোন তুলনা হয় না। মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করেছে তারা হল এসএমএস হুসাইন শাহীন ও মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। আর যারা অনুলিখন এবং শেষ পর্যায়ে প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে তারা হল পাপিয়া সুলতানা ও অহিদুল ইসলাম। কম্পিউটারের পেছনের মূলতঃ কাজ করেছে অহিদুল ইসলাম। আমি এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সমস্ত ওষুধ কোম্পানীর কাছে যারা মাঠ পর্যায়ের গবেষণার কাজে একটি প্রতীকি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এদের সামগ্রিক সাহায্য সমুদয় খরচের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ হলেও এটি একটি বড় প্রেরণা ছিল।

তবে সচেয়ে বড় প্রেরণা ছিল আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ এর প্রধান ড. অ্যান্থনি ফসির একটি চিঠি যার প্রেক্ষাপটে তিনি তাদের এইডস ডিভিশনের প্রধান ড. জোনাথন ক্যাগন

স্বপ্রণোদিত হয়ে এইডস্ বিষয়ক আমার কিছু গবেষণাপত্র পিয়ার কমিটির রিভিউর জন্য নির্বাচিত করেন।

আরসকি্র যে সব চিকিৎসক ও টেকনেশিয়ান এই গবেষণায় ল্যাব ভিত্তিক কাজে সহায়তা প্রদান করেছে তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের প্রতি যাদের সহযোগিতা ও প্রেরণা আমার কাজটিকে সহজ করেছে। অনেকের অনেক ত্যাগ অনুল্লিখিত রইল। এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সময় প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী জনাব ফরিদ আহমেদ এবং তাঁর কুশলী কর্মীবৃন্দকে।

এই গ্রন্থটি যদি এইডস মহামারি বিস্তার রোধে সামান্যতম ভূমিকা রাখে এবং এইডস এপিডোমিওপ্লেজি রহস্য উদ্ঘাটনে এতটুকুও আলোর পথ দেখাতে পারে তা হলে এইডস নিয়ে আমার গবেষণা, ভাবনা ও শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ডা. এম এ হাসান
উত্তরা, ঢাকা, ২০০৭

কৃতজ্ঞতা

*গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন, * বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, * স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, * দি অ্যাক্মি ল্যাবরেটরিজ লিঃ, * ইউনিমেড এন্ড ইউনিহেলথ ম্যানুফাক্টারার্স লিঃ, *রেনাটা লিঃ, * মিসটিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, *ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, *জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, *নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, *হেলথকোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, * ওরিয়ন ল্যাবরেটরিজ লিঃ, *এ্যারিস্ট ফার্মা লিঃ

সূচীপত্র

অধ্যায় এক – ভাইরাস, এইচআইভি ও এইডস

১.১.১ এইডস কী? ১৭
১.১.২ এইডসের নামকরণ এমন হল কেন? ১৭
১.১.৩ এইচআইভি ভাইরাস কী? ১৭
১.১.৪ ভাইরাস কী? ১৮
১.১.৫ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? ১৯
১.২.১ এইচআইভি ভাইরাস শরীরের কোথায় আঘাত করে? ১৯
১.২.২ রক্তগ্রুপের সঙ্গে এইচআইভি সংক্রমণের সম্পর্ক ১৯
১.২.৩ এইচআইভি ভাইরাস কী প্রক্রিয়ায় শ্বেতকণিকাকে আক্রমণ করে? ২০
১.৩.১ এইচআইভি ভাইরাস ক'রকম হয়ে থাকে? ২০
১.৩.২ এইচআইভি-১ এবং এইচআইভি-২ এর মধ্যে তফাৎ কী? ২০
১.৪.১ এইচআইভি'র মিউটেশন (বিভাজন বা পরিবর্তন) ২১
১.৪.২ এইচআইভি চক্র ২১
১.৪.৩ এক নজরে এইচআইভি চক্র ২৪
১.৪.৫ HIV বাড়িং এ প্রোটিয়েস এর ভূমিকা ২৫
১.৪.৬ কোষ কেন্দ্রাভিমুখী ভাইরাল প্রোটিনের প্রতিরোধ ২৫
১.৫.১ এইচআইভি এবং এইডসের মধ্যে তফাৎ কী? ২৬
১.৬.১ বিভিন্ন ঘাতক ভাইরাসের চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২৬
১.৬.২ অন্যান্য রেট্রোভাইরাসের সাথে এইচআইভি-এর সম্পর্ক ২৭
১.৬.৩ HILV-1 এবং HTLV-2 এর তফাৎ ২৭
১.৭.১ এইচআইভি ভাইরাস কি পরিবর্তনশীল? ২৮

১.৭.২ এইচআইভি ভাইরাসটি কতদিন পর এবং কিভাবে শরীরে প্রতিক্রিয়া ঘটায় ২৯
১.৮.১ সংক্রমণের পর শরীরে এইচআইভি'র নীরব অবস্থা ২৯
১.৮.২ এইচআইভি ল্যাটেন্সি (Latency) ২৯
১.৮.৩ এইচআইভি ক্যারিয়ার (Carrier) অবস্থা ২৯
১.৯.১ এইচআইভি'তে আক্রান্ত হবার পর কখন এইডস হয় না? ২৯
১.৯.২ এইচআইভি আক্রান্ত একজনের জীবন কতটুকু দীর্ঘায়িত হতে পারে? ৩০
১.১০.১ এইডসের শ্রেণীবিভাগ ৩০
১.১১.১ এইচআইভি ল্যাটেন্সি ৩১
১.১২.১ এইচআইভি রোগের নতুন সংজ্ঞা ৩২
১.১৩.১ এইডস বনাম এইচআইভি রোগ ৩২
১.১৪. ইমিউন ব্যবস্থা ৩৩
১.১৪.১ এইডস সংক্রমণের সাথে ইমিউন ব্যবস্থার সম্পর্ক কী? ৩৩
১.১৫.১ টি-হেলপার কোষ সংক্রান্ত কিছু কথা ৩৬
১.১৫.২ টি-কোষের শ্রেণী বিভাগ ৩৬
১.১৫.৩ টি-সাপ্রেসর কোষ ৩৬
১.১৫.৪ সাইটোটক্সিক-টি কোষ ৩৬
১.১৫.৫ টি-হেলপার কোষ ৩৭

অধ্যায় দুই – এইডসের উদ্ভব ও বিস্তার

২.১.১ এইডসের ইতিহাস এবং বিস্তার (এইডস এপিডেমিক ও প্যানডেমিক) ৩৯
২.২.১ এইডসের শুরুটা কোথায় এবং কখন? ৩৯
২.৩.১ আফ্রিকা ও সাব-সাহারা অঞ্চলে এইডসের বিস্তার ৪১
২.৪.১ এইডস রোগের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু মতবাদ ৪৪
২.৫.১ জীবজন্তু থেকে মানুষের মধ্যে এইডস সংক্রমণের প্রচলিত ধারণা কতটুকু বাস্তবসম্মত ৪৫
২.৬.১ এইচআইভি ভাইরাসের মত যে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসগুলো জীবজগতে থাকতে পারে: ৪৫
২.৭.১ যুক্তরাষ্ট্রের এইডস সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান ৪৬
২.৭.২ নারী ও পুরুষদের মধ্যে কারা বেশি আক্রান্ত? ৪৭
২.৮.১ এইডস রোগের উদ্ভব সম্পর্কে লেখকের মতবাদ ৪৮

অধ্যায় তিন – বাংলাদেশে এইডসের বিস্তার

৩.১.১ বাংলাদেশে এইডসের বিস্তার ৪৯
৩.২.১ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আক্রান্ত নারীদের সংখ্যা নির্ণয়ে সমস্যাটা কোথায়? ৫৬
৩.৩.১ বাংলাদেশের ভাসমান যৌনকর্মীদের অবস্থা: ৫৭

অধ্যায় চার – এইডসের লক্ষণ

৪.১.১ এইচআইভি সংক্রমণের বিভিন্ন স্তর ৬১
৪.২.১ মোটাদাগে এইডসের লক্ষণগুলো কী কী? ৬৩
৪.২.২ এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রাথমিক লক্ষণ ৬৩
৪.২.৩ কনস্টিটিউশনাল লক্ষণ ৬৪
৪.৩.১ এইডস রোগটি দেখা দেয়ার প্রাক্কালে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কেমন হয়ে থাকে? ৬৪
৪.৪.১ লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাবার ধরন ৬৫
৪.৫.১ এইচআইভি ওয়েস্ট সিনড্রমের অন্তর্গত কয়েকটি লক্ষণ ও উপসর্গ ৬৬
৪.৫.২ স্লিম ডিজিজ (Slim disease) কী? ৬৬
৪.৬.১ শিশুদের মধ্যে এইডস-এর লক্ষণগুলো কী ধরনের? ৬৭
৪.৭.১ আক্রান্তের ত্বকে যেসমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় ৬৭
৪.৮.১ এইডস রোগে চোখের সমস্যা ৬৮
৪.৯.১ মস্তিষ্কে কীভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়? ৬৮
৪.১০.১ যেসব রোগ হলে এইচআইভি-এর কথা ভাবতে হবে ৬৯

অধ্যায় পাঁচ – এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যেসব রোগ দেখা দেয়

৫.১.১ এইডসে আক্রান্ত হলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে সমস্ত রোগ হয় ৭১
৫.২.১ এইডস রোগে আক্রান্তরা সাধারণত নিম্নলিখিত অণুজীব ও পরজীবী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয় ৭১
৫.৩.১ প্রোটোজোয়া জাতীয় ইনফেকশন: নিউমোসিসটিস ক্যারিনি ৭২
৫.৪.১ ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় সংক্রমণ ৭৫
৫.৫.১ রোচালেমিয়া ৭৬
৫.৬.১ সালমোনেলা ৭৬
৫.৭.১ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম ইনফেকশন ৭৭
৫.৮.১ ছত্রাক জাতীয় সংক্রমণ ৭৮
৫.৯.১ স্নায়ু সংক্রান্ত জটিলতা ৭৯
৫.১০.১ হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতা ৭৯
৫.১১.১ এক নজরে যে রোগ ও লক্ষণসমূহ দেখে এইডসের কথা ভাবতে হবে ৮০
৫.১১.২ সাধারণত কী কী স্ত্রীরোগ ও যৌনরোগ নিয়ে এইচআইভি আক্রান্তরা চিকিৎসকের নিকটে আসে? ৮০
৫.১১.৩ ডায়রিয়ার সাথে এইচআইভি সংক্রমণের সম্পর্ক কী? ৮২

অধ্যায় ছয় – এইচআইভি শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্ট

৬.১.১ এইডস শনাক্ত করতে যে সমস্ত টেস্ট করতে হয় ৮৩
৬.২.১ এইচআইভি স্ক্রিনিং ও অন্যান্য টেস্ট ৮৩
৬.৩.১ ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট ৮৪
৬.৪.১ পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশন: ৮৫
৬.৫.১ পি-২৪ এন্টিজেন পরীক্ষাটি কী? ৮৬
৬.৬.১ এইডস শনাক্তকরণের সহজ কোন পদ্ধতি আছে কি না ৮৬
৬.৬.২ সাধারণ জ্ঞানে এইচআইভি আক্রান্তদের শনাক্ত করা যায় কি? ৮৯
৬.৬.৩ অনুমানভিত্তিক এইডস নির্ণয়: ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন ৮৯
৬.৭.১ কীভাবে শনাক্ত করা যাবে যে একটি শিশু এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে? ৯১
৬.৮.১ কখন পরীক্ষা করতে হবে, কীভাবে পরীক্ষা করতে হবে? ৯১
৬.৯.১ এইচআইভি টেস্ট সংক্রান্ত কিছু আইনগত ও এথিক্যাল বাধ্যবাধকতা: ৯১

অধ্যায় সাত – এইডসের কো-ফ্যাক্টর

৭.১ এইডসের কো-ফ্যাক্টর ৯৩
৭.১.১ যৌনরোগে আক্রান্তদের এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কি বেশি? ৯৪
৭.২.১ হেমোফাইলিয়া রোগী ৯৪
৭.৩.১ নারীদের মধ্যে যে কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয় ৯৫
৭.৪.১ যেসমস্ত ভাইরাস এইচআইভি সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে ৯৬
৭.৫.১ এইডস রোগের শুরুর সঙ্গে ফ্লু'র কোন সম্পর্ক আছে? ৯৬

অধ্যায় আট – এইচআইভি সংক্রমণ– ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন

৮.১ টার্গেট গ্রুপ ৯৭
৮.১.১ ক্যাটাগরি-১: শীর্ষ ঝুঁকিতে যারা ৯৭
৮.১.২ ক্যাটাগরি-২: যাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে ৯৮
৮.১.৩ ক্যাটাগরি-৩: আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে যারা নাজুক অবস্থায় আছে ৯৮
৮.২ বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী ও বয়সের লোকের মধ্যে এইডসের সম্ভাবনা ৯৯
৮.২.১ কাদের জন্য এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক? ৯৯
৮.২.২ কোন বয়সিদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি? ৯৯
৮.৩ যৌন আচরণের সঙ্গে এইডসের সম্পর্ক: ১০০
৮.৩.১ সমকামীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি কতটুকু? ১০০
৮.৩.২ ওরাল সেক্স ১০১
৮.৩.৩ লেসবিয়ানদের ঝুঁকি ১০১
৮.৩.৪ হেটেরোসেক্সুয়ালদের মধ্যে উচ্চ হারে এইডস সংক্রমণের কারণ ১০২
৮.৩.৫ এককগামী : গোপন সম্পর্কের মাধ্যমে এইডস সংক্রমণ ১০২
৮.৩.৬ দীর্ঘকালের একক সঙ্গীর কাছ থেকে কীভাবে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে? এইডস প্রতিরোধে যৌনসঙ্গীকে কতটুকুন জানা প্রয়োজন? ১০৩
৮.৪.১ বহুগামী: বহুগামীদের ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি কেন? ১০৩
৮.৫.১ যৌনকর্মীদের জীবন: এদের এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি কেন? ১০৩
৮.৫.২ যে সব ক্ষেত্রে যোনিপথে ভাইরাসযুক্ত বীর্য বিদ্যমান থাকে: ১০৪
৮.৬.১ যৌনসংযোগ: পায়ুপথে মিলন ১০৫
৮.৬.২ পায়ুপথে মিলনে অ্যাকটিভ ও সহযোগী (Passive) সঙ্গীদের ঝুঁকি কতটুকু ? ১০৬
৮.৬.৩ নারীর পায়ুপথে পুরুষের মিলন ১০৬
৮.৬.৪ পায়ুপথে মিলিত হলেই একজন এইডস আক্রান্ত হবে কি না ১০৭
৮.৬.৫ পায়ুপথ বা যোনিপথে বীর্য নির্গত না হলেও এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে? ১০৭
৮.৭.১ ইনজেকশনের সূঁচের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে? ১০৮
৮.৭.২ নারীদের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে এইডস ছড়াবার ঝুঁকি কতটুকু? ১০৮
৮.৭.৩ নারীর ক্ষেত্রে এই ঝুঁকির কারণ কী? ১০৮
৮.৮.১ কোন বিশেষ ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের (IDUs) ক্ষেত্রে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় কি না? ১০৯
৮.৯.১ মেয়েদের খাৎনা এইচআইভি সংক্রমণের পথ সহজ করে দেয়? ১০৯
৮.১০.১ মুখের লালার (স্যালাইভা) মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় কি না ১০৯
৮.১০.২ ধূমপান এবং মদ্যপান এইচআইভি সংক্রমণে কতটুকু ভূমিকা রাখে? ১১০
৮.১১.১ যে সব কারণে মদ এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থ এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় ১১১
৮.১২.১ মহিলাদের মাসিককালীন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু? ১১১
৮.১৩.১ এইচআইভি প্রতিরোধে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির ভূমিকা কিরকম? ১১১
৮.১৪.১ দৃশ্যমানভাবে এইডসের কোন লক্ষণ নেই, অথচ এইচআইভি পজিটিভ–এমন ব্যক্তি এইডস ছড়ায় কি? ১১২
৮.১৪.২ এইডসের লক্ষণবিহীন একজন পুরুষ তার সঙ্গীকে আক্রান্ত করতে পারে কি? ১১২
৮.১৪.৩ একবার মাত্র যৌনসংযোগ হলেই এইচআইভি সংক্রমিত হবে? ১১২
৮.১৪.৪ এইচআইভি আক্রান্তের সঙ্গে মিলিত হলেই নিশ্চিতভাবে রোগ সংক্রমিত হবে? ১১২

৮.১৪.৫ জীবনের প্রথম মিলনেই একজন এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে কি? ১১৩
৮.১৫.১ অজ্ঞাত ফ্যাক্টর ১১৩
৮.১৬.১ ধর্ষণ, পাচার এবং নারী দাসত্বের সঙ্গে এইডসের সম্পর্ক ১১৪
৮.১৭.১ অন্যান্য ঝুঁকি ১১৪

অধ্যায় নয় – চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি

৯.১.১ পেশাগত কারণে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু? ১১৫
৯.২.১ সংক্রমিত রক্ত চিকিৎসাকর্মীদের ত্বকের সংস্পর্শে আসলে কী হতে পারে? ১১৫
৯.২.২ এইচআইভি আক্রান্তের রক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর চোখে, মুখে, নাকে লেগে গেলে কী করতে হবে? ১১৫
৯.২.৩ এন্টিসেপটিক দিলে অথবা রক্ত ঝরিয়ে ফেললে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে কি? ১১৬
৯.৩.১ ভুলে বা দুর্ঘটনাক্রমে কোন এইডস আক্রান্তের সঙ্গে সংযোগ ঘটে গেলে কিছু করার আছে কি? ১১৬
৯.৩.২ এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে আর কী করতে হবে? ১১৬
৯.৪.১ হেপাটাইটিস-সি (HCV) সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু? ১১৬
৯.৫.১ এ ধরনের পেশাগত দুর্ঘটনা এড়াবার পথ কী? ১১৭
৯.৬.১ দুর্ঘটনা থেকে প্রতিরক্ষার জন্য পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি ১১৭
৯.৬.২ পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি-এ আর কী করা যায়? ১১৭
৯.৬.৩ যাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হয় তাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর কী কী ওষুধ দিতে হবে? ১১৮
৯.৬.৪ পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট নেবার সময়সীমা কতটুকু? ১১৮
৯.৬.৫ পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত ওষুধগুলো কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে? ১১৮
৯.৬.৬ এ অবস্থায় মায়েরা কী করবে? ১১৯
৯.৭.১ ডেন্টিস্টদের নিকট থেকে এইচআইভি রোগের সংক্রমণ হতে পারে কী? ১১৯
৯.৮.১ অন্যান্য ঝুঁকি : ১১৯
৯.৯ অন্যান্য সেবাকর্মীদের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ১২০
৯.৯.১ যারা সেলুন ও পার্লারে কাজ করে এইডস থেকে বাঁচতে তারা কী করবে? ১২০

অধ্যায় দশ – এইডস প্রতিরোধ

১০.১.১ নিরাপদ যৌনজীবন: কনডম ব্যবহার ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা ১২১
১০.১.২ কাদের জন্য কনডম ব্যবহার বাধ্যতামূলক? ১২১
১০.১.৩ কনডম ব্যবহারে যে নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত ১২২
১০.১.৪ কনডম ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচার কতটুকু সার্থক হয়? ১২২
১০.২.১ এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে ভাইরিসাইডাল প্রয়োগ ১২৪
১০.২.২ ফিমেল কনডম ও সংশ্লিষ্ট ভাইরিসাইডাল কতটুকু কার্যকর? ১২৫
১০.৩.১ ধৌতকরণ ১২৬
১০.৪.১ ছেলেদের খাৎনা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়? ১২৭
১০.৫.১ ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ গ্রহণ প্রবণতা প্রতিরোধ করা যাবে কীভাবে? ১২৭
১০.৫.২ নিড্‌ল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কতটুকু কার্যকর হতে পারে? ১২৭
১০.৬.১ এইডস সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে? ১২৮
১০.৬.২ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ১২৮
১০.৬.৩ শনাক্তকরণ কর্মসূচি ১২৯

অধ্যায় এগারো – এইডস রোগে শিশু ও গর্ভবতী মা

১১.১.১ এইচআইভি আক্রান্তদের গর্ভধারণে কি ধরনের জটিলতা দেখা দেয়? ১৩১
১১.২.১ মা থেকে শিশুর মধ্যে কিভাবে আইচআইভি সংক্রমণ ঘটে? ১৩১
১১.৩.১ এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের জন্মগত অসুবিধাগুলো কী কী? ১৩২
১১.৪.১ নবজাতক ও শিশুদের এইচআইভি সংক্রমণ ১৩৩
১১.৪.২ নিরাপদ শিশুর জন্মদান কি সম্ভব? ১৩৪
১১.৪.৩ মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে? ১৩৫
১১.৫.১ বুকের দুধে এইচআইভি নিঃসৃত হয় কি না ১৩৬
১১.৫.২ এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ কি শিশুর জন্য নিরাপদ? ১৩৬
১১.৬.১ স্তনের বোঁটা থেকে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে? ১৩৬
১১.৭.১ গর্ভবতী মা কি এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে? ১৩৬

অধ্যায় বারো – ব্যক্তিত্বের সাথে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা এবং আক্রান্তের মনোরোগ ও বিকার

১২.১ ব্যক্তিত্বের সাথে এইচআইভি'র সম্পর্ক : ১৩৭
১২.১.১ এইচআইভি আক্রান্তের মানসিক প্রবণতা কেমন? ১৩৭
১২.২.১ এইচআইভি সংক্রমণে ব্যক্তিত্ব কী ধরনের প্রভাব রাখে? ১৩৮
১২.২.২ বহির্মুখীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে? ১৩৮
১২.২.৩ অন্তর্মুখীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে? ১৩৯
১২.৩.১ স্থিরমতি ও অস্থিরমতি ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে? ১৩৯
১২.৩.২ অস্থিরমতি বহির্মুখী (Instable Extrovert) গ্রুপ ১৪০
১২.৩.৩ সুস্থিরমতি বহির্মুখী (Stable extrovert) গ্রুপ ১৪১

১২.৩.৪ অস্থিরমতি অন্তর্মুখী (Instable Introvert) গ্রুপ ১৪১
১২.৩.৫ সুস্থিরমতি অন্তর্মুখী (Stable Introvert) গ্রুপ ১৪১
১২.৪ এইডস রোগাক্রান্তদের মানসিক স্বাস্থ্য, মনোরোগ ও বিকার ১৪২
১২.৪.১ ডেলিরিয়াম কী? ১৪৩
১২.৪.২ ডিমেনশিয়া কী? ১৪৩
১২.৪.৩ ম্যানিয়াক সিনড্রম কী? ১৪৩
১২.৪.৪ বিয়োগ ব্যথা ১৪৫
১২.৪.৫ আত্মহত্যার প্রবণতা ১৪৫
১২.৪.৬ এ্যাংজাইটি ইনসোমনিয়া ১৪৫
১২.৪.৭ নিদ্রাহীনতা ১৪৬

অধ্যায় তেরো - পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে এইডসের নানা সম্পর্ক

১৩.১.১ এইচআইভি আক্রান্তদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে? ১৪৭
১৩.২.১ আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসলে এইচআইভি ছড়াতে পারে? ১৪৭
১৩.২.২ একই কাপ, গ্লাস শেয়ার করলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু? ১৪৭
১৩.২.৩ ভুলক্রমে আক্রান্তের টুথব্রাশ ব্যবহার করলে কী হতে পারে? ১৪৮
১৩.৩.১ এইচআইভি আক্রান্তের ব্যবহৃত টয়লেট থেকে রোগ ছড়াতে পারে? ১৪৮
১৩.৪.১ এইচআইভি আক্রান্তের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে গেলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটুকু? ১৪৯
১৩.৫.১ এইচআইভি আক্রান্তের হাঁচি-কাশি কি সংক্রামক? ১৪৯
১৩.৫.২ আক্রান্তের মূত্র গায়ে লাগলে কি এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে? ১৪৯
১৩.৫.৩ মলমূত্রে ভাইরাস কতটা থাকে? ১৪৯
১৩.৫.৪ এইচআইভি আক্রান্তের দেহে বিদ্যমান ঘা বা ক্ষত ছুঁলে এইচআইভি হবে কি? ১৪৯
১৩.৬.১ এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি কি রান্নাঘরে যেতে পারবে? ১৫০
১৩.৭.১ আক্রান্ত রোগীদের জন্য খাবার দাবার সংক্রান্ত কী ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন? ১৫০
১৩.৮.১ এইডস রোগাক্রান্তদের পান এবং আহারে পুষ্টি মান ১৫০
১৩.৯.১ খাবার হোটেল ও রেস্টুরেন্ট থেকে এইচআইভি ছড়াবার সম্ভাবনা কতটুকু? ১৫১
১৩.৯.২ হোটেলে ব্যবহৃত বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি কি এইচআইভি ছড়াতে পারে? ১৫১
১৩.১০.১ রেফ্রিজারেটর কি রোগ ছড়াতে পারে? ১৫১
১৩.১১.১ এইচআইভি সংক্রমণে বাসস্থান কোন প্রভাব বিস্তার করে? ১৫২
১৩.১২.১ মশা দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে? ১৫২
১৩.১২.২ পোষা প্রাণী ও অন্যান্য জীবজন্তু কর্তৃক এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু? ১৫২
১৩.১৩.১ এইচআইভি আক্রান্তকে চুমু খেলে রোগ সংক্রমিত হতে পারে? ১৫৩
১৩.১৩.২ এইডস আক্রান্ত নর্তকীর সান্নিধ্যে এলে অথবা নৃত্যসঙ্গী এইডস আক্রান্ত হলে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটুকু? ১৫৩
১৩.১৩.৩ সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলে এইচআইভি ছড়াতে পারে? ১৫৪
১৩.১৩.৪ জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করতে গিয়ে এইডস সংক্রমণ হতে পারে? ১৫৪
১৩.১৩.৫ সিনেমা, টিভি ও অ্যাডফার্মের বিভিন্ন হাউসের মেকাপ রুমগুলোতে অথবা পেশাদার মেকাপম্যানদের ব্যবহৃত কীট মারফত এইডস ছড়াবার সম্ভাবনা কতটুকু? ১৫৪
১৩.১৪.১ সিগারেট শেয়ারিং-এর মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে? ১৫৪
১৩.১৫.১ হস্তমৈথুনে কি এইডস ছড়ায়? ১৫৪
১৩.১৫.২ এইচআইভি আক্রান্তদের বীর্য সরাসরি গায়ে লাগলে কী হতে পারে? ১৫৫
১৩.১৬ এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষা জীবন: ১৫৫
১৩.১৬.১ এইচআইভি আক্রান্তরা স্কুল-কলেজে গেলে কোন সমস্যা হবে কি? ১৫৫
১৩.১৬.২ এইচআইভি আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের জন্য কতটা ঝুঁকি তৈরি করবে? ১৫৫
১৩.১৬.৩ আক্রান্তের রোগের বিষয়টি গোপন করার প্রয়োজন আছে কি? ১৫৬
১৩.১৬.৪ কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্রগুলোতে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? ১৫৬

অধ্যায় চৌদ্দ – এইডসের চিকিৎসা

১৪.১.১ এইচআইভি ভাইরাস বিনাশী এন্টি-ভাইরাল থেরাপি তৈরির কৌশল ১৫৭
১৪.২.১ রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন-এর প্রতিবন্ধকতা ১৫৮
১৪.২.২ নিউক্লিয়োসাইড এনালগ ১৫৮
১৪.২.৩ এনএনআরটিআই (NNRTI): ১৫৯
১৪.৩.১ অন্যান্য: রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটরস ১৫৯
১৪.৩.২ RNASE H Inhibitor : ১৫৯
১৪.৩.৩ ভাইরাল ডিএনএ'র ইন্টিগ্রেশন প্রতিবন্ধক ১৬০
১৪.৩.৪ ভাইরাল জিন এক্সপ্রেশনে প্রতিবন্ধকতা ১৬০
১৪.৩.৫ টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর অবদমন ১৬১
১৪.৩.৬ ইমিউনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট ১৬১
১৪.৩.৭ এন্টি-অক্সিড্যান্ট ১৬১
১৪.৩.৮ আরইভি (REV) ১৬১

১৪.৩.৯ ভাইরাল রাইবোসোমাল ফ্রেমশিফটিং ১৬১
১৪.৩.১০ এইচআইভি ভাইরিয়নগুলোর সমবেত হওয়া ও পরিণত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি ১৬১
১৪.৩.১১ সাইক্লোসপোরিন (cyclosporin) অবদমন এবং সাইক্লোফাইলিন (Cyclophilin) আন্তঃবিক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ১৬৩
১৪.৪.১ টক্সিক পদার্থ প্রয়োগ করে অসুস্থ কোষগুলো মেরে ফেলার কৌশল ১৬৩
১৪.৪.২ ক্যাপসিড প্রোটিনের সাথে ভাইরিয়ন আরএনএ-এর প্রতিবন্ধকতা ১৬৩
১৪.৪.৩ প্রোটিয়াস ইনহিবিটর ১৬৪
১৪.৪.৪ জিন থেরাপির সমস্যা ১৬৪
১৪.৫.১ এন্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১৬৫
১৪.৫.২ নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১৬৫
১৪.৫.৩ নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১৬৬
১৪.৫.৪ প্রোটিয়াস ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১৬৬
১৪.৬.১ এইচআইভি আক্রান্তরা কী প্রক্রিয়ায় সুস্থ থাকবে এবং কী করলে রোগটি খারাপ পর্যায়ে যাবে না? ১৬৬
১৪.৭ এইডস সাপোর্ট গ্রুপ ১৬৭
১৪.৭.১ ইনফরমেশনাল সাপোর্ট ১৬৭
১৪.৭.২ ইমোশনাল সাপোর্ট ১৬৭
১৪.৭.৩ লিভিং সাপোর্ট ১৬৮
১৪.৮.১ এইডস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত? ১৬৮
১৪.৯ এইচআইভি রোগ প্রতিষেধ ১৭১
১৪.৯.১ ভাইরাস প্রবেশ নিবারক প্রয়োগ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় ১৭১
১৪.৯.২ প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসা ১৭১
১৪.৯.৩ বিকল্প চিকিৎসা ১৭১
১৪.১০.১ যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিবর্তন করতে হবে ১৭৩
১৪.১১.১ যে ধরনের পরিবর্তন কাম্য ১৭৪

উল্লেখপঞ্জি ১৭৫

অধ্যায় এক

ভাইরাস, এইচআইভি ও এইডস

১.১.১ এইডস কী?

এইডস কোন বিশেষ একটি রোগ নয়, অনেকগুলো রোগের একত্রিত প্রকাশ। এতে সিডি-৪ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা দুশ'র নিচে নেমে যায় এবং ল্যাব পরীক্ষায় রক্ত এইচআইভি পজিটিভ হয়। এর সঙ্গে আনুষাঙ্গিক যে সমস্ত রোগ দেখা দিতে পারে তারও ল্যাব ভিত্তিক প্রমাণ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

১.১.২ এইডসের নামকরণ এমন হল কেন?

এইডস কথাটি Acquired Immunedeficiency Syndrome-এর সংক্ষিপ্ত আকার। Acquired কথাটির অর্থ হল এই যে, এইডস বংশানুক্রমে হয় না কিংবা আপনা থেকেই শরীরের মধ্যে জন্মায় না। যৌনসংযোগের সময় যোনিপথ ও পায়ুপথের বহিরাবরণ বা মুখগহ্বরের মেমব্রেনের সাথে যৌনাঙ্গের সংস্পর্শের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে এইচআইভি ভাইরাসযুক্ত যোনিরস বা লালা একজনের থেকে অপর জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে এই রোগ হয়ে থাকে। যে কোন দূষিত রক্ত অথবা দূষিত রক্তের শুকনো কণা গ্রহণের মাধ্যমেও এ রোগ শরীরে ছড়ায়।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার নাম হল ইমিউন সিস্টেম। বিভিন্ন রোগ এটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এইচআইভি'র প্রধান লক্ষ্যই হল এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি। এইচআইভি আক্রান্ত হবার ফলে শরীরে টি-হেলপার কোষ কমে যায়। এটাকে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি বলে।

সিনড্রম (syndrome) একটি একক রোগ নয়, এটি অনেকগুলো রোগ এবং তার লক্ষণের সমন্বয়। আর এই সবগুলো বিষয় একত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে Acquired Immunedeficiency Syndrome বা AIDS রোগের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়।

১.১.৩ এইচআইভি ভাইরাস কী?

এইচআইভি ভাইরাস উপরে বর্ণিত উপায়ে ছড়িয়ে পড়া এমন একটি বিশেষ ভাইরাস যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এইচআইভি শব্দটির পূর্ণরূপ হল, Human Immunodeficiency Virus। অর্থাৎ মানুষকে আক্রমণ করে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে দেয় যে ভাইরাস তাকেই বলা হয় এইচআইভি ভাইরাস। এটি লেনটি ভাইরাস গোত্রভুক্ত

রেট্রোভাইরাসগুলোরই একটি। লেনটি কথাটির অর্থ ধীর। এই ভাইরাসের দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণ ও রোগের প্রকাশও ঘটে ধীরে ধীরে। প্রধানত শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ ইমিউন ব্যবস্থাকেই এটা আক্রমণ করে। তাই এর বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে না।

এইচআইভি ভাইরিয়নের মধ্যে নিউক্লিয়োপ্রোটিন জাতীয় কেন্দ্রবস্তুর চারপাশে দ্বি-স্তর স্নেহজাতীয় পদার্থের তৈরি আস্তরণ রয়েছে। এটিকে জিপি-১২০ বলে। আর যে জিনিসটি পর্দা বা ক্যাপসুল আকার আবরণ তৈরি করে এই স্নেহজাতীয় পদার্থ ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিডকে ধারণ করে তাকে বলা হয় ট্রান্সমেমব্রেন এনভেলপ (Transmembrane env) প্রোটিন বা জিপি-৪১। এই জিপি-৪১-ই শিকড়ের মত আটকে রাখে স্নেহজাতীয় পদার্থের আবরণটির সাথে বহিরাবরণকে।

এবার আসা যাক কেন্দ্রে। নিউক্লিয়োপ্রোটিনযুক্ত কেন্দ্রে দুই কপি ভাইরাল জেনোমিক আরএনএ এবং ট্রান্সফার আরএনএ অণুর সাথে গ্যাগ প্রোটিন (gag protein) ও পোলপ্রোটিন (pol protein) নামক দু'ধরনের প্রোটিন জাতীয় বস্তু বিদ্যমান থাকে। এই গ্যাগ প্রোটিনগুলো বন্ধন সৃষ্টিকারী সিমেন্ট জাতীয় পদার্থের মত যা ভাইরাসের অন্তর্গত নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও স্নেহজাতীয় পদার্থসহ ভাইরাসের কেন্দ্রটিকে ধরে রাখে।

তিন ধরনের গ্যাগ প্রোটিন রয়েছে; যথা– ম্যাট্রিক্স গ্যাগ প্রোটিন বা MA, ক্যাপসিড গ্যাগ প্রোটিন বা CA এবং নিউক্লিয়োক্যাপসিড গ্যাগ প্রোটিন বা NC। এমএ গ্যাগ প্রোটিন স্নেহজাতীয় পদার্থের ভেতরের দিকটায় এমএ গ্যাগ প্রোটিন লেগে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে। সিএ গ্যাগ প্রোটিনটি অবস্থান নেয় কেন্দ্রে। এনসি গ্যাগ প্রোটিন ভাইরাসের জেনোমিক আরএনএ'র সাথে বন্ধন তৈরি করে সাজিয়ে গুছিয়ে একে কেন্দ্রে রাখে।

PR, RT ও **IN** নামক এনজাইমগুলো সংশ্লিষ্ট থাকে পোলপ্রোটিনের সাথে। এদেরকে ধরে রাখা পোলপ্রোটিনের কাজ।

১.১.৪ ভাইরাস কী?

ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার চেয়ে বহুগুণে ছোট এমন এক জিনিস যা সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায় না; জীব কোষের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলো এটি ধারণ করে না বলে এটাকে জীবন্ত কোষও বলা যায় না। জীবন্ত কোষ ও জড়পদার্থের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়া ভাইরাস এমন একটি ক্যাপসুল বা ব্যাগ যার মধ্যে থাকে সামান্য পরিমাণ ডিএনএ অথবা আরএনএ বস্তু এবং ব্যাগটি হয় তার আবরণ।

জীবন্ত কোষের বাইরে ভাইরাসের নিজস্ব কোন জীবন নেই। জীবন্ত কোষকে আক্রমণের মাধ্যমে কোষের নিজস্ব উপাদানগুলোকে নিজের সুবিধামত সমন্বয় করে নতুন ভাইরাসের উৎপত্তি হয় এবং ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে। এসব কারণে উদ্ভিদ ও জীবদেহের বাইরে ভাইরাস টিকে থাকতে পারে না।

১.১.৫ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

ব্যাক্টেরিয়া এমন একটি পূর্ণ কোষ যার কোষ প্রাচীর রয়েছে এবং কোষাভ্যন্তরে ডিএনএ আরএনএসহ রাইবোজোমের উপস্থিতি রয়েছে। ব্যাক্টেরিয়ার একটি মেটাবলিক এনজাইম রয়েছে এবং এটা মানুষের শরীরের কোষের মধ্যে এবং কোষের বাইরে দু'ভাবেই টিকে থাকতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াকে সাধারণ মাইক্রোসকোপের সাহায্যে দেখা যায় এবং এটা ৩০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। অপরদিকে ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার চেয়ে অনেক ছোট, জীবন্ত কোষের বৈশিষ্ট্যবিহীন এমন একটি লাইপোপ্রোটিন ক্যাপসুল যার কোন প্রাচীর নেই। এর মধ্যে কোন মেটাবলিক এনজাইম বা রাইবোজোম থাকে না। হোস্ট কোষের মধ্যে সহায়ক পরিবেশ ছাড়া এটা নিজে থেকে বেঁচে থাকতে পারে না এবং এটা ডিএনএ আরএনএ নামক ভাইরাস নয়তো আরএনএ ভাইরাস নামে অভিহিত করা হয়। ভাইরাসগুলো সাধারণত ২০-৩০০ এনএম হয়ে থাকে। পক্স ভাইরাস হল সকল ভাইরাসের মধ্যে বড়। এটাকে সাধারণ মাইক্রোসকোপে দেখা যায়।

১.২.১ এইচআইভি ভাইরাস শরীরের কোথায় আঘাত করে?

শরীরের শ্বেতকণিকাগুলোই ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হয়, বিশেষ করে টি-লিম্ফোসাইট অথবা টি-হেলপার কোষগুলো। এই টি-হেলপার কোষগুলো শরীরের প্রতিরোধের প্রধান কাণ্ডারি হিসাবে কাজ করে।

১.২.২ রক্তগ্রুপের সঙ্গে এইচআইভি সংক্রমণের সম্পর্ক :

অনেকে প্রশ্ন করেন, কোন বিশেষ গ্রুপের রক্তের এইচআইভি বহনের ক্ষমতা বা প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা রয়েছে কি না।

প্রত্যেক মানুষের শরীরে ইমিউন কোষগুলোর মধ্যে সিডি-৪ নামক স্থান রয়েছে। আক্রমণের জন্য এই সিডি-৪ স্থানই বেছে নেয় এইচআইভি। যেহেতু এইচআইভি মানুষের ইমিউন কোষগুলো, বিশেষ করে টি-হেলপার মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজকে আক্রমণ করে এগুলোতে অবস্থান নেয় এবং এদের মধ্যে ভাইরাস পার্টিকেল ছড়িয়ে দেয়, তাই রক্তে বাহিত হয়ে এগুলো শরীরের বিভিন্ন তরল পদার্থে জমা হয়। এর মধ্যে বীর্য এবং

যোনিরস অন্তর্গত। একারণেই যোনিরস এবং বীর্যের মাধ্যমে এই ভাইরাস অধিক হারে ছড়িয়ে থাকে।

আক্রান্ত ব্যক্তির লালা এবং চোখের পানিতেও এইচআইভি থাকে। তবে বীর্যের তুলনায় লালাতে ভাইরাসের পরিমাণ অনেক কম থাকে। তার চেয়ে আরও কম থাকে চোখের পানিতে।

১.২.৩ এইচআইভি ভাইরাস কী প্রক্রিয়ায় শ্বেতকণিকাকে আক্রমণ করে?

এইচআইভি মূলত টি-হেলপার লিম্ফোসাইট অথবা টি-হেলপার কোষকে আক্রমণ করে। টি-হেলপার কোষগুলো ইমিউন ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের সক্রিয় ভূমিকাতেই আমাদের শরীর বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

টি-হেলপার কোষের ভূমিকাটি অনেকটা একটি দলের নেতার মত। এর নির্দেশেই নানাবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এইচআইভি ভাইরাস রক্তের শ্বেতকণিকার টি-লিম্ফোসাইট ও টি-হেলপার কোষগুলোকে আক্রমণের মাধ্যমে মানুষের ইমিউন ব্যবস্থাকে এমনভাবে অকার্যকর করে দেয় যাতে সেগুলো রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এটা প্রথমেই আক্রমণ করে টি-হেলপারের অন্তর্গত সিডি-৪ কে। সিডি-৪ স্থানে সংযোগ ঘটিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা নস্যাতের মাধ্যমে এটা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই টি-হেলপার ইমিউন কোষগুলো আক্রান্ত হবার কারণে অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ কমে যায়।

টি-হেলপার কোষ ছাড়া শ্বেতকণিকার অন্তর্গত মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজকেও ভাইরাস আক্রমণ করে। এতে প্রতিরোধ সৈনিক মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজগুলো ঠিকভাবে কাজ করে না। ইমিউন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৈরি এন্টিবডিগুলো কিছু ভাইরাস নিধনে কার্যকর থাকলেও ইমিউন ব্যবস্থার ক্রমান্বয় বিপর্যয়ের কারণে এর সংখ্যা ও ক্ষমতা দিন দিন কমে আসে। এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এক সময় এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

শরীরের ইমিউন ব্যবস্থা এন্টিবডি তৈরি করে এইচআইভি'র বিরুদ্ধে লড়বার চেষ্টা করে। এতে প্রাথমিকভাবে ভাইরাসের আক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও পরবর্তীতে এগুলো নতুন রূপ ও ক্ষমতা নিয়ে ইমিউন ব্যবস্থাকে পুনরায় আঘাত করে এবং এক সময় পুরো ইমিউন ব্যবস্থাকেই নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

১.৩.১ এইচআইভি ভাইরাস ক'রকম হয়ে থাকে?

দু'ধরনের এইচআইভি ভাইরাস হয়ে থাকে। একটি এইচআইভি-১, অন্যটি এইচআইভি-২। সামগ্রিক এইডস রোগীদের অর্ধেকই আক্রান্ত হয় একই সাথে দুই ধরনের ভাইরাস দ্বারা। তবে এইচআইভি-১ হল এইডস রোগের প্রধানতম কারণ। যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এইডস রোগ ঘটে থাকে এই এইচআইভি-১ এর কারণে। পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকাতে এইচআইভি-১ সংক্রমণ

বেশি ঘটে থাকে। এইচআইভি-২কে শনাক্ত করা হয় ১৯৮৬ সনে। আফ্রিকা, বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকাতে এটা সবচেয়ে বেশি রোগ সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ায় অল্প কিছু লোক এইচআইভি-২ তে আক্রান্ত হয়। এককভাবে শতকরা ৪ ভাগ আক্রান্ত হয় এইচআইভি-২ দ্বারা।

১.৩.২ এইচআইভি-১ এবং এইচআইভি-২ এর মধ্যে তফাৎ কী?

এইচআইভি-১ এবং এইচআইভি-২ দুটোই রেট্রোভাইরাস; দুটোই এইডস তৈরি করে। তবে এইচআইভি-১-এর বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম এবং এটা প্রধানত পূর্ব আফ্রিকাসহ কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ।
এইচআইভি-২ থেকে এইচআইভি-১ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এইচআইভি-২ সৃষ্ট ভাইরেমিয়া তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। এইচআইভি-২-এর সংক্রমণও আনুপাতিকভাবে কম মাত্রায় এবং দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এইচআইভি-২-এর নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা ঘুমন্ত সময় অর্থাৎ সংক্রমণের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশের মধ্যে ব্যবধানটি এইচআইভি-১-এর চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। এমনও প্রমাণ রয়েছে যে, এইচআইভি-২ দূষিত রক্ত গ্রহণের পরেও প্রায় চৌদ্দ বছর কেটে গেছে লক্ষণবিহীন ভাবে।

১.৪.১ এইচআইভি'র মিউটেশন (বিভাজন বা পরিবর্তন) :

এইচআইভি'র মিউটেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ভাইরাসটির চরিত্রই হল এর ক্রমাগত পরিবর্তন বা মিউটেশন। এতে নতুন নতুন যে সমস্ত ভাইরাস তৈরি হয়, তাদের এন্টিবডির মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য থাকে।

এ প্রক্রিয়ায় তৈরি কোন কোন ভাইরাস রোগ সংক্রমণ ঘটায় অতি দ্রুত, কোনটি আবার অতি ধীরে। তবে মিউটেশনের পরেও এইচআইভি তার মৌলিক চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখে এবং কখনই এটা এমন কোন ভিন্ন ভাইরাসে পরিণত হয় না যাতে এটা নতুন কোন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে বা অন্য রোগ ঘটাতে পারে।

১.৪.২ এইচআইভি চক্র (HIV Cycle):

যে সমস্ত জীবাণু বা পরজীবী এবং ছত্রাক মানুষকে আক্রান্ত করে তাদের প্রত্যেকের জীবনচক্র আছে। ভাইরাসেরও এমন একটি চক্র আছে, তবে তাকে জীবনচক্র বলা যায় না। কেননা ভাইরাসের নিজস্ব জীবন নেই। সাধারণত ভাইরাস এর ডিএনএ ও আরএনএ জাতীয় নিউক্লিয়িক অ্যাসিডগুলো কোষের মধ্যে প্রবেশ করে কোষের সংগ্রহশালায় বিদ্যমান নিজস্ব সম্পদগুলোকে ব্যবহার করে নতুন ভাইরাস তৈরি করে। এইচআইভি ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি আরও জটিল।

এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর অণু পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং পরিশেষে একটি

ভাইরাসের সদৃশ অনেকগুলো ভাইরাস তৈরি হয়। এ প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তা হল–

- এইচআইভি ভাইরাসের সাথে সিডি-৪ রিসেপ্টরের বন্ধন
- মেমব্রেন ফিউশনের মাধ্যমে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ
- রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন (Reverse Transcription)
- ইন্টিগ্রেশন (Integration)
- প্রোভাইরাল ট্রান্সক্রিপশন (Proviral transcription)
- জিন এক্সপ্রেশন (Gene expression)
- অ্যাসেম্বলি (Assembly)
- বাডিং (Budding)
- ম্যাচুরেশন (Maturation)

কোষে ভাইরাস প্রবেশের পর যা হয়
এইচআইভি চক্র

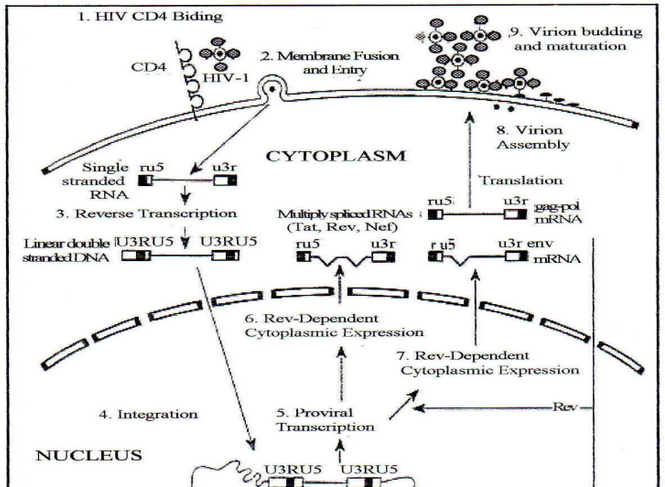

এইচআইভি ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভাইরাস বিস্তারের এই ধাপগুলো ভাল করে জানা থাকতে হয়।

এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে যা ঘটে তা হল ভাইরাসের আবরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এনভেলাপ প্রোটিন জিপি-১২০ এর সাথে ইমিউন কোষের বহিরাবরণে সিডি-৪ রিসিপ্টরের সাথে সংযোগ স্থাপন। এটাকে এইচআইভি এনভেলপ-সিডি-৪ বাইন্ডিং (HIV env-CD_4 Binding) বলে।

এরপর ঘটে কোষ আবরণ বা সেল মেমব্রেনের সাথে ভাইরাসের ফিউশন। এটাকে মেমব্রেন ফিউশন বলে। এই মেমব্রেন ফিউশনকে সফল করার ক্ষেত্রে ভাইরাসের

এনভেলাপ গ্লাইকোপ্রোটিন জিপি-৪১ এর ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা HIV-1 কেন্দ্র বস্তুর সাথে কোষের সাইটোপ্লাজমের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে। এই মেমব্রেন ফিউশনের মাধ্যমে ভাইরাস কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তবে এই মেমব্রেন ফিউশনের পূর্বেই সিডি-৪ নামক গ্লাইকোপ্রোটিনটি ম্যাক্রোফেজ ও সিডি-৪+ টি-লিম্ফোসাইটের বহিরাবরণে আটকে ফেলতে পারে।

এ পর্যায়ে এন্টি-সিডি-৪ এন্টিবডি সুনির্দিষ্টভাবে ভাইরাসকে আক্রমণ করে প্রতিরোধ করতে পারে। সিডি-৪ জাতীয় এই গ্লাইকোপ্রোটিন ভাইরাসের জিপি-১২০ জাতীয় আস্তরণের সাথে শক্ত বন্ধন তৈরি করে সম্পূর্ণ ভাইরাসটিকেই অচল করে দিতে পারে। একাজ করতে যেয়ে সিডি-৪ কোষ নিজেও আক্রান্ত হয় ভাইরাস দ্বারা।

মেমব্রেন ফিউশনের পর যা ঘটে তা হল কোষের সাইটোপ্লাজমের ভেতরে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। এই প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত কোষের সাইটোপ্লাজমে ভাইরাসের আরএনএ জেনোমের একটি ডিএনএ কপি তৈরি হয়। এই ডিএনএ কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে ক্রোমোজোমাল ডিএনএ'র সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রোভাইরাস তৈরি করে।

কোষের মধ্যে যা ঘটে তা হল ইন্টিগ্রেশন, প্রোভাইরাল ট্রান্সক্রিপশন এবং পুনরায় নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে ফিরে আসা বা সাইটোপ্লাজমিক এক্সপ্রেশন।

প্রোভাইরাল ট্রান্সক্রিপশন-এর পরে প্রোভাইরিয়ন দুটি প্রক্রিয়ায় কোষের সাইটোপ্লাজমে ফিরে আসে। এ প্রক্রিয়ার নাম সাইটোপ্লাজমিক এক্সপ্রেশন। এরপর ভাইরিয়নগুলো সাইটোপ্লাজমের মেসেঞ্জার আরএনএ ব্যবহার করে কোষ প্রাচীরের ভেতরে সমবেত হয়। এরপর ঘটে কোষের বাইরে বাডিং এবং পুনঃভাইরাস তৈরিকরণ।

রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ভাইরাস তার কোর আরএনএ (ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত আরও একটি জেনেটিক হাতিয়ার) এবং রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এনজাইম এমনভাবে প্রয়োগ করে যাতে ভাইরাসের আরএনএ কোর ডিএনএ'তে রূপান্তরিত হয়। এই ডিএনএ'টি দুটি লম্বা সুতোর মত। একে লিনিয়ার ডাবল স্ট্রানডেড ডিএনএ (Linear double stranded DNA) বলে।

এই ডিএনএ বা রূপান্তরিত এইচআইভি কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াটিকেই ইন্টিগ্রেশন বলে। এ পর্যায়ে ভাইরাসের ডিএনএ কমপ্লেক্সটি তার ভাণ্ডারের ইন্টিগ্রেস প্রোটিন নামক এনজাইমের সহযোগিতায় আক্রান্ত কোষের ক্রোমোজোমাল ডিএনএ-এর সাথে সংযুক্ত হয়। ইন্টিগ্রেশনের পর প্রোভাইরাল ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। ভাইরাসের নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বা জেনেটিক বস্তুগুলো আক্রান্ত কোষের ডিএনএ-এর সাথে যুক্ত হয়ে নিজস্ব সংকেতবাহী যে নিয়ন্ত্রক ডিএনএ তৈরি করে তাকে প্রো-ভাইরাস বলে।

এ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত কোষের মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য ডিএনএ চেইন বা শৃঙ্খলে একই সাথে ভাইরাসের ধ্বংসাত্মক ডিএনএ সংকেত এবং কোষের অন্তর্গত ডিএনএ সংকেত উপস্থিত থাকে। কেননা রেট্রোভাইরাল ডিএনএগুলো আক্রান্ত কোষের ডিএনএ-এর বিশেষ বিশেষ স্থানে সংযোগ স্থাপন করে। কোন কোন স্থানের প্রতি এই সংযোগ ঘটাবার প্রবণতা বেশি থাকে। তবে যে কোষে এই পরিবর্তিত ডিএনএ একই সঙ্গে কোষ ও ভাইরাসের নানা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তাকে একটি অসুস্থ কোষ বলা যায়। কেননা এই কোষ সংঘবদ্ধভাবে নিজেরাই নতুন ভাইরাস তৈরির নির্দেশ দেয়।

আরেকটু বিস্তারিত বলতে গেলে, এ প্রক্রিয়ায় যা ঘটে তা হল–

এ প্রক্রিয়ায় ভাইরাল নিউক্লিয়োপ্রোটিন এবং রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন (RT) নামক এনজাইম কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থান নেয়। এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এনজাইম আক্রান্ত কোষের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়োপ্রোটিন কমপ্লেক্স সিনথেসিস করে ভাইরাল আরএনএ জেনোমের একটি ডিএনএ কপি তৈরি করে। এরপর ভাইরাল ডিএনএ কমপ্লেক্সটি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে। সাথে নিয়ে যায় ভাইরাস সংশ্লিষ্ট এনজাইমগুলোকেও। এই কোষকেন্দ্রেই ইন্টিগ্রেস প্রোটিন নামক এনজাইমটি ভাইরাল ডিএনএ-কে হোস্ট ক্রোমোজমের ডিএনএ-এর সাথে সংযুক্ত করে প্রোভাইরাস তৈরি করে।

এই ইন্টিগ্রেটেড প্রোভাইরাস দু'ধরনের ভাইরাল আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে। এর মধ্যে স্প্লাইসড এমআরএনএ (Spliced mRNA's) এবং আনস্প্লাইসড আরএনএ (Unspliced RNA) নিজস্ব সংকেত ব্যবহার করে দু'ধরনের ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করে, যেগুলোর একটি হল ম্যাট্রিক্স গ্যাগ প্রোটিন, অন্যটি ক্যাপসিড গ্যাগ প্রোটিন। পরেরটি ভাইরাল কোড তৈরি করতে অত্যাবশ্যক।

এরপর ঘর গোছানো। গ্যাগ এবং গ্যাগ-পোল ভাইরাল পলিপ্রোটিনের সাথে জেনোমিক ভাইরাল ডিএনএ একত্রিত হয়ে হোস্ট কোষের গায়ে নতুন ভাইরাস তৈরি করে। এরপর এগুলো যখন হোস্ট কোষের বহিরাবরণ বা মেমব্রেন ঠেলে ফুটে বেরুতে চায় তখন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পাতলা চর্বির আবরণটি (এনভেলপ) সংগ্রহ করে নেয়। এই ফুটে বেরুনোকে বলে বাডিং। এ প্রক্রিয়া চলাকালে ভাইরাল প্রোটিয়েস এনজাইম গ্যাগ এবং গ্যাগ পোল প্রিকারসর বা অগ্রদূত (gag-pol precursor) প্রোটিনগুলোকে ব্যবহার করে পরিণত ভাইরাস তৈরি করে। সেই সাথে রোগ সংক্রমণ ঘটাতে করতে পারে এমন অসংখ্য ভাইরিয়ন ছড়িয়ে দেয়। এই ভাইরাস আরও নতুন কোষকে আক্রমণ করে।

আক্রমণের এক পর্যায়ে এই প্রো-ভাইরাল ডিএনএ আক্রান্ত কোষের মধ্যে যে পূর্ণদৈর্ঘ্য ডিএনএ শৃঙ্খল তৈরি

করে তার মধ্যে আক্রান্ত কোষের ডিএনএ সংকেতও বিদ্যমান থাকে। এই নতুন ডিএনএ'র মধ্যে ভাইরাসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এগুলো অন্যান্য কোষকে একত্রিত করে আরও নতুন ভাইরাস তৈরির নির্দেশ দেয়। এইসব ভাইরাস নতুন নতুন কোষকে আক্রমণ করে এবং আরও আরও ভাইরাস তৈরি হয়। এটাই এইচআইভি চক্র।

১.৪.৩ এক নজরে এইচআইভি চক্রঃ

HIV-1 ভাইরাসের চক্রবৃদ্ধি সম্পন্ন করার জন্য প্রথমেই এনভেলপ প্রোটিনের সাথে হোস্ট কোষগাত্রের সংযোগ সাধিত হয়। এই সংযোগের ফলে ভাইরাস এবং কোষের আবরণের মধ্যে এমন ধরনের বন্ধন বা ফিউশন ঘটে যাতে ভাইরাসের নিউক্লিয়োপ্রোটিন কমপ্লেক্সটি টার্গেট কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই জটিল বন্ধনের মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস নামক এনজাইম (R.T) ভাইরাসের RNA জেনোমের DNA কপি তৈরি করে। এই DNA সমৃদ্ধ ভাইরাস কমপ্লেক্সটি কোষের নিউক্লিয়াসে পৌছে। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইন্টিগ্রেস প্রোটিন (IN) ভাইরাস DNA ও হোস্ট ক্রমোজোমাল DNA এর মধ্যে একীভবন সাধিত করে প্রোভাইরাস তৈরি করে। এরপর এই একীভূত প্রোভাইরাস খন্ডিত (spliced) এবং অখন্ডিত (unspliced) ম্যাসেঞ্জার mRNA তৈরি করে। ম্যাসেঞ্জার RNA এর সংকেতে যথাক্রমে গ্যাগ ও গ্যাগ পোল প্রোটিন এর মত অবকাঠামোগত প্রোটিন ও নিয়ন্ত্রক ভাইরাস প্রোটিন তৈরি করে। ভাইরাল পার্টিকেলের মধ্যে স্থান নেওয়া ভাইরাল RNA গ্যাগ ও গ্যাগ পোল প্রোটিনগুলো হোস্ট কোষ বা আশ্রয় দাতা কোষের গাত্রে অবস্থান নেয়। কোষগাত্র থেকে কুঁড়ির মত বেরিয়ে পড়বার সময় ভাইরাস পার্টিকেলগুলো দ্বিস্তর স্নেহবিশিষ্ট একটি এনভেলপ নিয়ে বের হয়। নতুন ভাইরাস নির্গমন বা বাডিং এর সময় ভাইরাল প্রোটিয়েস (Viral protease) গ্যাগ ও গ্যাগ পোল প্রিকারসর প্রোটিনকে পরিণত ভাইরাসের গাত্রে সংযোজন করে মারণক্ষমতা সম্পন্ন ইনফেকশাস ভাইরিয়ানস তৈরি করে।

১.৪.৫ HIV বাডিং এ প্রোটিয়েস এর ভূমিকাঃ

আক্রান্ত কোষ থেকে নতুন ভাইরাস বাডিং এর সময় কিংবা বাডিং পরবর্তী অবস্থায় যখন গ্যাগ ও গ্যাগ পোল পলিপ্রোটিনগুলো পরিণত প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয় তখনই রেট্রোভাইরাস পার্টিকেলগুলো পরিণত ভাইরাসে রূপ নেয়। গ্যাগ ও গ্যাগ পোল প্রোটিনের সাথে এই বন্ধন সম্পন্ন করে ভাইরাল প্রোটিয়েস। PR (Viral protease) এমন একটি এসপারটাইল প্রোটিয়েস যার মধ্যে দুটি সমদৃশ্য এমাইনো অ্যাসিডের (৯৯) ইউনিট থাকে। প্রোটিয়েস এর এই বন্ধন রেট্রোভাইরাস পার্টিকেলগুলো পরিণত করার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভাইরাল প্রোটিয়েসের মিউটেশন বা

পরিবর্তন এমন ধরনের সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাস তৈরি করে যাতে কোর প্রোটিনটি বন্ধহীন অবস্থায় থাকে। প্রোটিয়েসের কারণেই পরিণত ভাইরিয়নগুলো কোষ থেকে নির্গত হয়ে নতুন কোষ আরও ভাইরাসের প্রতিলিখন নিশ্চিত করে।

১.৪.৬ কোষ কেন্দ্রাভিমুখী ভাইরাল প্রোটিনের প্রতিরোধ :

কোষের আবরণের সাথে ফিউশনের পরে ভাইরাল নিউক্লিয়োপ্রোটিন কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কোষ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের দিকে এগোয়। মানব শরীরের যে সমস্ত কোষের বিভাজন হয়না তার মধ্যেও এইচআইভি ও অন্যান্য লেনটি ভাইরাস নিজেদের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর সম্ভাব্য কারণ হল, এইচআইভি-১-এর মধ্যে মেট্রিক্স প্রোটিনের মাধ্যমে কোষ কেন্দ্র শনাক্ত করে সেখানে পৌঁছাবার মত ক্ষমতা ধারণ। একারণে এমন একটি পেপটাইড (Peptide)-এর কথা চিন্তা করা হল যা কি না সাইটোপ্লাজম থেকে ভাইরাসের কেন্দ্রাভিমুখী পরিভ্রমণকে বাতিল করে একে সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই ধ্বংস করতে পারে।

এভাবে মনোসাইট জাতীয় টার্গেট কোষের মধ্যে এইচআইভি অকার্যকর হবার কথা। এ কাজে সমস্যা তৈরি হবারও কথা। এই সমস্যা তৈরি করে ভাইরাসে বিদ্যমান ঐ সমস্ত প্রোটিন, যা ভাইরাসের প্রি-ইন্টিগ্রেশন কমপ্লেক্স (Pre-integration complex)-কে কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় এইচআইভি-১-এর ভিআইএফ প্রোটিন বাধাগ্রস্ত না হওয়ায় তা ভাইরাল ডিএনএ সিনথেসিস সম্পাদন করতে পারে।

১.৫.১ এইচআইভি এবং এইডসের মধ্যে তফাৎ কী?

এইচআইভি হল ভাইরাসটির নাম, যার সম্পূর্ণ নাম হল Human Immunodeficiency Virus। আর এই ভাইরাসটি মানবদেহের রক্তে প্রবেশের পর শ্বেতকণিকাকে অকার্যকর করে দিয়ে যে রোগটি তৈরি করে তার নাম এইডস। এইডস কোন একটি বিশেষ রোগ নয়। এটি অনেকগুলো রোগের সম্মিলিত প্রকাশ। এ রোগগুলো হয়ে থাকে শরীরের ইমিউন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণে।

এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করলেই শতভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমণ হবে এমনটাও ঠিক না। তবে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, যদিও রোগ সংক্রমণের প্রথমদিকে অনেকেই সুস্থ থাকে। অনেক সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে বছরের পর বছর লেগে যায়।

১.৬.১ বিভিন্ন ঘাতক ভাইরাসের চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

হেপাটাইটিস এ ভাইরাস মুখের লালা, বমি, মলমূত্র ইত্যাদি বর্জ্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। এই ভাইরাস পরিবেশে অনেক দিন টিকে থাকে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সাধারণত রক্তপরিসঞ্চালন ও যৌনসংযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। হেপাটাইটস বি ভাইরাস বিশেষ

ক্ষেত্রে লালা ও মলের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। অনেক গবেষক এ ক্ষেত্রে মুখের মিউকোসার ক্ষতকে রোগ সংক্রমণের শর্ত হিসাবে গণ্য করে থাকেন। হেপাটাইটিস সি ভাইরাস রক্তপরিসঞ্চালন ও ইনজেকশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। হেপাটাইটিস এ ও বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন থাকলেও সি ভাইরাসের ভ্যাকসিন এখনও তৈরি হয়নি।

এইচআইভি ভাইরাসটি দ্রুত পরিবর্তশীল রেট্রোভাইরাস। এটি মূলত: যৌনসংযোগ, রক্তপরিসঞ্চালন ও ইনজেকশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের দেহ থেকে নির্গত ভাইরাস নবজাতক বহন করতে পারে এবং মায়ের দুধ থেকে শিশুর দেহে ভাইরাস ছড়াতে পারে। যোনিরস, বীর্যসহ দেহের সকল তরল নিঃসরণে এই ভাইরাস থাকে।

এইচআইভি বাতাসে উড়তে পারে না, কিন্তু করোনা ভাইরাস ও ফ্লু ভাইরাস ড্রপলেট আকারে অর্থাৎ হাঁচি, কাশি, নাকের পানি ইত্যাদি থেকে নিঃসৃত হয়ে ছড়াতে পারে। এইচআইভি ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে বিশুদ্ধ পানিতে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে পানিতে এটা খুব দ্রুত মারা যায়, বিশেষ করে ক্লোরিনযুক্ত পানি এবং ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে এসে। ক্লোরিন প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে এইচআইভিকে মেরে ফেলতে পারে।

ল্যাবরেটরি কন্ডিশনে অর্থাৎ বিশেষ পরিবেশে টেবিল, চেয়ার, মেঝে ইত্যাদির ওপরে এইচআইভি কিছুক্ষণের জন্য হলেও টিকে থাকতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে টেবিলের ওপরে, আসবাবপত্রের ওপরে, মেঝের ওপরে টিকে থাকা এইচআইভি'র জন্য অনকটা অসম্ভব। শুকনো অবস্থায় ডিটারজেন্ট এবং কেমিক্যালস-এর সংস্পর্শে তো এটি মারা পড়েই, সামান্য উচ্চতাপ এবং পরিমিতি আল্ট্রাভায়োলেট রে-তেও এটা নিশ্চিহ্ন হয়।

৫৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এইচআইভি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ কারণে এ তাপমাত্রায় রক্তকে পাস্তুরাইজড করা হয় এবং বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করা হয়। তবে হেমোফাইলিয়া রোগীদেরকে ফ্যাক্টর-৯ দেয়ার পূর্বে তা ৬৮° তাপমাত্রায় ৭২ ঘন্টার জন্য ড্রাই হিট করা হয়। সাধারণভাবে ফুটালে ভাইরাস দ্রুত মারা যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে স্টেরিলাইজেশনের জন্য এটা খুব সহজ পদ্ধতি।

তবে এর পরেও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইচআইভি অনেক সময় শুকনো রক্তে বেঁচে থাকতে পারে। তাই আক্রান্তের রক্ত তা তাজা হোক, কিংবা শুকনো হোক– এড়িয়ে চলতে হবে এবং এদের রক্তসিক্ত ব্যবহার্যগুলো ডিটারজেন্ট, ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এগুলো ধোয়ার সময় রাবার গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

এইচআইভি বাতাসের সংযোগে আসলে আর বাঁচতে পারে না। কোষের মধ্যে এবং শরীরের তরল পদার্থে অবস্থান গ্রহণ করে নিজস্ব আবরণের মধ্যেই এরা বেঁচে থাকে। মানুষের শরীরের বাইরে রক্ত অথবা স্পার্ম ব্যাংকে রক্ষিত বীর্য ছাড়া এইচআইভি বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না।

১.৬.২ অন্যান্য রেট্রোভাইরাসের সাথে এইচআইভি-এর সম্পর্ক :

এইচআইভি, এইচটিএলভি-১, এইচটিএলভি-২ এদের সবগুলোই আরএনএ নির্ভর রেট্রোভাইরাস এবং এদের সবার মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেসর নামক এক রকম এনজাইম রয়েছে। এ তিনটি ভাইরাস রক্তে এবং শরীরের তরল অংশে অবস্থান নেয়। এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল শরীরের শ্বেতকণিকা। তবে এদের মধ্যে অমিল হল, এইচআইভি দ্বারা যে রোগ তৈরি হয় তার নাম এইডস এবং এইচটিএলভি-১ দ্বারা যে রোগ ঘটে তার নাম লিউকোমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার। এইচটিএলভি-২ও এক জাতীয় লিউকোমিয়া তৈরি করে।

এইচআইভি এবং এইচটিএলভি উভয়ই রক্তের শ্বেতকণিকাকে আক্রমণ করলেও এদের আক্রমণ পদ্ধতিটি ভিন্ন, যেমন ভিন্ন ভাইরাস উদ্ভূত রোগ দুটি। লিউকোমিয়ার কারণে দ্রুত শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয় এবং অসংখ্য অপরিণত শ্বেতকণিকা তৈরি হয়। তবে ইমিউন কোষের সিডি-৪ স্থানটি এর লক্ষ্য নয়। অন্যদিকে এইচআইভি ইমিউন ব্যবস্থা ও শ্বেতকণিকাকে ধ্বংস করে। তবে এইচটিএলভি যেমন এইডস তৈরি করে না, এইচআইভিও তেমনি লিউকোমিয়া তৈরি করে না।

এইচআইভি'কে আমরা শনাক্ত করেছি ৫০ বছর আগে। কিন্তু রক্তের ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া যা কি না এইচটিএলভি'র কারণে ঘটে থাকে তার উৎপত্তি ঘটেছে কয়েকশ' বছর আগে।

১.৬.৩ HILV-1 এবং HTLV-2 এর তফাৎ

এইচআইভি-১ ও এইচআইভি-২ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রেট্রোভাইরাস দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয় সেগুলো হল হিউম্যান টি-কোষ লিউকোমিয়া ভাইরাস (Human T-cell Leukaemia virus Type-1, 2) বা $HTLV_1$ এবং $HTLV_2$। আরেকটি হল ইডিয়োপ্যাথিক সিডি-৪+ টি-লিম্ফোসাইটোপেনিয়া (Idiopathic CD_4 +T Lymphocytopenia) বা ICL ভাইরাস।

Human T-cell leukaemia অথবা T-lymphotropic virus type-1 ($HTLV_1$):

এটি এমন এক ধরনের রেট্রোভাইরাস যা শরীরে নীরব বা ক্যারিয়ার স্টেটে থাকতে পারে অথবা নানাবিধ মিশ্র রোগ বা ক্লিনিক্যাল সিনড্রমের প্রকাশ ঘটাতে পারে। এ রোগে স্নায়ু সম্পর্কিত অসুখ Tropical Spastic

Paraparesis and Myelopathy, হতে পারে। এতে বিশেষ ধরণের চর্মরোগ (cutaneous lesions), বড়দের T-cell leukaemia বা রক্তের ক্যান্সার এবং লিম্ফোমা হতে পারে। এতে লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলো ফুলতে পারে, যকৃত ও প্লীহা বাড়তে পারে, রক্তে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পেতে পারে। ত্বকে বিশেষ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে অথবা এ ভাইরাস শরীরে নীরব থাকতে পারে। নীরব থাকা অবস্থাকে লক্ষণবিহীন ক্যারিয়ার স্টেট (carrier state) বলে। এ ভাইরাসটি যৌনসংযোগ, রক্ত পরিসঞ্চালন ও ইনজেকশনের মাধ্যমে একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে এবং মায়ের দেহ থেকে খুব সহজেই গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ইনফেকশন হবার পর রোগ প্রকাশের ব্যবধান ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

$HTLV_2$:

এমন এক ধরনের রেট্রোভাইরাস যা কি না $HTLV_1$-এর সমগোত্রীয় এবং উক্ত ভাইরাসের সাথে ইমিউনোলজিক্যালি ক্রস রিয়্যাকটিভ। এজন্য $HTLV_2$ সাধারণ স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা কঠিন। এইচটিএলভি-২ এর সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। দূষিত সূঁচ ও রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এ ভাইরাস একজন থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে পড়ে।

Idiopathic CD_4+T-lymphocytopenia (ICL) :

ICL এমন একটি রোগকে বুঝায় যা আপাতভাবে দেখতে এইডসের মত। এতে রোগীর দেহে এইচআইভি সংশ্লিষ্ট রোগগুলো দেখা দেয়। সেই সাথে সিডি-৪ কোষের সংখ্যা নেমে যায় তিনশ'র নিচে। এ রোগটি এইচআইভি'র সাথে সম্পর্কিত না হলেও এর সাথে রক্তবাহিত একটি ভিন্নধর্মী রেট্রোভাইরাসের সম্পর্ক রয়েছে। রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াচ্ছে। তবে এটি নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

১.৭.১ এইচআইভি ভাইরাস কি পরিবর্তনশীল?

হ্যাঁ, এটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং এর নিয়মিত মিউটেশন ঘটে থাকে। মিউটেশন কথাটির অর্থ হল জিন সংক্রান্ত পরিবর্তন।

নতুন ভাইরাস তৈরির সময় গোলমেলে ডিএনএ নিয়ে যে ভাইরাস তৈরি হয় তাদেরকে এইচআইভি মিউটেটস বলা হয়। এইচআইভি মিউটেশন নিয়মিত হয়ে থাকে এবং নতুন নতুন স্ট্রেইনের ভাইরাস তৈরি হয়। কোন কোন ভাইরাস ধীরগতি সম্পন্ন অর্থাৎ সময় নিয়ে রোগ তৈরি করে। কোন কোনটি আবার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এইচআইভি স্ট্রেইনগুলোকে ভিরুলেন্ট স্ট্রেইন বলে। এই স্ট্রেইনের ভাইরাস দ্বারা রোগ দ্রুত ছড়ায়। রোগের লক্ষণও দ্রুত প্রকাশ পায় এবং বিপর্যয়ও বেশি হয়। এটা নিয়ন্ত্রণ করা চিকিৎসকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

১.৭.২ এইচআইভি ভাইরাসটি কতদিন পর এবং কীভাবে শরীরে প্রতিক্রিয়া ঘটায়

কেউ এইচআইভি সংক্রমিত হলে সাধারণত ২ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে সেরোকনভারশন (Seroconversion) হয়। এইচআইভি সংক্রমণের সুপ্ত অবস্থা থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশের সময়টি এক থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে একযুগ পরেও রোগের লক্ষণ দেখা দেয়নি, এমন উদাহরণও রয়েছে। এই দীর্ঘ সময় রোগের লক্ষণ শরীরে চাপা থাকতে পারে। এটাকে ইনকিউবিশন পিরিয়ডও বলে।

১.৮.১ সংক্রমণের পর শরীরে এইচআইভি'র নীরব অবস্থা :

এইচআইভি আক্রান্ত-পরবর্তী প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরও একজন দীর্ঘসময় সুস্থ থাকতে পারে। এ সময় ভাইরাস খুব ধীরে ধীরে দেহের ইমিউন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে থাকে, কিন্তু বাইরে এর কোন লক্ষণ থাকে না। এ অবস্থাকে অনেকে লক্ষণবিহীন এইচআইভি সংক্রমণ বলে।

১.৮.২ এইচআইভি ল্যাটেন্সি (Latency):

এইচআইভি ভাইরাস অনেকসময় কোষের মধ্যে অবস্থান নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু তার কোন বৃদ্ধি ঘটে না। এ অবস্থাকে এইচআইভি ল্যাটেন্সি বলে।

এই সুপ্ত সংক্রমণ তখনই ঘটে যখন কোষ অন্তর্গত জিনের সাথে এইচআইভি জিন নীরব বন্ধন করে অবস্থান করে। এই সংক্রমণটি শরীরের ইমিউন ব্যবস্থাও অনেক সময় শনাক্ত করতে পারে না। ল্যাটেন্সির সাথে লক্ষণবিহীন সংক্রমণের তফাৎ হল এই যে, লক্ষণবিহীন সংক্রমণে ভাইরাস বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু ল্যাটেন্সিতে তা ঘটে না। অনেক সময় রোগের লক্ষণ থাকা অবস্থাতেই ভাইরাস এই সুপ্ত অবস্থায় চলে যেতে পারে।

লক্ষণবিহীন অবস্থায় এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের শরীর থেকে অন্যের শরীরে ভাইরাস ছড়াতে পারে।

১.৮.৩ এইচআইভি ক্যারিয়ার (Carrier) অবস্থা :

যেসব ক্ষেত্রে এইচআইভি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ দশ বছরের বেশি সময় শরীরে থাকে কিন্তু লক্ষণের প্রকাশ ঘটায় না তখন তাকে রোগের ক্যারিয়ার অবস্থা বলা হয়। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ১০ ভাগ এরকম অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে।
এইচআইভি'র ক্যারিয়ারের বিষয়টি এসটিএলভি-১, সিএমভি এবং হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের ক্যারিয়ার অবস্থার কাছাকাছি।

১.৯.১ এইচআইভি'তে আক্রান্ত হবার পর কখন এইডস হয় না?

সাধারণত ভাইরাস আক্রমণের পর কোন না কোন সময় এইডস দেখা দেয়। কারও কারও ক্ষেত্রে (পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১০ ভাগ ক্ষেত্রে) শরীরে ভাইরাস প্রবেশ

করার পরেও তা বছরের পর বছর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। দশ বছর পরেও দেখা যায় যে, এদের মধ্যে এইডস দেখা দেয়নি। আবার অনেকের দেহে আশ্চর্যজনক প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকার কারণে সেরোপজিটিভ ব্যক্তির সঙ্গে যৌনমেলামেশার পরেও এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে না এবং পরীক্ষায় তাদের রক্ত সেরোনেগেটিভ থাকে। এইসব ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হলেন ম্যাজিক জনসনের স্ত্রী। এরকম বেশ কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের স্বামী বা স্ত্রী এইচআইভি সংক্রমিত হবার পরেও যেকোন একজন সঙ্গী অত্যাশ্চর্যজনকভাবে সুস্থ রয়েছে।

১.৯.২ এইচআইভি আক্রান্ত একজনের জীবন কতটুকু দীর্ঘায়িত হতে পারে?

এইচআইভিতে আক্রান্ত হবার পর এবং এইডস রোগের লক্ষণগুলো দেখা দেয়ার পর কে কতদিন বাঁচতে পারবে বা বাঁচবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অনুমান করা না গেলেও গবেষকরা দেখেছেন, যারা দূষিত রক্ত গ্রহণের কারণে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটেছে। হেমোফাইলিয়াকদের (Haemophiliacs) মধ্যে রোগের দ্রুত অবনতির বিষয়টি প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়। এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মধ্যেও নানা কারণে রোগটি বিপজ্জনক গতিতে এগোয়। বিবিধ রোগের কারণে দুর্বল শারীরিক অবস্থা এবং সেই সাথে অধিক মাত্রায় ভাইরাসের অনুপ্রবেশ এর জন্য দায়ী।

তুলনামূলকভাবে যৌনসংযোগের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের চেয়ে রক্তের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের হার অনেক বেশি। তবে দুর্ঘটনাক্রমে কারও যদি ভিরুলেন্ট ভাইরাসের সাথে সংযোগ ঘটে সেক্ষেত্রেও যৌনসংযোগের পরে দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণের পর একেক জনের ইমিউন ব্যবস্থা একেক ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ কারণে একেক জনের দেহে রোগের প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ এবং বিস্তার একেক রকম হয়ে থাকে। এইচআইভি আক্রান্ত দের পরিণতি অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ রোগে আক্রান্ত রোগীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে না।

এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য যে ধরনের পরিবেশ ও রোগের উপস্থিতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে ভাইরাস সংক্রমণের কো-ফ্যাক্টর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, ল্যাবে বিশেষ মাত্রায় আলট্রাভায়োলেট লাইট এইচআইভিকে উজ্জীবিত করে। অন্যান্য কো-ফ্যাক্টরের বিষয়গুলো এই গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১.১০.১ এইডসের শ্রেণীবিভাগঃ

'৮০-এর দশকে এইডস রোগকে ভাগ করা হয়েছিল চারটি গ্রুপে–

গ্রুপ ১. শীর্ষ পর্যায়ের ইনফেকশন বা Acute infection

গ্রুপ ২. লক্ষণবিহীন ইনফেকশন

গ্রুপ ৩. সমস্ত শরীরের লিম্ফগ্ল্যান্ড বা লসিকা গ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়া এবং

গ্রুপ ৪. স্নায়ুবিক বিপর্যয়ের সাথে রোগের উপস্থিতি।

১৯৯৩ সনে A, B এবং C- এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় এইডস রোগকে–

ক্যাটাগরি A : লক্ষণবিহীন এবং প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাকিউট সংক্রমণ (Acute infection)। যেমন, লসিকা গ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়াকে A ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্যাটাগরি B : এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হল সেই সব রোগী যাদের মধ্যে লক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে।

ক্যাটাগরি C : যখন এইডসের সহযাত্রী (Associated) রোগগুলোর প্রকাশ ঘটে।

সিডি-৪ ও টি-কোষ-এর সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি ক্যাটাগরিকে আবার তিনভাগে বিভাজন করা হয়েছে; যথা– C_1, C_2, C_3 ইত্যাদি। যেমন–সিডি-৪ কোষ (প্রতি ঘন মিলিলিটারে) ৫০০-এর ওপর হলে তা হয় C_1 ক্যাটাগরির অন্তর্গত, ২০০-৪৯৯ এর মধ্যে হলে C_2, ২০০-এর নিচে হলে C_3 - এরকম।

১.১১.১ এইচআইভি ল্যাটেন্সিঃ

এইচআইভি ল্যাটেন্সি বা এইচআইভি ভাইরাসের ঘুমন্ত অবস্থার ব্যাপারে অনেকগুলো মত ও সংজ্ঞা রয়েছে। ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান লক্ষণগুলোর অনুপস্থিতির সময়কে এইচআইভি ল্যাটেন্সি বলে। এই সময় Immunodeficiency পরিলক্ষিত না হলেও অল্প কিছু কোষ ভাইরাসকে ধারণ করে রাখে এবং অতি ধীর গতিতে ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে। সম্প্রতি নিবিড় গবেষণায় দেখা গেছে HIV replication এবং virus expression সব সময়ই সচল থাকে, তার মানে HIV infection এর ধারাটি কখনই থেমে থাকে না। রক্ত এবং লসিকগ্রন্থিতে বিদ্যমান এইচআইভি আক্রান্ত কোষগুলো বিশ্লেষণ করে, ভাইরাস DNA প্রোটিন সিনথেসিস পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, অনেক আক্রান্ত কোষই নির্ণয় করা যায় এমন পরিমান এইচআইভি জিন তৈরি করে না। সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, এইচআইভি ধারণ করছে এমন অনেক কোষ, অতি নগণ্য মাত্রায় ভাইরাস RNA এবং প্রোটিন সিনথেসিস করতে পারছে। এ কারণেই এইচআইভি ল্যাটেন্সি সংক্রান্ত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে।

মূলত: এইচআইভি ভাইরাসের পার্টিকেলগুলো বা ভাইরাস বার্ডেন রক্ত শিরায় অবস্থান না করে লসিকাগ্রন্থির মধ্যে আপেক্ষিকভাবে নিশ্চুপ অবস্থায় থাকে।

রক্তের মধ্যে ভাইরাস পার্টিকেল বা ভাইরাস বার্ডেন না থাকায় রোগ শনাক্ত করা যায় না। এতে এমন ভ্রমাত্মক ধারণা হয় যে ভাইরাস বৃদ্ধি আদৌ ঘটছে না। অর্থাৎ এইচআইভি ভাইরাসের ঘুমন্ত অবস্থা, ল্যাটেন্সি ইত্যাদি বিষয়গুলো আসলে লক্ষণহীন পার্যায়ে ভাইরাস বৃদ্ধির কয়েকটি স্তর মাত্র।

১.১২.১ এইচআইভি রোগের নতুন সংজ্ঞা:

১৯৮৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ড্রাগ কন্ট্রোল বা সিডিসি এইচআইভি রোগকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করার জন্য এর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করে। এইচআইভি ইনফেকশনের বড় প্রমাণ হল আক্রান্ত মানুষের শরীরে কোষ থেকে এইচআইভি ভাইরাস আইসোলেশন ও ভাইরাস শনাক্তকরণ। তবে এই প্রক্রিয়াটি জটিল হওয়ায় এবং এটি অনেক সময় সম্ভব না হওয়ায়, এইচআইভি স্ক্রিনিং ও ওয়েস্টার্ণ ব্লট টেস্টের উপর জোর দেয়া হয়। সরাসরি বা পরোক্ষ ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্তকরণের সাথে সাথে এইচআইভি রোগের ক্লিনিক্যাল প্রকাশকে রোগের শক্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত রোগ ও লক্ষণের প্রকাশকে সিডিসি এইডস রোগের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে তা অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার আগে রোগের উপস্থিতির আগাম সংকেত দেয়।

শুরুতে সিডি-৪ কোষের সংখ্যা ৫০০-তে নেমে এলে তাকে এইডস বলে ধরে নিলেও ১৯৯৩ সনের নতুন সংজ্ঞায় রোগ নির্নয়কে নির্ভূল করবার জন্য প্রতি মিলিলিটার রক্তে সিডি-৪ কোসের সংখ্যা ২০০-কে রোগ নির্ণয়ের সূচক হিসাবে নির্ধারণ করে। এর ফলে দেখা যায় যে,

- সিডি-৪ কোষ ২০০-তে নেমে আসার আগেই শতকরা ১০ ভাগ রোগী এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে।
- তবে এ প্রক্রিয়ায় রোগ শনাক্ত হবার আগে মারা গেছে এমন একজনকেও পাওয়া যায়নি।
- এ প্রক্রিয়ায় রোগের লক্ষণ দেখা দেবার পর রোগ নির্ণয়ের জন্য গড়ে ১২-১৮ মাস সময় পাওয়া যায়।

এইচআইভি রোগের সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করায় সাময়িকভাবে এইডস আক্রান্তদের পরিসংখ্যানের ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এতে প্রাথমিক হিসাবে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসলেও রোগের লক্ষণসহ এইচআইভি পজিটিভ রোগীর

সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। রোগ নির্ণয়ে ভুলগুলো এড়াতে এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি।

১.১৩.১ এইডস বনাম এইচআইভি রোগঃ

এটা এখন পরিষ্কার যে, এইচআইভি রোগের কারণে ইমিউনিটি বা শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় নানা রোগের সংক্রমণসহ যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তাকে এইডস বলা হয়। এ রোগের সংজ্ঞাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সনে। ঐ সময় সিডিসি (সেন্টার ফর ড্রাগ কন্ট্রোল) এ সংজ্ঞাটি তৈরি করে এবং পরবর্তীতে নতুন কিছু সিনড্রমকে এ সংজ্ঞার অর্ন্তভূক্ত করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে লক্ষণবিহীন অবস্থায় নীরবে সমাজে বসবাস করছে এবং যাদের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি তারা এ সংজ্ঞার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারাই এইডসের সংজ্ঞাভূক্ত হচ্ছে যারা রোগের শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং যাদের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ কারণে লক্ষণসহ এইডস রোগকে অ্যাডভান্সড বা পরিণত এইচআইভি ডিজিজ বলা উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় পর রোগটিকে এইডস না বলে এইচআইভি রোগ (HIV diseases) বলতে হবে। সিডিসি-এর সংজ্ঞা যাই হোকনা কোন রোগীর দেহে ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর তার চিকিৎসা নিজস্ব গতিতে চলতে হবে। মূলত: PGL Persistent generalized lymphadenopathy), ARC (AIDS related complex) এবং AIDS এইচআইভি রোগের বিভিন্ন অধ্যায় মাত্র। এ কারণে ARC ও PGL নাম দুটো পরিত্যাগ করা উচিত। রোগের নাম হবে একটি এবং তা হল এইচআইভি রোগ (HIV diseases)।

১.১৪. ইমিউন ব্যবস্থা (Immune System) :

১.১৪.১ এইডস সংক্রমণের সাথে ইমিউন ব্যবস্থার সম্পর্ক কী?

এইচআইভি ভাইরাসের লক্ষ্যই হল মানবদেহের ইমিউন ব্যবস্থা। এই ইমিউন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের মাধ্যমেই এইডস মানবদেহে আধিপত্য গ্রহণ করে। ইমিউন ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা দানকারী টি-সেলের গাত্রস্থ সিডি-৪ এন্টিজেনের সাথেই এইচআইভি ভাইরাসের প্রথম বন্ধন ঘটে।

মানবদেহের ইমিউন সিস্টেমের উপর এইচআইভি ভাইরাসের আক্রমণ পদ্ধতিটি বেশ জটিল। এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের ইম্পেরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স-এর অধ্যাপক ফ্রান্সিস বলেন, ‘The T-cell surface antigen CD_4 is the principle binding site for the HIV virus, but alone it is insufficient to allow entry of virus into the cell. Now, however, HIV coreceptors have been

identified as seven transmembrane G-protein coupled receptors.'

CCR_{2b} CCR_3 CCR_5 জাতীয় কো-রিসিপ্টরগুলো (Co-receptor) সহজে ভাইরাসকে গ্রহণ করে। বিশেষ করে সংক্রমণের শুরুতে ম্যাক্রোফেজট্রপিক (Macrophage trophic) ভাইরাসগুলোকে। সংক্রমণের শেষ পর্যায়ে টি-কোষ এই ভাইরাসকে পথ করে দেয় $CXCR_4$ জাতীয় রিসিপ্টরগুলোর সাথে সংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে। এই কো-রিসিপ্টরের পথগুলোকে বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হয় কেমোকাইনস (Chemokines) দ্বারা। সিসিআর-৫ কো-রিসিপ্টরের পথ বন্ধ করা যায় এমআইপি-১ আলফা (MIP_1 alpha), এমআইপি বিটা (MIP beta) অথবা রেনটিস (RENTES) দ্বারা।

এই প্রেক্ষাপটে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সিসিআর-৫ নামক কো-রিসিপ্টর-এর ৩২তম অবস্থানটি মুছে ফেলে যে নন-ফাংশনাল রিসিপ্টরটি তৈরি হয় তা এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ফ্যান্সিস বলেন, 'A 32 basepair deletion from the coding region of CCR5 results in a frame shift, and the gene product is a non-functional receptor. Individuals who are homozygous for this deletion have been shown to be resistant to infection with HIV, and individuals heterozygous for the mutation, progress to AIDS more slowly than patients without the mutation. The protective allele is absent in black populations and in populations from Japan.'

এ থেকে কালোদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ প্রবণতার একটি কারণ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, প্যাটার্ন-২ দেশগুলোতে প্রতি পাঁচজনে একজন এইডস আক্রান্ত হয়।

এইচআইভি সংক্রমণের পরপরই ১০^৬ আরএনএ কপি ভাইরাস তৈরি হয় রোগীর প্রতি মিলিলিটার রক্তে। এই ভাইরেমিয়া রোগের শুরুর পর হতে চার থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। এরপর এই ভাইরাসের সংখ্যা বহুমাত্রায় নেমে আসে কোন চিকিৎসা ছাড়াই। এ সময় রোগীর সেরোকনভারশন বা রোগের প্রকাশ বাহ্যিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

এ পর্যায়ে যদি ভাইরাসের আরএনএ মাত্রা বেশি থাকে তাহলে বুঝতে হবে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে যাচ্ছে। এতে এ-ও বোঝা যাবে যে, রোগীর ইমিউন ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করছে না, যা কি না জেনেটিক ফ্যাক্টরের কারণে হতে পারে। অথবা সংক্রমিত

ভাইরাসটি অতি শক্তিশালী হবার কারণেও এমন হতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণের পর ইমিউন ব্যবস্থার মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটে তা হল–

- কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিরোধ বা ইমিউন ব্যবস্থা ভাইরাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রদাহ সৃষ্টির সংকেতগুলো ছড়িয়ে দেয়। অনির্দিষ্ট ম্যাক্রোফেজগুলো (Non specific macrophage) শত্রুকে শনাক্ত না করেই শরীরে ছড়িয়ে পড়ে; প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ঘাতক বা কিলার কোষগুলোও হয়ে ওঠে কার্যকর। এ পর্যায়ে সাইটোকাইনস নামক রাসায়নিক মেডিয়েটরের নিঃসরণ ঘটে।
- Acquired immunity: এন্টিজেনের শনাক্তকরণের প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট ধ্বংসশক্তি সম্পন্ন নিউট্রালাইজিং এন্টিবডি তৈরি হয় হিউমোরাল (Humoral) প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে।
- সুনির্দিষ্ট কোষের প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে টি-লিম্ফোসাইট-এর মাধ্যমে তৈরি হয় প্রতিরোধ। প্রাথমিক আক্রমণের ৫ থেকে ১০ দিন পর এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন সাইটোটক্সিক টি-লিম্ফোসাইট (Cytotoxic T-lymphocyte) বা সিটিএল আক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করে। টি-কোষ রিসিপ্টর অণুগুলো ভাইরাসের অবস্থান ও বন্ধনগুলো (epitope) শনাক্ত করতে পারে।
- এই টি-কোষ ও ম্যাক্রোফেজগুলো এমআইপি-১ আলফা, এমআইপি বিটা ও রেনটিস জাতীয় এমন কিছু কেমোকাইনস (chemokines) তৈরি করতে পারে যা ভাইরাস কর্তৃক সিডি-৪ কোষ আক্রমণের পথ রুদ্ধ করতে পারে।

রোগের ঘুমন্ত অবস্থায় নীরব পাহারাদার :

এইচআইভি সংক্রমণের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হবার আগে মানবদেহের ইমিউন প্রতিক্রিয়া হিউমোরাল ও সেলুলার (Humoral and cellular) পর্যায়ে কাজ করে ভাইরাস বৃদ্ধি রোধে নিরলস ভূমিকা রাখে। এতে সিডি-৪ কোষের সংখ্যা উচ্চ থাকে এবং ভাইরাস সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে।

এরপরেও সকল প্রতিরোধ ভেঙে ভাইরাসের বৃদ্ধি ঘটে নিম্নবর্ণিত উপায়ে–

- প্রোভাইরাল ডিএনএ পর্যায়ক্রমে আক্রান্ত কোষের জেনোমের সাথে সংযুক্ত হয়ে নতুন ভাইরাস তৈরি করে।

- মিউটেশনের মাধ্যমে চেহারা পাল্টিয়ে ইমিউন প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য থেকে সরে যেয়ে নতুন ভাইরাস তৈরি করে।
- এই ইমিউনোসাপ্রেসিভ ভাইরাস ইমিউন ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে নতুন ভাইরাস তৈরি হয়। এতে সিডি-৪ টি-কোষের সাথে সম্পৃক্ত সাইটোকাইনসগুলো আপেক্ষিকভাবে কার্যকারিতা হারায়।
- অতিমাত্রায় ভাইরাস সংক্রমণের সময় কোষের বাইরে এমন এক ধরনের টক্সিন তৈরি হয় যা কি না ইমিউন ব্যবস্থাকে নির্জীব করে তোলে।

এরপর রোগের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে এইচআইভি ভাইরাস তার চরিত্র ও আক্রমণের ধারা বদলিয়ে এমন আকার (Syncitium-inducing বা SI) ধারণ করে যাতে টি-কোষ উদ্দীপক কেমোকাইনসগুলো ভাইরাসের আক্রমণ হতে সিডি-৪ কোষের পতন রুখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এতে রক্তে সিডি-৪ কোষের সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিলিটারে দুশ'র নিচে নেমে আসে।

এর পরপরই প্রতিচ্ছবি ভাইরাস বা রিপ্লিকেটেড (replicated) ভাইরাসের সংখ্যা এমন অগুণন পর্যায়ে চলে যায় যে ইমিউন প্রতিক্রিয়া তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। এই ইমিউন প্রতিক্রিয়ার বিপর্যয়ের সাথে সাথেই নানা ধরনের সুযোগ সন্ধানী জীবাণুর সংক্রমণ এবং নানা ধরনের টিউমারের উৎপত্তি ঘটে। এসব কারণেই এইডস রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ইমিউন রক্ষার এই চিত্রের প্রেক্ষাপটেই বলা যায় যে, একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থাই এইচআইভিকে প্রতিরোধ করবার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এইচআইভিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে যেসব ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা হবে তার লক্ষ্য হবে এই ইমিউন প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করা।

এ প্রেক্ষাপটে যা করতে হবে তা হল–

- ক্রমান্বয়ে রক্তে ও টি-কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে আনা।
- এইচআইভি ভাইরাসকে চিহ্নিত করে প্রতিরক্ষামূলক ধ্বংস ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সিডি-৪ কে বাড়িয়ে তোলা।
- সুযোগ সন্ধানী সংক্রমণগুলোকে প্রতিহত করা।

১.১৫.১ টি-হেলপার কোষ সংক্রান্ত কিছু কথা :

টি-হেলপার কোষগুলো বিভিন্ন রকম শ্বেতকণিকারই অংশ। এই কোষগুলো রোগ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করে। টি-হেলপার কোষগুলো তৈরি হয় হাড়ের মজ্জায় এবং তারপর পরিণত হয় থাইমাস (Thymus) নামক গ্রন্থিতে। থাইমাস গ্রন্থিটি গলায়

থাকে। একারণেই এ জাতীয় কোষগুলোর নাম টি-হেলপার কোষ। 'T' অক্ষরটি Thymus থেকেই এসেছে।

১.১৫.২ টি-কোষের শ্রেণী বিভাগ :

টি-কোষগুলো তিন রকম হয়ে থাকে; যথা–

টি-সাপ্রেসর (T-Suppressor) কোষ,

সাইটোটক্সিক-টি (Cytotoxic-T) কোষ এবং

টি-হেলপার কোষ।

১.১৫.৩ টি-সাপ্রেসর কোষ

টি-সাপ্রেসর কোষগুলো ইমিউন সিস্টেমের প্রতিরোধ সংকেত পাঠ করে প্রতিরোধ কোষের নিয়ন্ত্রণকে কব্জা করে ফিডব্যাক মেকানিজমের মাধ্যমে।

১.১৫.৪ সাইটোটক্সিক-টি কোষ

সাইটোটক্সিক-টি কোষগুলো রোগাক্রান্ত অথবা ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলোকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে।

১.১৫.৫ টি-হেলপার কোষ

টি-হেলপার কোষগুলো শরীরের বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং প্রকৃত রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউনিটিকে কার্যক্ষম রাখে। **তিন ধরনের টি-কোষ বা থাইমাস কোষের মধ্যে একমাত্র টি-হেলপার কোষের মধ্যেই সিডি-৪ নামক একটি সুচিহ্নিত স্থান রয়েছে যেখানটায় এইচআইভি আক্রমণ করতে পারে। এ কারণে এ জাতীয় কোষই কেবল এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং শরীরে টি-হেলপার কোষ কমে গেলে বুঝতে হবে ভাইরাসের আক্রমণ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। এই টি-হেলপার কোষের সংখ্যা আর সিডি-৪ এর সংখ্যা গণনা একই ব্যাপার। টি-হেলপার কাউন্ট, সিডি-৪ কাউন্ট, টি-কোষ কাউন্ট ইত্যাদি পরীক্ষাগুলো আসলে একই পরীক্ষার বিভিন্ন নাম।**

টি-হেলপার কোষ পরিমাপ করতে হয় প্রতি কিউবিক মিলিলিটার রক্তে এর সংখ্যা গণনা করে। তবে আজকাল চিকিৎসকরা প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবস্থান জানবার জন্য যেসমস্ত নির্দেশকের (indicator) ওপর জোর দিয়ে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হল টি-হেলপার কোষের অনুপাতে টি-সাপ্রেসর কোষের সংখ্যা। টি-সাপ্রেসর কোষগুলো প্রতিরোধক কোষগুলোকে মেরে ফেলার মাধ্যমে ইমিউন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে টি-হেলপারের সাথে সাথে টি-সাপ্রেসরের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। সুস্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য টি-সাপ্রেসর কোষের সংখ্যার ব্যাপারে ধারণা থাকা দরকার।

সুস্থ নিরোগ দেহে টি-হেলপার কোষের সংখ্যা টি-সাপ্রেসর কোষের দ্বিগুণ। কিন্তু এইচআইভি আক্রান্ত হবার পরই এ অনুপাত ভেঙ্গে টি-সাপ্রেসর কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং একসময় এর সংখ্যা টি-হেলপার কোষের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। আর যখন টি-হেলপার ও সাপ্রেসর কোষের অনুপাতটি উল্টো হয়ে ১:২-এ দাঁড়ায় তখন শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুতর অবনতির কথা ভাবতে হবে। এসব কারণে রোগের অবস্থান নির্ণয়ে টি-কোষগুলোর মধ্যে টি-হেলপারের অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের শরীরে ছশ' থেকে বারোশ' পর্যন্ত টি-হেলপার কোষ থাকতে পারে প্রতি কিউবিক মিলিলিটার রক্তে। টি-হেলপার কোষের সংখ্যা কমে যাবার বিষয়টি একেকজনের শরীরে একেকরকম রোগের বা শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এটা ব্যক্তি বিশেষে অনবদ্য ইমিউন ব্যবস্থার উপস্থিতিতে বিভিন্ন রোগের আগ্রাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তবে টি-হেলপার কোষ দুশ'র নিচে নেমে গেলে বুঝতে হবে রোগী এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। টি-হেলপার কোষগুলো যখন একশ'র নিচে নেমে যায়, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি একাধিক রোগের সহজ আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে।

গড়পড়তা লোকের টি-হেলপার কোষ সংখ্যা এক হাজারের মত হয়ে থাকে এবং এইচআইভি আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় এর সংখ্যা পাঁচশ'র ওপরেই থাকে। রোগটি যখন মধ্য পর্যায়ে, তখন এর সংখ্যা পাঁচশ' থেকে নেমে দুশ'র পর্যায়ে চলে আসে। এই সময় আক্রান্তের দেহে নানাবিধ অসুস্থতা দেখা দিতে শুরু করে। এরপর এর সংখ্যা যখন দুশ'রও নিচে চলে যায় তখন এইডসের অন্তর্গত বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। গুরুতর অবস্থায় এই সংখ্যা একশ'র নিচে নেমে আসে। ইমিউন ব্যবস্থা এসময় আক্রমণকারী ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, বিভিন্ন পরজীবী ও ক্যান্সার কোষকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

টি-হেলপার কোষের সংখ্যা অনেক সময় উঠানামা করে। অনেকসময় দিবারাত্রির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে দেড়শ' থেকে তিনশ'র মত। অবশ্য অনেকসময় ল্যাবরেটরি প্রক্রিয়ার কারণে গণনায় ভিন্ন ফলাফলও আসতে পারে।

সাধারণত এই টি-হেলপার কোষের সংখ্যা রোগীর নিজস্ব চিন্তার কারণ হয় বলে পরীক্ষাটি প্রতিবার একই সময়ে, একই ল্যাবে করা প্রয়োজন। এক একটি নতুন সংক্রমণের পর তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করা উচিত নতুন করে পরীক্ষা করবার জন্য। এছাড়া টি-হেলপার

কোষগুলোর উঠানামার সাথে সাথে টি-সাপ্রেসরের অনুপাতটি রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বিবেচনায় আনা উচিত।

টি-হেলপার কোষগুলো যখন একশ'র নিচে নেমে আসে তখন ক্যান্সার কোষসহ নানারকম সংক্রমণের কারণে রোগীর স্বাস্থ্য অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। এর মাঝেও দুটি রোগের আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে টি-হেলপার কোষের সংখ্যা পঞ্চাশ নিয়েও রোগী সুস্থ বোধ করতে পারে এবং আশ্চর্যজনকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে টি-হেলপারের সংখ্যা দশ থেকে শূন্য অবস্থা নিয়েও মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় একজন কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। বিশেষ করে এইডসের নতুন ওষুধগুলো প্রয়োগের পর এমনটা অনেক বেশি সম্ভব হচ্ছে। তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণে এমনিতেই আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে মারাত্মক ওজন হ্রাসের সাথে সাথে এইচআইভি'জনিত অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়।

অধ্যায় দুই

২.১.১ এইডসের ইতিহাস এবং বিস্তার (এইডস এপিডেমিক ও প্যানডেমিক)

এইডস এপিডেমিকের প্রথম যুগে এইডস সংক্রমণের শুরুটা দৃশ্যমান হয় উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং ল্যাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে। পরবর্তীতে একযুগ পর তা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার নানা স্থানে। সেই সাথে আফ্রিকার শহরগুলো থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এইডস মহামারি। আজ আফ্রিকার কোন কোন স্থানে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন এইডস আক্রান্ত।

১৯৯২ সনের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সে সময় সমগ্র পৃথিবীতে ১২.৯ মিলিয়ন লোক এইডস আক্রান্ত ছিল। এর মধ্যে অর্ধেকই ছিল আফ্রিকায়। তখন ধারণা করা হয়েছিল ২০০০ সন নাগাদ এই সংখ্যা ১১০ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, '৯০-এর দশকে ভারতের মুম্বাই শহরে যৌনকর্মীদের শতকরা ৩০ ভাগই এইডস-এ আক্রান্ত ছিল। ঐ সময় থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই প্রদেশে এইডস -এ আক্রান্ত ছিল ১০ ভাগ যৌনকর্মী। ২০-২২ বয়সসীমার থাই সেনা রিক্রুটদের মধ্যে শতকরা দু'ভাগই এইচআইভি আক্রান্ত ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক প্রতিবেদনে আশংকা করা হয়েছিল ২০০০ সনের পর এশিয়াতে প্রতি বছর নতুন করে দশ লক্ষ লোক এইডসে আক্রান্ত হবে। তবে বিশ্বের দেশে দেশে এইডস প্রতিরোধে কিছু কিছু

উদ্যোগ গ্রহণ করায় জনসচেতনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত ব্যাংকক এইডস সম্মেলনের তথ্য অনুযায়ী সেই সময় বিশ্বে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল তিন কোটি আশি লাখ।

২.২.১ এইডসের শুরুটা কোথায় এবং কখন?

সভ্যতাবিনাশী এইডস প্যানডেমিকের শুরুটা কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও গবেষকরা বলেছেন যে, '৬০ থেকে '৭০-এর দশকে বেশ কিছু এইডস রোগীকে দেখা গেছে ইউরোপে। এই রোগ তাদের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল যারা একসময় আফ্রিকাতে কাজ করেছে। এছাড়া যে সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ইউরোপে অভিবাসী হয়ে এসেছিল তাদের কারও কারও দেহে এইডসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল ঐ সময়। ইউরোপেই এইডস আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়। সে ছিল পঁচিশ বছর বয়স্ক একজন নাবিক। নানা দেশ ভ্রমণের পরে ১৯৫৮ সনে সে অসুস্থ হয় এবং ১৯৫৯ সনে নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া (Pneumocystis carinii pneumonia বা PCP) ও সাইটোমেগালো ভাইরাসে (CMV) আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পরবর্তীতে পলিমারেস চেইন রিয়্যাকশন কৌশল (Polymerase Chain reaction বা PCR) প্রয়োগের দ্বারা ঐ নাবিকের টিস্যু স্যাম্পল পরীক্ষা করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিভুক্ত দলিলে এইচআইভি পজিটিভ টিস্যুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৮ সনে, পনেরো বছর বয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গ বালকের দেহে। ঐ বালক আমেরিকার সেন্ট লুই শহরের বাসিন্দা ছিল। সে শরীরময় ক্যাফোসিস সারকোমায় ভুগছিল। Western Blot (WB) Test-এ তার টিস্যু ও সেরামে এইচআইভি এন্টিবডি ধরা পড়ে। এলাইজা টেস্টেও তার এইচআইভি এন্টিজেন ধরা পড়ে। এরপর আমেরিকাতে বেশ কিছু এইডস রোগী শনাক্ত হয় '৮০-এর দশকে।

জায়ারের কিনসাসায় পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেখানে প্রথম এইডস রোগীটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৯ সনে। '৭০-এর দশকে উগান্ডায় রোগটি বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮১ সনে যুক্তরাষ্ট্রে এইডস শনাক্ত হবার পর ইউরোপ প্রবাসী বেশ কিছু আফ্রিকানের দেহে এইডস শনাক্ত করা হয়। তাদের অধিকাংশই ছিল জায়ারের অধিবাসী। রুয়ান্ডা এবং জায়ারে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৬২ সনে মধ্য আফ্রিকাতে এইডস জাতীয় রোগ বিদ্যমান ছিল। ১৯৭৬ সনে জায়ারে বসবাসরত একজন ডেনিশ সার্জন এবং ১৯৭৭ সনে বেলজিয়ামে বসবাসরত জায়ারের এক নাগরিক এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

মধ্য আফ্রিকায় কর্মরত চিকিৎসকরা '৬০-এর দশকে এইডস সদৃশ এমন কিছু রোগের কথা উল্লেখ করেছেন যা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (CDC) প্রদত্ত এইডসের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়। ঐ সময়

একটি নতুন রোগ শনাক্ত করা হয় যার নাম ছিল স্লিম ডিজিজ (Slim disease)। এই স্লিম ডিজিজের লক্ষণ ছিল বিরামহীন ডায়রিয়া। '৭০ ও '৮০-এর দশকে চিকিৎসকরা আফ্রিকায় যেসব রোগের উত্থান দেখলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মারাত্মক আকারে ক্যাফোসিস সারকোমা, খাদ্যনালীতে ছত্রাকের সংক্রমণ এবং ক্রিপ্টোকক্কোসিস। রক্ত পরীক্ষা না করে যে সমস্ত লক্ষণ ও রোগের প্রকাশ দেখে এইডস শনাক্ত করা হয়, এ ধরনের অসুখগুলো তারই অন্তর্গত।

যদিও এইডস রোগ '৭০-এর দশকের আগেই বিচ্ছিন্নভাবে আফ্রিকার কয়েকটি স্থানে দেখা গিয়েছিল, তবে প্রকৃত এপিডেমিক দেখা দেয় '৭০ দশকের শেষ থেকে '৮০ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে, যেমনটা দেখা গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং হাইতিতে।

২.৩.১ আফ্রিকা ও সাব-সাহারা অঞ্চলে এইডসের বিস্তারঃ

আফ্রিকা এবং সাব-সাহারা অঞ্চলে এই রোগের ব্যাপক বিস্তারের একটি কারণ হল জাতীয় উন্নয়ন ও নগরায়নের সাথে সাথে শহরকেন্দ্রিক শ্রমিক শ্রেণী ও যৌনকর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সমস্ত শ্রমিকরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে একদিকে যেমন যৌনকর্মীদের সাথে বিপজ্জনক যৌনসংযোগ ঘটায়, তেমনি যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হবার জন্য যৌনকর্মী ও আক্রান্ত শ্রমিক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংঘাত, যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে রোগের বিস্তার ঘটেছে। কেননা, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে নানা ধরনের যৌনরোগ বিস্তারের একটি অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হয়।

আফ্রিকার যে পাঁচটি দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এইচআইভি রোগের সংক্রমণ ঘটেছে সেগুলো হল– তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, মালাবি ও জায়ার। যেসব দেশে এইডসের বিস্তার বাড়ছে সেগুলো হল ক্রমানুসারে– মালাবি, উগান্ডা, জিম্বাবুয়ে, রুয়ান্ডা এবং তাঞ্জানিয়া।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে যেখানে ৯০ ভাগ এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে সমকামী, ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ সেবনকারী (IDUs) ও তাদের সঙ্গী এবং হেমোফাইলিয়াকদের মধ্যে, সেখানে আফ্রিকাতে রোগের সংক্রমণ হয় বহুমুখী যৌনমিলন, রক্ত পরিসঞ্চালন এবং গর্ভকালীন অবস্থায় রোগ সংক্রমণের কারণে। আফ্রিকান সাব সাহারা অঞ্চলে ৮০ ভাগ এইচআইভি সংক্রমণ হয় হেটেরোসেক্সুয়ালদের যৌনমিলনের মাধ্যমে– প্রধানত পুরুষ থেকে নারীদেহে সংক্রমণ ঘটে। এতে নারীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে আফ্রিকাতে। আক্রান্ত নারী ও পুরুষের এই অনুপাতটি ১·৪:১। তুলনামূলকভাবে আমেরিকাতে নারী-পুরুষ আক্রান্তের অনুপাতটি ১:১৯। আফ্রিকাতে যৌনসক্রিয়তা শুরুর সাথে সাথে রোগের সংক্রমণ ঘটে। ২০-২৪ বয়সসীমার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে ২৫-২৯ বয়সসীমার মধ্যে রোগের অবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

পুরুষ ও নারীর সংযোগের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ বৃদ্ধিতে যে কারণগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে তা হল–

ঘন ঘন যৌনমিলন, একাধিক যৌনসঙ্গী, যৌনকর্মীদের সাথে সম্পর্ক এবং যৌনরোগ পুষে রাখা। এছাড়া যৌনসুরক্ষায় কনডম ব্যবহার না করার বিষয়টি তো রয়েছেই।

কেনিয়ায় এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাৎনা ছাড়া পুরুষদের মধ্যেই এইচআইভি-১-এর সংক্রমণ বেশি ঘটেছে। মেয়েদের মধ্যে যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যেও এইচআইভি-১ সংক্রমণ বেশি ঘটেছে। আফ্রিকাতে এইচআইভি সংক্রমণের একটি প্রধান কারণ যৌনবাহিত রোগ। গবেষণায় দেখা গেছে, এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে ৫০ ভাগই অন্যান্য যৌনরোগে আক্রান্ত। অনাক্রান্তদের মধ্যে ১৪ ভাগ ক্ষেত্রে যৌনরোগ পাওয়া গেছে।

১৯৮৫ সনে গবেষকরা সেনেগালের যৌনকর্মীদের মধ্যে এমন এক ধরনের এইচআইভি শনাক্ত করেন যা সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Simian immunodeficiency virus বা SIV) -এর সাথে ক্রস রিয়্যাক্ট করেছে।

একই ধরনের ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯৮০ সনে গিনি বিসাউতে। ১৯৬৬ সনে আইভরি কোস্টে এবং ১৯৬৭ সনে গ্যাবন ও নাইজেরিয়াতে পাওয়া গিয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, এই ভাইরাসটি (এইচআইভি-২) বেশ কিছু পর্তুগীজ রোগীদের দেহেও পাওয়া গিয়েছিল। তারা সম্ভবত '৬০-এর দশকে আফ্রিকা থেকে এ রোগ নিয়ে গিয়েছিল।

এইচআইভি-২ সংক্রমণ প্রধানত পশ্চিম আফ্রিকায় দেখা গেছে। সেনেগাল, গিনি, গিনি বিসাউ, গাম্বিয়ার শহরাঞ্চলে এই এইচআইভি-২-এর প্রাধান্য দেখা গেছে। পশ্চিম আফ্রিকার শহরাঞ্চলে যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৫ থেকে ৬৪ ভাগই এইচআইভি-২তে আক্রান্ত। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হল গিনি বিসাউ'তে। এখানকার ৮.৯ ভাগ প্রাপ্তবয়স্কই এইচআইভি-২ সেরোপজিটিভ। এইচআইভি-১-এর মত এইচআইভি-২ও হেটেরোসেক্সুয়াল সর্ম্পকের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। যৌনবাহিত রোগাক্রান্ত এবং যৌনকর্মীদের মধ্যে এর প্রাধান্য বেশি।

গিনি বিসাউতে দেখা গেছে, এইচআইভি-২-তে আক্রান্ত ৪০ ভাগ ব্যক্তির স্ত্রীরাও একই রোগে আক্রান্ত। মা থেকেও সন্তানদের মধ্যে এইচআইভি-২-এর সংক্রমণ ঘটে থাকে। তবে এইচআইভি-২-এর ক্ষেত্রে ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশন এইচআইভি-১-এর চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে। এইচআইভি-২-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ভাইরাসের সংক্রমণের হারও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর সম্ভাব্য কারণ ধীর গতিতে এর সংক্রমণ এবং সেই সাথে এর দীর্ঘমেয়াদী এনডেমিক চরিত্র।

আফ্রিকায় যৌনকর্মীদের ২৭ থেকে ৮৮ ভাগ এইচআইভি পজিটিভ। অনেক আগের একটা রিপোর্টেই দেখা গেছে রুয়ান্ডার প্রায় ৪৩ ভাগ যৌনকর্মী এইচআইভি আক্রান্ত। ১৯৮৪ সনের আগেই এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ ভাগ। পরবর্তীতে এটা প্রায় ৮৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে

গবেষকরা জানিয়েছেন। নাইরোবিতে ১৯৮১ সনে ৪ ভাগ যৌনকর্মী এইচআইভি পজিটিভ ছিল। ১৯৮৫ সনে তা ৬১ ভাগে এসে দাঁড়ায়। ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, নাইরোবির নিম্নশ্রেণীর যৌনকর্মীদের ৬৬ ভাগ এবং একটু উঁচুস্তরের যৌনকর্মীদের মধ্যে ৩১ ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত। মধ্য আফ্রিকাতে এই যৌনকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা এইডস বিস্তারের একটি বড় কারণ।

যৌনকর্মীদের মধ্যে এইডস রোগ বেশি হবার কারণগুলোর মধ্যে শুধু সুরক্ষার অভাবই নয়, সেই সাথে অধিক হারে যৌনমিলন ও যোনিপথে ঘা অন্যতম কারণ। সিফিলিস, গনোরিয়া, শ্যাংক্রয়েড, ক্ল্যামাইডিয়াসহ, যৌনাঙ্গে নানা ধরনের ঘা এইচআইভি সংক্রমণের উল্লেখযোগ্য কারণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়িও অনেকক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। এসব এলাকায় এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ৮১ ভাগ পুরুষ বিগত দু'বছরের মধ্যে মাসে অন্তত একবার যৌনকর্মীদের সাথে মিলিত হয়েছিল।

এসব অঞ্চলে আক্রান্ত মায়েদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। সাব-সাহারা অঞ্চলে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ১০ ভাগই আক্রান্ত হয় জন্মসূত্রে মায়ের গর্ভ থেকে। রুয়ান্ডার কিগালিতে প্রায় ২০ ভাগ মা এইচআইভি আক্রান্ত। উগান্ডাতে প্রায় ৩০ ভাগ মা এইচআইভি পজিটিভ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসব অঞ্চলে মা থেকে শিশুদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের হার ৩০ থেকে ৩৯ ভাগ। কিনসাসাতে ৬ ভাগ গর্ভবর্তীকে এইচআইভি পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এই সব মায়েদের গর্ভে জন্ম নেয়া ২১ ভাগ শিশু এইচআইভি আক্রান্ত হবার কারণে এক বছরের মধ্যে মারা গেছে। জাম্বিয়াতে এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ৪৫ ভাগ মারা গেছে জন্মের দু'বছরের মধ্যে। সাব-সাহারা অঞ্চলে ১০ ভাগ শিশুই আক্রান্ত হয়েছে রক্ত পরিসঞ্চালনের কারণে। জায়ারেও এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ২৫ ভাগ আক্রান্ত হয়ে থাকে রক্ত পরিসঞ্চালনের কারণে। পাশ্চাত্যে এইডস স্ক্রিনিং করার কারণে এ ধরনের বিপর্যয় অনেক কম।

এইডস বিস্তারের সর্বশেষ বিশ্বপরিস্থিতিঃ

বিশ্বব্যাপী এইডস আক্রান্ত নারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ সনের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এইডস রোগে আক্রান্তদের ৫০ ভাগই নারী। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এইডস আক্রান্তদের ৫৭ ভাগই নারী। (সূত্র: 2004 Report on the Global AIDS Epidemic: Executive Summery)

নতুন করে যারা এইচআইভি'তে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ৫০ ভাগের বয়সসীমা ১৫-২৪ বছরের মধ্যে। বিভিন্ন মহাদেশে এইডস বিস্তারের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, আফ্রিকার অবস্থাই সবচেয়ে ভয়াবহ।

এশিয়াতে এইডস এপিডেমিকের অবস্থাও কম ভীতিকর নয়। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ অঞ্চলে প্রায় ৭.৪

মিলিয়ন লোক এইচআইভি আক্রান্ত রয়েছে। এদের মধ্যে ২০০৩ সনেই আক্রান্ত হয়ছে ১.১ মিলিয়ন লোক। দক্ষিণ আফ্রিকার পর সর্বোচ্চ সংখ্যক এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি বসবাস করছে ভারতে। বর্তমানে সেখানে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ৫.১ মিলিয়নের কাছাকাছি।তবে স্বস্তির বিষয় হল এই যে, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া এইডস নিয়ন্ত্রণে কিছুটা হলেও সফলতার মুখ দেখেছে।

সর্বশেষ হিসাব মতে, **আফ্রিকান সাব-সাহারা অঞ্চলে** এইচআইভি আক্রান্ত রয়েছে ২৫ মিলিয়ন লোক। এখানে এইডসের কারণে মৃত্যুহারও অনেক বেশি। কেবল ২০০৩ সনেই এ অঞ্চলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় তিন মিলিয়ন লোক। এসময় এইডসজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছে ২.২ মিলিয়ন লোক। আফ্রিকার মাদাগাস্কার, সোয়াজিল্যান্ডের মত দেশে সম্প্রতি এইডস আক্রান্তের হার বাড়লেও আশার কথা হল, উগান্ডাতে এই হার কিছুটা কমেছে।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি দেশে এইডস আক্রান্তের হার তাদের মোট জনসংখ্যার ১৭ ভাগ। বতসোয়ানা ও সোয়াজিল্যান্ডে এইচআইভি আক্রান্তের হার প্রায় ৩৫ ভাগ। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোতে এইচআইভি আক্রান্ত রয়েছে ২ থেকে ২০ ভাগ জনগোষ্ঠী। উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৮০ হাজার।

পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় বর্তমানে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন লোক এইচআইভি আক্রান্ত। অথচ ১৯৯৫ সনে এ অঞ্চলে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ৬০ হাজার। **পশ্চিম ইউরোপে** বর্তমানে এইচআইভি আক্রান্তর সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার।

ল্যাতিন আমেরিকায় বর্তমানে ১.৬ মিলিয়ন লোক এইচআইভি আক্রান্ত। ব্রাজিলের কোন কোন শহরে মাদকসেবীদের ৬০ ভাগেরও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত। **ক্যারিবিয়ান** অঞ্চলে ৩ ভাগ লোক এইচআইভি আক্রান্ত। শুধু বাহামা, হাইতি ও ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে ৪ লাখ ৩০ হাজার এইচআইভি আক্রান্ত রয়েছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হাইতির। সেখানে ৫.৬ ভাগ লোক এইচআইভি আক্রান্ত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ৯ লাখ ৫০ হাজার লোক এইচআইভি আক্রান্ত। সেখানে নতুন করে যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের আধিকাংশই আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। (সূত্রঃ 2004 Report on the Global AIDS Epidemic: Executive Summery)

২.৪.১. এইডস রোগের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু মতবাদঃ

১৯৮১ সনের বসন্তে এইডসকে একটি নতুন রোগ হিসাবে নিবন্ধন করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকার সিডিসি ঐ বছরের ৫ জুন লসএঞ্জেলসের এমন পাঁচজন শক্ত সমর্থ সমকামীকে শনাক্ত করে যারা বিশেষ ধরনের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিল। তারা পিসিপিতে ভুগছিল। একমাস পর জুলাই-এর ৩

তারিখে আরও ১০ জন লোককে শনাক্ত করা হয় একই ধরনের নিউমোনিয়া আক্রান্ত অবস্থায়। এরপর ২৬ জন পুরুষকে শনাক্ত করা হয় ক্যাফোসিস সারকোমা নামক এক ধরনের ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত অবস্থায়।

পিসিপি এক ধরনের প্রোটোজোয়া। এটা আমাদের পরিবেশেই থাকে এবং সাধারণত সুস্থ মানুষকে আক্রান্ত করে না। তবুও এ ধরনের সংক্রমণগুলো পরপর ঘটতে থাকল নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জেলসসহ বিভিন্ন অঞ্চলে, সুস্থ-সবল সমকামীদের মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকায় এটা এপিডেমিক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় কবে, কখন এ রোগ অনুপ্রবেশ করল এবং তা কীভাবে ঘটল তা নিয়ে শুরু হল নানা গবেষণা।

প্রথমে রোগ সংক্রমণের মাধ্যমটি শনাক্ত না হওয়ায় নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এমনও কল্পনা করা হচ্ছিল যে, এ রোগের জীবাণু বাতাস বা অন্য কোন মাধ্যমে বাহিত হয়ে মানবদেহে অনুপ্রবেশ করছে। পরিশেষে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি সংক্রমিত হচ্ছে যৌনসংযোগের মাধ্যমে, বিশেষ করে সমকামীদের মধ্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইনজকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মধ্যে।

এরপরে শুরু হয় রোগ-জীবাণু শনাক্ত করার প্রচেষ্টা। এ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, কোন জীবাণু বা পরজীবী নয়, একরকম ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সংক্রমণ ঘটছে।

১৯৮৩ এবং ১৯৮৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তিনটি ল্যাবরেটরি প্রায় সমসাময়িক সময়ে এইডস ভাইরাস বা যে ভাইরাস এইডস রোগ সৃষ্টি করছিল তাকে শনাক্ত করে। একই সাথে ভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় বিভিন্ন গবেষণাগারে নতুনভাবে শনাক্ত করা তিনটি ভাইরাসকে তিনরকম নাম দেয়।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত নাম তিনটি ছিল–

Lymphadenopathy associated virus (LAV)

Human T-cell lymphotropic virus type- III (HTLV-III)

AIDS associated retrovirus (ARV)

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, তিনটি ভাইরাসই একই ভাইরাসের বিভিন্ন রূপ। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬ সনে এই ভাইরাসগুলোর সম্মিলিত নাম দেয়া হয় Human Immunodeficiency Virus type-I (HIV_1)|

২.৫.১. জীবজন্তু থেকে মানুষের মধ্যে এইডস সংক্রমণের প্রচলিত ধারণা কতটুকু বাস্তবসম্মত

জীবজন্তু থেকে মানুষের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে সাধারণের মধ্যে একটি প্রচলিত জল্পনা কল্পনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে গবেষকরা দেখেছেন যে, এইচআইভি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এইডস ঘটাতে পারলেও তা তুলনামূলকভাবে কম সার্থক হয়। শিম্পাঞ্জির যোনিপথে ভাইরাল সোয়াব প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে শিম্পাঞ্জিও

এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। তবে মুখের মিউকোসার মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সংক্রমণ সার্থক হয়নি। যে সমস্ত পুরুষ শিম্পাঞ্জিকে সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এসআইভি) দ্বারা সংক্রমিত করা সম্ভব হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে পুরুষ থেকে মেয়ে শিম্পাঞ্জিতে এবং মেয়ে থেকে পুরুষ শিম্পাঞ্জিতে সংক্রমিত হয়েছে।

ওপরে উল্লিখিত এই পরীক্ষা মানব শরীরের বাইরে ভাইরাসের উপস্থিতি প্রসঙ্গটিকে কিছুটা প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, প্রকৃতিতে কোন জীবজন্তুর মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস পাওয়া যায়নি। তাই কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ইত্যাদি দ্বারা সাধারণভাবে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা অবাস্তব।

২.৬.১. এইচআইভি ভাইরাসের মত যে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসগুলো জীবজগতে থাকতে পারেঃ

সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এসআইভি) নামক ভাইরাস এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। এটা শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রমের মত রোগ ঘটিয়ে থাকে। এরকম একটি ভাইরাস রয়েছে যার নাম ভিসনা (Visna)। এটা ছাগল-ভেড়ার মধ্যে দেখা যায়। এটাও এইডসের মত রোগ ঘটায় ছাগল-ভেড়ার মধ্যে। ফেলাইন (Feline) ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বা FIV বিড়ালের মধ্যে এইডস জাতীয় অসুখ ঘটায়। এফআইভি এইচআইভি'র মতই একটি রেট্রোভাইরাস এবং রোগের সংক্রমণ এইচআইভি'র মতই। তবে এফআইভি দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়না।

এভিয়ান সারকোমা ভাইরাস নামক একরকম ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস মুরগীর মধ্যে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি রোগ ঘটায়।

নন-হিউম্যান করোনা ভাইরাস মিউটেশনের পরে যেমন মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, তেমনি জীবজন্তুর ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বিশেষ করে রেট্রো ভাইরাস মিউটেশনের পর কী পর্যায়ে যেতে পারে কিংবা তা মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে কি না সে ব্যাপারে কোন যুক্তগ্রাহ্য বিজ্ঞাননির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রেট্রোভাইরাসগুলোর মিউটেশন ঘটেও এইচআইভি ভাইরাসের উদ্ভব হতে পারে।

যাই হোক, জীবজন্তু থেকে মানবদেহে ভাইরাসের চলে আসাটি নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিককালে জীবজন্তুর শরীর থেকে আগত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলেই সার্সের আর্বিভাব হয়েছে। সীমিত হলেও এই করোনা ভাইরাস অতীতে পশুপাখির শরীর থেকে মানব শরীরে সংক্রমিত হয়ে জ্বর, এনকেফালাইটিস, মাইলাইটিস ইত্যাদি ঘটিয়েছিল। জীবদেহ থেকে মানবদেহে এ ভাইরাসটির সংক্রমণের নাম জুনোসিস (Zoonosis)। জুনোসিসকে অগ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসাবে মনে করা যাচ্ছে না নানা কারণে। কেননা এইচআইভি আফ্রিকার বানরের দেহে বিদ্যমান একধরনের ভাইরাসের সমগোত্রীয় এবং ঐ অঞ্চলেই এইচআইভি-১ ও ২ এর শুরুটা হয়।

এরপরও এ তত্ত্ব গৃহীত হচ্ছে না সকল বিজ্ঞানীর কাছে। তবে যা বিশ্ববিজ্ঞানীরা মেনে নিচ্ছেন তা হল এই যে, এইচআইভি-১ এর উৎপত্তি সাম্প্রতিককালেই মধ্য আফ্রিকাতে হয়েছে। সেখান থেকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ছড়িয়েছে, গ্রাম থেকে শহরে মানুষের যোগাযোগ ও চলাচল বৃদ্ধির জন্য। সম্ভবত রোগটি মধ্য আফ্রিকার প্রত্যন্ত বনাঞ্চল ও পাড়াগাঁ থেকে শহরে, সেখান থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

মানব শরীরে আক্রান্ত টি-হেলপার কোষ এবং আক্রান্ত ইমিউন কোষগুলোর মধ্যে লক্ষ কোটি ভাইরাস পার্টিকেল থাকে। ভাইরাস ছড়াবার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত এবং শরীরের রস বা তরল পদার্থ একদেহ থেকে আরেক দেহে ছড়াতে হয়। এই ভাইরাস আক্রান্ত রক্ত, বীর্য, যোনিরস ইত্যাদি একদেহ থেকে আরেক দেহে প্রবেশ না করলে কোনভাবেই এইডস ছড়াতে পারে না।

২.৭.১. যুক্তরাষ্ট্রের এইডস সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যানঃ

১৯৮৩ সনে হেটেরোসেক্সুয়াল সম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ৬.৯ ভাগ নারী এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৮৬ সনে এই হার ছিল ৭ ভাগ এবং ১৯৯০ সনে ১১.৫ ভাগ। ১৯৯২ সনে এই হার ১৩.৫ ভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

১৯৮৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত গবেষণায় জাতিগতভাবে এইডস বিস্তারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ– এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৫৯ ভাগ ছিল শ্বেতাঙ্গ। ২৫ ভাগ আক্রান্ত ছিল কালোদের অন্তর্গত, ১৪ ভাগ ছিল হিস্পানি।

কিন্তু ক্রমে এইচআইভি সংক্রমণটি কালো ও হিস্পানিদের মধ্যে বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সনের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ শ্বেতাঙ্গ, ৩৩ ভাগ কালো এবং ১৭.৫ ভাগ হিস্পানি।

বয়সভিত্তিক আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ২০-২৯ বয়সসীমার মধ্যে ১৯৮৬ সনে আক্রান্ত ছিল ২১ ভাগ, ৩০-৩৯ বয়সসীমার মধ্যে ৪৭ ভাগ, ৪০-৪৯ বয়সসীমার ২১ ভাগ, ৪৯^{+} বয়সীদের মধ্যে ১০ ভাগ। ১৯৯২ সনে ২০-২৯ বয়সসীমার মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা নেমে আসে ১৯ ভাগে। ৩০-৩৯ বয়স সীমার মধ্যে এই হার ছিল ৪৬ ভাগ এবং ৪৯^{+} বয়সীদের মধ্যে ১০ ভাগ। (সূত্রঃ সিডিসি সার্ভিলেন্স রিপোর্ট, ১৯৮৬ এবং ১৯৯৩)।

বিগত বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে এইচআইভি'র লক্ষণ হিসাবে বিদ্যমান অসুখ বিস্তারের প্রবণতার মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এইডস এপিডেমিকের শুরুর দিকে ৯০ ভাগ রোগী পিসিপি নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছে। ১৯৮২ সনে ৫৮ ভাগ এইডস রোগীর ক্ষেত্রে পিসিপি, ৩০ ভাগের ক্যাফোসি'স সারকোমা এবং ১২ ভাগের ক্ষেত্রে অন্যান্য রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

১৯৯২-এ এসে পিসিপি'র সংক্রমণের হার নেমে আসে ৪২ ভাগে এবং ক্যাফোসি'স সারকোমা নেমে আসে মাত্র ৯ ভাগে। ১৯৯২-এর প্রধান লক্ষণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয় এইচআইভি ওয়েস্টিং সিনড্রম (wasting syndrome) যা মোট রোগীর ২০ ভাগের মধ্যে দেখা যায়। অথচ এই লক্ষণটি পূর্বে এইচআইভি'র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৯৯২-এর পর অন্যান্য যে লক্ষণগুলোর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে তা হল ইসোফ্যাজিইল ক্যান্ডিডিয়াসিস বা খাদ্যনালীতে ছত্রাকের সংক্রমণ। এটা আক্রান্তদের ১৫ ভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাইটোমেগালোভাইরাস সংক্রমণ ৯ ভাগ ক্ষেত্রে এবং মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স ৭ ভাগ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পরিলক্ষিত হয় এইচআইভি এনকেফ্যালোপ্যাথি ৬ ভাগ ক্ষেত্রে, ক্রিপ্টোকক্কোসিস ৫ ভাগ ক্ষেত্রে, টক্সোপ্লাজমোসিস ৫ ভাগ ক্ষেত্রে এবং নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়া হারপেস সিমপ্লেক্স ৫ ভাগ ক্ষেত্রে।

রোগ সংক্রমণের এই পরিবর্তনের ধারাটির পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, ক্যাফোসি'স সারকোমার প্রাধান্য ছিল সমকামীদের মধ্যে। সমকামীদের যৌনআচরণ পরিবর্তনের কারণে এবং সুরক্ষা পাবার কারণে ক্যাফোসি'স সারকোমা কমে এসেছে। এর থেকে ধারণা করা হয় যে, একটি যৌনবাহিত এজেন্ট ক্যাফোসি'স সারকোমার সংক্রমণ ঘটাচ্ছিল সাধারণ সমকামী এবং মাদকসেবী সমকামীদের মধ্যে।

২.৭.২. নারী ও পুরুষদের মধ্যে কারা বেশি আক্রান্ত?

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) উল্লেখ করে যে, ১৯৮১ সনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এইডস আক্রান্ত নারীকে শনাক্ত করা হয়েছিল। ১৯৯২ সনের আগস্টে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪ হাজার ৩২৩ জনে যা কি না ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক এইডস আক্রান্তদের ১০.৫ ভাগ।
বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত আফ্রিকান ও আমেরিকানদের মধ্যে মৃত্যুর কারণ হিসাবে এইডসের স্থান পঞ্চম। যেসব দেশে (প্যাটার্ন-২ দেশসমূহে) বহুমুখী যৌনসম্পর্কের কারণে এইডস ছড়াচ্ছে সেখানে নারীদের অবস্থা আরও খারাপ। আফ্রিকান সাব-সাহারা অঞ্চলে মোট এইচআইভি আক্রান্তের ৫০ ভাগই নারী। খুব শীঘ্রই এই নারীদের মধ্যে এইডসজনিত রোগে মৃত্যু অন্যান্য অসুখ বিসুখের কারণে সম্মিলিত মৃত্যুর হারকে ছাড়িয়ে যাবে।

২.৮.১. এইডস রোগের উদ্ভব সম্পর্কে লেখকের মতবাদঃ

ঠিক কীভাবে এইডসের শুরু হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে এইডসের উদ্ভব বা শুরু নিয়ে নানা ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে।
একটি তত্ত্ব হল–রোগটি শত শত বছর ধরেই ছিল এবং পৃথিবীর কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল যা কি না পরবর্তীতে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ তত্ত্বটি খুব

একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি এ কারণে যে, বিশ্ব যোগাযোগ, ভ্রমণ, আগ্রাসন, নতুন দেশে অভিযান, আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক আগে শুরু হলেও রোগটি ১৯৫০ সনের আগে দেখা যায়নি।

এ প্রেক্ষাপটে এইডস উদ্ভবের দ্বিতীয় তত্ত্বটির প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় যাতে মনে করা হয়, মানুষকে সচরাচর আক্রমণ করে যে সমস্ত ভাইরাস, তারই একটির মিউটেশন ঘটার কারণে এইচআইভি ভাইরাস তৈরি হয়েছে। তবে মানবদেহে যেসমস্ত ভাইরাস আক্রমণ করে এইচআইভি ভাইরাসের সাথে তার সামান্যতম মিল না পাওয়ায় এই তত্ত্বটিও প্রায় নাকচ হয়ে যায়।

এইচআইভি-এর উৎপত্তি সংক্রান্ত তৃতীয় এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত তত্ত্বটি হল, এটি আফ্রিকার এক প্রজাতির বানরের দেহে বিদ্যমান ভাইরাস থেকে মানবদেহে ছড়িয়েছে।

এক্ষেত্রে লেখক মনে করেন, এই ভাইরাস বানর জাতীয় প্রাণী থেকে ছড়ালেও এর একটি অজ্ঞাত ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট রয়েছে যা থেকে মানবদেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে কিছু কো-ফ্যাক্টরের কারণে। দুর্ঘটনা ছাড়া ভাইরাস মিউটেশন ও বিকাশের পেছনে ইস্ট ও বিশেষ ধরনের ইকোলাই-এর ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছেন লেখক।

জীবজন্তুতে বিদ্যমান এইচআইভি জাতীয় ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের বিবর্তনের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে লেখক তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেন- Probably the retrovirus that was transmitted from Chimp to Human being was HIV_2, which has longer incubation period and less virulence. Later it may have mutated and evolved HIV_1. An intermediate host that has made this zoonosis successful is still missing.

তিনি আরও বলেন HIV has certain relation with global warming, execs carbon dioxide emission, UV radiation and ecological changes.

সিমিন ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস থেকে মিউটেশনের মাধ্যমে এইচআইভি-২ জাতীয় ভাইরাসের বিবর্তনের বিষয়টির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

লেখক মনে করেন, আফ্রিকা মহাদেশে এইডস রোগের শুরু ও তার ব্যাপক বিস্তারের পেছনে পরিবেশ বিপর্যয় ছাড়া দারিদ্র, কর্মসংস্থানের অভাব, স্বাস্থ্য সেবার অভাব ও দ্রুত নগরায়ন এবং নাগরিক সুবিধার অভাবকে এইডস রোগের ব্যাপক বিস্তারের পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন লেখক।

এছাড়া বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর মানসিক গঠন ও ব্যাক্তিত্বকে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন লেখক। আবার এই মানসিক গঠনের পেছনে জ্বীনের প্রভাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় তিন

বাংলাদেশে এইডসের বিস্তার

৩.১.১. বাংলাদেশে এইডসের বিস্তারঃ

গত এক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী এইডস রোগের বিস্তার বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে এর মাত্রা এখনও আশঙ্কাজনক না হলেও নানা কারণে বাংলাদেশ এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এদেশের ১৪ কোটি মানুষকে এইডসের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবার জন্য এখনই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সরকারি হিসাবে ২০০১ সনে বাংলাদেশে এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮৮ জন। ২০০২ সনে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪৮ জন। ২০০২ সনে আরও ৫৯ জন পুরুষ এবং আটজন নারীকে এইচআইভি পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত করেছে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ২০০২ সনে আক্রান্ত মোট ৩১৫ জনের মধ্যে পরিচয় পাওয়া গেছে ২৮৬ জনের। এদের ২৩৫ জন পুরুষ এবং ৫১ জন মহিলা। সরকারের দেয়া তথ্যানুযায়ী, এইডস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত মারা গেছে ২০ জন।

ব্যাপক প্রবাসী অধ্যুষিত বৃহত্তর সিলেটই এখন দেশের মধ্যে সর্বাধিক এইডস ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলে ৮৩ জনের মতো এইডস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৮৯ সনে সিলেট জেলাতেই সর্বপ্রথম এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। রোগী ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য ফেরত এক ব্যক্তি। কিছু দিন আগে তিনি মারা গেছেন। তার স্ত্রীও একই রোগে মারা গেছেন। এছাড়া ১৯৯১ সনের আগস্ট মাসে কানাইঘাট উপজেলায় একই সঙ্গে তিনজন এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। দুবাইয়ে চিকিৎসাকালে তাদের শরীরে এইডসের জীবাণু ধরা পড়ে।

শুধু সিলেটেই নয়, বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তির মাধ্যমে গোটা পরিবার এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা পাবনাতেও ঘটেছে। এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিপুল সংখ্যক এইচআইভি পজিটিভ শনাক্তের বাইরে রয়ে গেছে, যা খুবই উদ্বেগের বিষয়।
বছর ভিত্তিক এইচআইভি আক্রান্তের পরিসংখ্যান :

সন	আক্রান্তের	এক বছরে	বছর ভিত্তিক

	সংখ্যা	বৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার
২০০০	১৫৩ জন	০	০
২০০১	১৮৮ জন	৩৫ জন	২২.৮৮ %
২০০২	৩১৫ জন	১২৭ জন	৬৭.৫৫ %

২০০২ সনে আক্রান্ত ৩১৫ জনের মধ্যে পরিচয় পাওয়া গেছে ২৮৬ জনের। এদের মধ্যে পুরুষ ২৩৫ জন, মহিলা ৫১ জন।

আক্রান্তের ক্যাটাগরি	সংখ্যা	আক্রান্তের হার
পুরুষ	২৩৫	৭৪.৬০
নারী	৫১	১৬.১৯
অজ্ঞাত	২৯	৯.২১
মোট	৩১৫	১০০

সরকারি হিসাবে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে দেশে যে ২৪৮ জনের দেহে এইচআইভি ভাইরাস পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পরিসংখ্যান:

পেশা/পরিচয়	সংখ্যা	আক্রান্তের হার
বিদেশ প্রত্যাগত	১১১ জন	৪৫ ভাগ
গৃহবধূ	২৫ জন	১০ ভাগ
শিশু	১৭ জন	৭ ভাগ
পেশাদার যৌনকর্মী	৭ জন	৩ ভাগ
ট্রাক ড্রাইভার	২ জন	১ ভাগ
ছাত্র	১ জন	০.৪ ভাগ
ব্যবসায়ী	৩ জন	১ ভাগ
কারাবন্দি	২ জন	১ ভাগ
অজ্ঞাত	৭৮ জন	৩১ ভাগ
মোট	২৪৮ জন	

আক্রান্ত ২৪৮ জনের মধ্যে নারী ৫০ এবং পুরুষ ১৯৮ জন।

লিঙ্গ	আক্রান্তের সংখ্যা	আক্রান্তের হার
পুরুষ	১৯৮ জন	৮০ ভাগ
মহিলা	৫০ জন	২০ ভাগ
মোট	২৪৮ জন	

আক্রান্ত ২৪৮ জনের বয়স ভিত্তিক পরিসংখ্যান।

বয়স সীমা	আক্রান্তের	আক্রান্তের হার

	সংখ্যা	
শিশু	১৭ জন	৭ ভাগ
১৫-১৯	১৭ জন	৭ ভাগ
২০-২৪	৮২ জন	৩৩ ভাগ
২৫-২৯	৫৫ জন	২২ ভাগ
৩০-৩৪	৪৫ জন	১৮ ভাগ
অজ্ঞাত	৩২ জন	১৩ ভাগ
মোট	২৪৮ জন	

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে তরুণ বয়সীরাই এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে সর্বাধিক।

২০০২ সনে আক্রান্ত ৩১৫ জনের মধ্যে জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান:

জেলা	আক্রান্তের সংখ্যা
ঢাকা	৭০ জন
সিলেট	৪৩ জন
চট্টগ্রাম	৫১ জন
খুলনা	৮ জন
রাজশাহী	৩ জন
বরিশাল	৩ জন
বিদেশী	৭ জন
অজ্ঞাত	১৩০ জন
মোট	৩১৫ জন

(সূত্র: জাতীয় এইচআইভি এবং আচরণগত সার্ভিল্যান্সের তৃতীয় পর্যায়ে জরিপের তথ্যাবলি; ২০০০-২০০১)।

এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, যারা এইডস ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তারাও এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। এইডস আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেই তাদের পরিবারের সদস্যরা এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যারা ঝুঁকিপূর্ণ যৌনজীবন যাপন করেছে অথবা বিদেশে যৌনব্যবসায় সম্পৃক্ত হয়েছে, তারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে এ সমস্ত লোকদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ অব্যাহত থাকলে একসময় বাংলাদেশে ঘাতক ব্যাধি এইডস সংক্রমণ মহামারি পর্যায়ে যাবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে রোগটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হল সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারী। এদের শতকরা ৪ ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছে। শিরায় মাদক গ্রহণকারী ছাড়া এইডস ছড়ানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন পর্যায়ের যৌনকর্মী, ট্রাক চালক, রিক্সাচালক, হিজড়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববর্তী জরিপের তুলনায় এইচআইভি সংক্রমণ তেমন বাড়েনি।

২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি হিসাবে এ দেশে এইচআইভি ভাইরাস বহনকারীর সংখ্যা ছিল ২৪৮ জন এবং এদের মধ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ২৬ জন বলা হয়েছিল। সরকারের এই হিসাব এখন বিশ্বাস করে না এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউ এন

এইডসের মতে, বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার বলে উল্লেখ করা হয় ।

বেসরকারী এক হিসাব (২০০৬) অনুযায়ী দেশে এইচআইভি পজেটিভ রোগীর সংখ্যা ৬৫৮জন। এতে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শেষ ঘোষণা অনুযায়ী দেশে ৪৬৫ জন এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সাথে ১৯৩ জন নতুন রোগীকে সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০০৪ সালে ১০২ জন এইচআইভি পজিটিভ নতুনভাবে পুরনো হিসাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ঐ সময়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৪৬৫ জন এইচআইভি পজিটিভের মধ্যে ৮৭ জন এইডসে আক্রান্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ৪৪ জন ইতিমধ্যে মারা গেছে।

২০০৩ সনের মার্চে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বব্যাংক আয়োজিত এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক এক কর্মশালার তথ্য অনুয়ায়ী এইডস বিস্তারের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে।

বছর ভিত্তিক এইচআইভি আক্রান্তের হালনাগাদ পরিসংখ্যান (বাংলাদেশ):

সন	আক্রান্তের সংখ্যা	এক বছরে বৃদ্ধি	বছর ভিত্তিক বৃদ্ধির হার
২০০	১৫৩ জন		
০			
২০০১	১৮৮ জন	৩৫ জন	২২.৮৭ %
২০০২	৩১৫ জন	১২৭ জন	৬৭.৫৫ %
২০০৩	৩৬৩ জন	৪৮ জন	১৫.২৩%
২০০৪	৪৬৫ জন	১০২ জন	২৮.০৯%
২০০৫	৬৫৮ জন	১৯৩ জন	৪১.৫০%

উপরোল্লিখিত ছক অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ২০০৩ সনে বাংলাদেশের মাটিতে এইডস রোগীর বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.২৩%, ২০০৪ সনে ২৮.০৯% এবং ২০০৫ সনে বৃদ্ধির হার ছিল ৪১.৫০%। বছর প্রতি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার হল গড়ে ৩৫%। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সনে বাংলাদেশে উপস্থিত ১৩ হাজার এইচআইভি বহনকারী রোগীর কথা মেনে নিলে ২০১০ সালে এর সংখ্যা দাড়াবে ১৪৩৪১৩ জন। আর ২০০৫ সালে দেশে বিদ্যমান এইচআইভি রোগীর সংখ্যাটি ১৩ হাজার বলে মেনে নিলে ২০১০ সালে এর সংখ্যা দাড়াবে ৫৮২৯০ জন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ঐ সময়ে রোগীর সংখ্যা দাড়াবে ২৯৪৮ জন। হঠাৎ করে বিদেশ প্রত্যাগত এইচআইভি পজিটিভদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে ২০১০

সালের চিত্রটি এমনই হবে। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে অবস্থানকারী এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ৩০-৪০ হাজার মনে করলে ২০১০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৯৬৪৫-১৩২৮৬৮ জন। বাস্তবতার নিরীখে এই হিসাবটিকে অত্যন্ত ফুলানো ফাপানো বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে সার কথা হল যে, বাংলাদেশে এইডস সংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত কোন পরিসংখ্যান নেই। এমনকি বিদেশ প্রত্যাগতদের মধ্যে কতজন এইচআইভি পজিটিভ অবস্থায় দেশে ফিরছে তা যাচাই ও জরিপের কোন ব্যবস্থা নিতে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপক এইচআইভি স্ক্রিনিং ছাড়া এ ধরনের তথ্যভান্ডার তৈরি সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক সংস্থাও দাতা গোষ্ঠী পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় যে- সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের শতকরা ৭১ ভাগই একে অন্যের সঙ্গে তাদের সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করে। জরিপে এইচআইভি সংক্রমণ ছাড়াও দেশের অঞ্চল ভেদে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৯ দশমিক ৪ থেকে ১৯ দশমিক ৪ ভাগ, ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে শতকরা ১২ দশমিক ১ ভাগ থেকে ২৯ দশমিক ৮ ভাগ, পতিতালয়ে অবস্থানকারী যৌনকর্মীদের মধ্যে শতকরা ১৭ দশমিক ৪ থেকে ৪০ দশমিক ১ ভাগ, পুরুষ যৌনকর্মীদের মধ্যে শতকরা ১৪ দশমিক ২ ভাগ, ট্রাকচালক ও হেলপারদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ নানা রকম যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিফিলিসের মতো যৌনরোগের উচ্চহার এইচআইভি সংক্রমণকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আরসকি্ পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় যে, দেশের শীর্ষ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্হিবিভাগে চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী যৌনরোগীদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে রিক্সাচালক, ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার, ছাত্র ও পুলিশ ও বিভিন্ন নিরাপত্তা কর্মীরা।

এইডস ঝুঁকির ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের সম্পর্কে সর্বশেষ জরিপে আশঙ্কাজনক তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপে তাদের মধ্যে এখনও কোন এইচআইভি পজিটিভ পাওয়া যায়নি। তবে দেখা গেছে, দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে (ঢাকা) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ১৮ দশমিক ২ ভাগ আবাসিক ছাত্র নারী যৌনকর্মীর নিকট এবং ২ দশমিক ৭ ভাগ হিজড়া যৌনকর্মীর কাছে গিয়েছিল। এদের মধ্যে শতকরা ৬৪ দশমিক ৭ ভাগই কনডম ব্যবহার করেনি। এই আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে দশমিক ৪ শতাংশ সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণ করে।

এযাবৎ একাধিক জরিপে ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে অভ্যস্ত অধিকাংশ বিবাহিত পুরুষ জানিয়েছে, তারা মহিলা যৌনকর্মী, হিজড়া অথবা অন্য পুরুষের সঙ্গে কনডম ছাড়া

মিলনে অভ্যস্ত এবং এদের কেউ কেউ ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণেও অভ্যস্ত। তাদের প্রায় সবাই তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কনডম ছাড়া মিলিত হয়। স্বামীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কারণে স্ত্রীদের দুই-তৃতীয়াংশ এইচআইভি, হেপাটাইটিস এবং আন্যান্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এদের অনাগত সন্তানরাও ঘাতক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

আর্ন্তজাতিক সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী ও দেশের কিছু এনজিও পরিচালিত ও পরিসংখ্যানটি সর্বোতভাবে সত্য নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত ভ্রমাত্মক।

জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইডস-এর তথ্য অনুসারে কেবল ২০০২ সনেই সারা বিশ্বে ৫০ লাখ লোক এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৩১ লাখ মারা গেছে। এই সংস্থার মতে, সম্পূর্ণ তথ্য না থাকলেও বাংলাদেশে এইচআইভি পজিটিভের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ হাজার। ঠিক একই ধরনের তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশে কর্মরত একটি বিদেশী দাতা সংস্থা। তাদের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বেশ কয়েক হাজার বাংলাদেশী এইচআইভি জীবাণু বহন করছে।

আরসকি'র গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বিদেশে কর্মরত পুরুষদের সাথে এইডস আক্রান্ত এলাকার সাধারণ মানুষসহ যৌনকর্মীদের মিলনের কারণে, বিদেশ প্রত্যাগতদের মধ্যে এইডস ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তাই বিদেশ প্রত্যাগত প্রত্যেকের এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলকভাবে করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর এদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারীর সংখ্যা প্রায় দুই লাখ এবং বৈধ উপায়ে গৃহপরিচারিকাসহ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় বিদেশগামী নারীর সংখ্যাও কম নয়। এদের সবার এইচআইভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন।

এছাড়া দেশের সকল যৌনকর্মীর নিবন্ধনসহ তাদের নিয়মিত এইচআইভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। আরসকি্ পরিচালিত পেশাভিত্তিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে শতকরা ৪৬ ভাগ রিক্সাচালক, বাস ও ট্রাক ড্রাইভাররা পেশাদার যৌনকর্মীদের সাথে মিলিত হয়ে থাকে। তাই রিক্সা, ট্রাক, বাসের সকল চালকের লাইসেন্স নবায়নের সাথে নিয়মিত এইচআইভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। কেননা, বিষয়টি শুধু তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কাজ শেষে যে সমস্ত সেনা ও পুলিশ সদস্য দেশে ফিরছে তাদেরও এইচআইভি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে যারা কর্মরত আছে তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর এক সেমিনারে তিনজন এইচআইভি পজিটিভ সেনাসদস্যকে চিহ্নিত করার বিষয়টি স্বীকার করা হয়। একারণে নিয়মিত বাহিনীর সেনা, আনসার, বিডিআর ও পুলিশ

সদস্যদের নিয়মিত এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন কারাবন্দিদের মধ্যে এইচআইভিসহ বিভিন্ন যৌনরোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা জনস্বার্থেই প্রয়োজন।

বিমানপথে প্রতিদিন যেসব বিদেশী বা বাংলাদেশী নাগরিক দেশে প্রবেশ করছে তাদের কেউ এইডস রোগের জীবাণু বহন করে আনছে কি না তা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা এখন বাংলাদেশের কোন বিমানবন্দরেই নেই। ১৯৮৭ সনে ঢাকা বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের হেলথ চেকিং কাউন্টারটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতের এইডসপীড়িত মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা বাংলাদেশী চা শিল্পের প্রায় ছয় লাখ শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মাঝেও সহজেই এইডস সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোসহ সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি যারা বাস করে তাদের এইচআইভি স্ক্রিনিং করা দরকার। এরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে।

এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে অধিকাংশই (প্রায় ৪৫ ভাগ) মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে প্রত্যাগত। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের প্রধান কারণ হল ভারতের বিভিন্ন বড় শহর যেমন কলকাতা, মুম্বাই এবং থাইল্যান্ডের ব্যাংককের পেশাদার যৌনকর্মীদের সাথে মেলামেশা। এরাই দেশের মধ্যে প্রধানত অনিয়মিত যৌনকর্মী, ভাসমান যৌনসঙ্গী ও গৃহবধূদের মধ্যে এইডস ছড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বামী বিচ্ছিন্ন গৃহবধূদের মধ্যে বহুগামিতা বা অবৈধ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে একদিকে যেমন সাধারণ যৌনরোগগুলো ছড়াচ্ছে, তেমনি এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ছে। এধরনের শহুরে গৃহবধূদের মধ্যে যারা মেয়েলি রোগে ভূগছে তাদের ৩৮ ভাগই যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত এবং ৩৩ ভাগ বিবাহ বর্হিভূত যৌনসম্পর্কে লিপ্ত। (আরসকি্ গবেষণা)

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের অবিবাহিত কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে (১৩-২৩ বয়সসীমার) ৪০ ভাগই যৌন-সক্রিয় এবং এদের বিবাহ বহির্ভূত এক বা একাধিকবার যৌনমেলামেশার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তবে অধিকাংশের মধ্যে সম্পর্কের ধরণটি হেটেরোসেক্সুয়াল। এদের মধ্যে সমকামীদের সংখ্যা অতি নগন্য হলেও ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পাশ্চাত্য বিশ্বে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পায়ুপথে যৌনমিলনের হার বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে এ প্রবণতাটি এখনও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি।

কুমারীত্বের ধারণাটি যোনিপথে মেলামেশার সাথে সম্পর্কিত করবার কারণে এবং নেশাদ্রব্যের সাথে ব্যক্তির

সম্পর্কের বিবর্তনের কারণেই পায়ুপথে মিলনের হারটি পাশ্চাত্যে তুলনামূলকভাবে বেশি। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে পায়ুপথে মিলনে অভ্যস্ত পুরুষের সংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে বেশি।

এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীসহ বিভিন্ন ক্যাজুয়াল যৌনসঙ্গী ও যৌনকর্মীদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

৩.২.১. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আক্রান্ত নারীদের সংখ্যা নির্ণয়ে সমস্যাটা কোথায়?

সামাজিক কারণে নারীরা আড়ালে থাকায় এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সরাসরি কথা না বলায় রোগের বিস্তার সংক্রান্ত তথ্যগুলো সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না। যদিও অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিক, পারিবারিক চিকিৎসা কেন্দ্র, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগাযোগ হচ্ছে, তবুও এটা এইডসের উপস্থিতি নির্ণয়ে খুব কার্যকর পদ্ধতি বলে বিবেচিত হচ্ছে না। যৌনরোগের চিকিৎসার বিষয়টি এ সমস্ত ক্লিনিক ও সার্ভিসের অন্তর্গত হলে এবং ভালনারেবল গ্রুপের জন্য এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের মধ্যে এইডস বিষয়ক সচেতনতার আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হল সমাজে তাদের অবদমিত স্থান এবং তাদের ওপর সামাজিকভাবে আরোপিত ইমেজ। একজন গৃহিণী নিঃসংকোচে তার যৌনরোগ প্রকাশে কিংবা রোগ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকে। কেননা নারী দেহের অনেক রোগকেই তার ব্যর্থতা ও ত্রুটি বলে গণ্য করা হয়।

এছাড়া দরিদ্র পরিবারের নারীরা অসুখ বিসুখের কথা প্রকাশ করে পরিবারের কর্তার আর্থিক বোঝা বাড়াতে অনিচ্ছুক থাকে। তার ওপরে যৌনরোগের বিষয়টি সকল শারীরিক সমস্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া স্পর্শকাতরতার কারণে বিষয়টি অপ্রকাশিত থাকে পরিবার পরিজন ও চিকিৎসকের নিকট।

এইচআইভি আক্রান্ত অনেক নারীই তাদের যৌনসঙ্গীদের মধ্যে রোগের সংক্রমণের ব্যাপারে মারাত্মক উৎকণ্ঠায় ভোগেন। অনেকে নিজেদের শারীরিক অবস্থা তাদের সঙ্গীকে জানান, আবার অনেকে তা গোপন করেন। কেউ কেউ যৌনসংযোগ একেবারেই পরিহার করেন। আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করেন। তবে স্বাভাবিক কারণে সবাই গর্ভধারণকে এড়িয়ে চলতে চান। এ প্রেক্ষাপটে রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এইচআইভি পজেটিভ ব্যক্তিদের নিরাপদ যৌনজীবন সংক্রান্ত শিক্ষাদান কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে যৌনরোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য নারীকে শুধু নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী, পারদর্শীতা এবং আচরণের ওপর নির্ভর করলেই হবে না, সেই সাথে তাদের যৌন সঙ্গীদেরকে কনডম ব্যবহারে রাজি করানোর ব্যাপারে জোর দিতে হবে। তাকে তার অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি ও পুরুষ শক্তির দাপটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

৩.৩.১ বাংলাদেশের ভাসমান যৌনকর্মীদের অবস্থা:

ঢাকাস্থ অ্যালার্জি অ্যাজমা এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আরস্‌কি) ২০০২-২০০৩ সনে পরিচালিত এক গবেষণায় উল্লেখ করে যে, ঢাকা শহরের ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৯ ভাগ সাধারণ যৌনরোগগুলো সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন। ৯৫ ভাগ যৌনকর্মী এইডস রোগটির নাম শুনেছে। তবে এ রোগের সংক্রমণ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলো অসম্পূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। এই যৌনকর্মীদের অনেকে মনে করে এইডস রোগটি সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়ার মত একটি সাধারণ যৌনবাহিত রোগ। তারা এটাও মনে করে যে, এ রোগের চিকিৎসা আছে এবং ইনজেকশন নিলে রোগটি সেরে যায়। গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, শতকরা ১৭ ভাগ যৌনকর্মী মনে করে এইডস একটি সাধারণ ছোঁয়াচে রোগ। ৫ ভাগ যৌনকর্মী এইডসের নামই শোনেনি এবং ২১% যৌনকর্মী এ রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তারা মনে করে, অন্যের কাপড়-চোপড় পরা, অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড ব্যবহার, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকা, এঁটো খাবার খাওয়া, এঁটো গ্লাস প্লেটে পানাহার করা থেকে এইডস সংক্রমিত হতে পারে। যৌনকর্মীদের অনেকে মনে করে, এইডস আক্রান্তের নিকট সংস্পর্শে এসে অথবা তাদের সাথে শুয়ে থেকে কিংবা শারীরিক সংস্পর্শ থেকে এইডস সংক্রমিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এটাকে বাতাস বাহিত রোগের মত ছোঁয়াচে মনে করে। যৌন অনাচার, অনিয়ম থেকে শুরু করে ব্যবহৃত কনডমের সংস্পর্শে, এমনকি কনডম পায়ে মাড়ানো থেকেও এইডস ছড়িয়ে পড়ে এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করে।

এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ যৌনকর্মীরা পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস সহ নানাবিধ যৌনবাহিত রোগে ভুগছে। যৌনরোগগুলোর মধ্যে ভ্যাজাইনাল ট্রাইকোমোনিয়াসিস, গনোরিয়া ও নন-স্পেসিফিক ভ্যাজাইনাইটিস রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপর সিফিলিস, জেনিটাল আলসার (হারপেস ভ্যাজাইনাইটিস বা এইচএসভি-২), জন্ডিস বা হেপাটাইটিস-বি ও ক্ল্যামাইডিয়া রোগের অবস্থান।

ক্ল্যামাইডিয়া ও ট্রাইকোমোনিয়াসিসকে অধিকাংশ যৌনকর্মী সাধারণ সাদা স্রাব বলে মনে করে। যারা ভ্যাজাইনাটিসে ভুগছে তাদের প্রায় শতভাগই প্যাথজেনিক ইকোলাই কর্তৃক সংক্রমিত। এদের ৯০% এর মধ্যে ইস্ট বা ছত্রাকের সংক্রমণ রয়েছে।

এই গবেষণা প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, শতকরা ২৩ ভাগ যৌনকর্মী কখনই চিকিৎসকের কাছে যায়নি এবং ৪৬% কখনও এইচআইভি টেস্ট করেনি। এছাড়া ৩৮% যৌনকর্মী মোটাদাগে অসুস্থ অবস্থাতেই কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশে ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে দৈনিক গ্রাহকের সংখ্যা উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে বলে আরস্কি পরিচালিত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। একজন যৌনকর্মী দৈনিক ৭ থেকে সর্বোচ্চ ৪০ জনের সাথে মিলিত হয়। এই পরিসংখ্যান এক কথায় ভয়াবহ।

ভাসমান যৌনকর্মীদের খদ্দেরদের বেশিরভাগই রিক্সাওয়ালা শ্রেণীর লোক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পবয়সী ছাত্ররাও আসে ব্যাপক সংখ্যায়। বিভিন্ন বাসাবাড়ি ও অফিসের নৈশপ্রহরীরাও তাদের বড় গ্রাহক। এছাড়া পুলিশ তো আছেই। লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের প্রধান গ্রাহক লঞ্চ-স্টিমারের শ্রমিক-চালকরা। মাঝে মাঝে কিছু যাত্রীও তাদের কাছে আসে। বাস টার্মিনালগুলোতেও একই চিত্র। সেখানে যৌনকর্মীদের প্রধান গ্রাহক পরিবহণ শ্রমিকরা। বাস, ট্রাকের হেলপার ও ড্রাইভারদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই ভাসমান যৌনকর্মীসহ স্থায়ী যৌনপল্লীগুলোতে নিয়মিত যাতায়াত করে।

আরস্কি'র গবেষণা থেকে আরও জানা যায়, খদ্দেরের আপত্তির কারণে ভাসমান যৌনকর্মীরা প্রায়ই কনডম ব্যবহার করতে পারে না। এবং তাদের যৌনসঙ্গীদের কনডম ব্যবহারে রাজি করাতে পারে না। শতকরা ২০ ভাগ যৌনকর্মী শেষবার মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করেনি। এছাড়া ১০% যৌনকর্মী কখনই কনডম ব্যবহার করে না।

যৌনকর্মীদের অনেকে প্রথম দিকে কনডম ব্যবহার করত না। পরবর্তীতে যৌনরোগ সংক্রমণের বিষয়টি জানতে পেরে কনডম ব্যবহার শুরু করেছে। কেউ কেউ আবার খদ্দেরদের সঙ্গে কনডম ব্যবহার করলেও স্বামী বা স্থায়ী সঙ্গীর সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে কোন সুরক্ষা নিচ্ছে না। শতকরা ৬৮ ভাগ যৌনকর্মী জানায়, কনডম ব্যবহারে খদ্দেররা আপত্তি করছে। এ আপত্তিকারীদের মধ্যে ছাত্ররাই প্রধান। খদ্দেরদের কেউ কেউ কনডম ছাড়া মেলামেশা করার জন্য বেশি অর্থ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। রিক্সাওয়ালা, বাস ট্রাকের ড্রাইভার-হেলপার এবং থানা, ফাঁড়ি ও রেলওয়ে পুলিশদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই যৌনমিলনের ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করতে চায় না।

এই গবেষণায় নতুন যে বিষয়টি জানা যায় তা হল, ৪% যৌনকর্মী ফিমেল কনডম ব্যবহার করে। তবে দাম বেশি বলে কেউ কেউ একটি ফিমেল কনডম তিন-চার বার করে ব্যবহার করে। ফিমেল কনডম ব্যবহারে যৌনাঙ্গে ব্যথা হয় বলে তারা এগুলো ব্যবহারে উৎসাহী হচ্ছে না।

এই গবেষণায় কোন যৌনকর্মীর দেহে এইচআইভি'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও সম্প্রতি দু'জন যৌনকর্মী এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে জানা যায়।

২০০২-২০০৩ সনে আরসকি্ পরিচালিত মাঠ পার্যয়ে গবেষণা দেখা যায় যে, ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে মাত্র ৯.৮৪ ভাগ কনডম ব্যবহার করে না। যারা কনডম ব্যবহার করে তাদের মধ্যে শতকরা ৭৬.৫২ ভাগ নিয়মিত কনডম ব্যবহার করে এবং শতকরা ১৩.৬৪ ভাগ খদ্দেরের আপত্তির কারণে মাঝে মাঝে কনডম ব্যবহার করে না।

দৈনিক ব্যবহৃত কনডমের সংখ্যা- ৫০.৭৬ ভাগ ভাসমান যৌনকর্মী দৈনিক ২ থেকে ৬টি কনডম ব্যবহার করে। দৈনিক ৭-১০টি কনডম ব্যবহার করে ২১.২১% যৌনকর্মী, ১১-২০টি কনডম ব্যবহার করে ৮.৩৩%, ২০-৩০টি ব্যবহার করে ৬.০৭%। মাত্র ১.৫১% যৌনকর্মী দিনে ১টি করে কনডম ব্যবহার করে। দিনে ৩০টির বেশি কনডম লাগে ০.৭৬% যৌনকর্মীর। এছাড়া ৩.৭৯% যৌনকর্মী কতটি কনডম লাগে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভাসমান যৌনকর্মীরা কনডম ব্যবহার করলেও তাদের মধ্যে ৪% যৌনকর্মী ফিমেল কনডমও ব্যবহার করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ একটি ফিমেল কনডম ৩/৪ বার করে ব্যবহার করে। ফিমেল কনডম ব্যবহার করলে যৌনাঙ্গে ব্যথা পায় বলে কেউ কেউ পরবর্তীতে আর তা ব্যবহার করেনি।

শেষ বার মিলনের সময় কনডম ব্যবহার – শেষবার মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করেছে ৮০.৩০ ভাগ, ব্যবহার করেনি ১৮.৯৪%।

কনডম ব্যবহারে খদ্দেরদের মনোভাব:- কনডম ব্যবহারে খদ্দেররা আপত্তি করে এমন তথ্য দিয়েছে ১৪.৩৯% যৌনকর্মী; ৯.০৯% যৌনকর্মী বলেছে যে এ ব্যাপারে খদ্দেরদের আপত্তি নেই। কেউ কেউ আপত্তি করে বলেছে ৬৮.১৮% অবশিষ্ট ৮.৩৪% যৌনকর্মী স্বেচ্ছায় কনডম ব্যবহারে বিরত থাকে বলে স্বীকার করেছে।

অধ্যায় চার

এইডসের লক্ষণ

৪.১.১. এইচআইভি সংক্রমণের বিভিন্ন স্তর :

এইচআইভি আক্রমণের পর রোগের শুরু থেকে পরিণতি পর্যন্ত সময়কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর হল, অনসেট (Onset) বা রোগের শুরু পর্যায়,

দ্বিতীয় স্তরটি হল, রোগের লক্ষণবিহীন অবস্থা,

তৃতীয় স্তরটি হল, দীর্ঘমেয়াদী বিবিধ লক্ষণের প্রকাশ এবং

চতুর্থ বা শেষ স্তর হল গুরুতর অসুখের অবস্থা।

ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর দুই থেকে আট সপ্তাহ সময় লেগে যায় শরীরে এন্টিবডি তৈরি হতে। এন্টিবডি তৈরি হবার প্রক্রিয়াটিকে সেরোকনভারশন বলে। এই এন্টিবডি তৈরি হবার আগ পর্যন্ত রক্ত এইচআইভি সেরোনেগেটিভ থাকে। এন্টিবডি তৈরি হবার পরেই রক্ত সেরোপজিটিভ হয়। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুই থেকে আট সপ্তাহ সময় লাগে। বিশেষ ক্ষেত্রে এন্টিবডি তৈরির বিষয়টি ছয় মাস পর্যন্তও দেরি হতে পারে।

সংক্রমণের সময় থেকে সেরোকনভারশন পর্যন্ত সময়কে এন্টিবডি তৈরির উইন্ডো পিরিয়ড (window period) বলা হয়। সাধারণত সংক্রমণের দুই মাস পরেই এইচআইভি এন্টিবডি তৈরি হয় এবং প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ছয় মাসের মধ্যে এন্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। তবে একভাগ ক্ষেত্রে ছয় মাসের বেশি সময় প্রয়োজন হয় এন্টিবডি তৈরি হতে। ০.০১ ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন বছর পরেও সেরোকনভারশন হতে পারে।

এইচআইভি ভাইরাস ইমিউন ব্যবস্থার বিশেষ স্থানসহ ইমিউন কোষ এবং সেই সাথে মিউকাস আবরণ ও স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ কোষের সাথে সংযুক্ত হয়ে এর নীরব অগ্রযাত্রা চালু রাখতে পারে।

এসব কারণে দুর্ঘটনাজনিত এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময়ে বার বার রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে তা দুই থেকে তিন বছর পরেও করা প্রয়োজন।

এইচআইভি এন্টিবডি তৈরি হবার পরেই পরীক্ষা নিরীক্ষায় রোগের উপস্থিতি ধরা পড়ে। তবে ভাইরাসটি শরীরের মধ্যে নীরবেও অনেকদিন থাকতে পারে। এ কারণে এইচআইভি নেগেটিভ হওয়া মানেই এই নয় যে, একজন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যেয়ে এর criteria -কে দু'ভাগে ভাগ করেছে।

প্রধান লক্ষণ বা major criteria:

ওজন হ্রাস (শারীরিক ওজনের প্রায় দশ শতাংশ),
ক্রনিক ডায়রিয়া (একমাসের অধিক সময় স্থায়ী),
দীর্ঘস্থায়ী জ্বর (একমাসের অধিক সময় ধরে)।

গৌণ লক্ষণ বা minor criteria:

ভাল হচ্ছে না এমন কাশি (একমাসের অধিক সময় ধরে),

সাধারণভাবে সমস্ত শরীরময় ত্বকের প্রদাহ বা প্রুরাইটিক ডার্মাটাইটিস,

রেকারেন্ট বা একাধিকবার হারপেস জোস্টারের সংক্রমণ,

খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীতে ছত্রাকের সংক্রমণ,

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়া দীর্ঘমেয়াদী হারপেস ভাইরাসের সংক্রমণ,

সমস্ত শরীরব্যাপী লসিকাগ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়া।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে রোগীর লক্ষণগুলো মূল্যায়ন করে প্রায় ৭৪ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা সম্ভব। প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল কেস ডেফিনিশন বা রোগীদের রোগ শনাক্তকরণের বিষয়টি বির্তকের ঊর্ধ্বে থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্যাফোসিস সারকোমা, ইসোফ্যাজাইল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ক্রিপ্টোকক্কোসিস ও স্লিমডিজিজের সাথে যক্ষ্মা রোগকে মধ্য আফ্রিকায় এইডস সংশ্লিষ্ট রোগ হিসাবে শনাক্ত করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র Criteria প্রয়োগ করে আফ্রিকার যক্ষ্মা হাসপাতালগুলোর রোগীদের মধ্যে প্রায় ৫৮ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়। আফ্রিকানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ক্যাফোসিস সারকোমা এবং ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিসকে এইডস রোগের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এইচআইভি আক্রান্ত আফ্রিকানদের প্রায় ৫০ ভাগই কোন না কোন সময় যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে যৌনাঙ্গে ঘা এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কো-ফ্যাক্টর।

সামগ্রিকভাবে আফ্রিকা মহাদেশে যৌনকর্মীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে যেগুলোকে রিস্ক ফ্যাক্টর বা অন্যতম প্রধান ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করা হয় তা হল– সিফিলিস, গনোরিয়া, শ্যাংক্রয়েড, যৌনাঙ্গে ঘা, ক্ল্যামাইডিয়া, ট্রাইকোমোনিয়াসিসের কারণে সার্ভিক্সে ঘা বা সারভাইক্যাল ইনফেকশন এবং ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার।

৪.২.১. মোটাদাগে এইডসের লক্ষণগুলো কী কী?

এইডস রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীরে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হল:

- এক মাসের বেশি স্থায়ী জ্বর, কাশি, দুর্বলতা,
- গায়ে ব্যথা ও লাল লাল চাকা বের হওয়া,
- মাথা ব্যথা,
- লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া,
- গিরায় গিরায় ব্যথা,

- শরীরের ওজন ১০ ভাগের অধিক হ্রাস পাওয়া,
- একমাসের অধিক স্থায়ী পাতলা পায়খানা,
- একাধিকবার হারপেস জোস্টার (Herpes zoster)-এর সংক্রমণ,
- দীর্ঘ সময় মুখ ও গলায় ছত্রাক সংক্রমণ ইত্যাদি।

৪.২.২. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রাথমিক লক্ষণ :

এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর যে প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হল– জ্বর, দুর্বলতা, পেশীর দুর্বলতা, মাথা ব্যথা, মস্তিষ্কের প্রদাহ, চোখে এবং চোখের চারপাশে ব্যথা, অতিরিক্ত আলোক সংবেদনশীলতা, গলা বসে যাওয়া, গলা ব্যথা, গায়ে লাল লাল দাগ, লসিকাগ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে রোগের শুরুটা হয় সাধারণ ফ্লু'র মত। কখনও কখনও এ লক্ষণগুলোর সাথে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিয়োসিস (infectious mononucleosis)-এর লক্ষণ মিলে যায়। কেননা মনোনিউক্লিয়োসিস রোগেও জ্বর, গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। মনোনিউক্লিয়োসিস ঘটে এপস্টেইন বার ভাইরাস দ্বারা। আর এই ভাইরাসটি কখনও কখনও এইচআইভি'র উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে, আবার কখনও এইডস আক্রান্তদেরকে বেশি করে আক্রমণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত হবার পর বিভিন্ন গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর দীর্ঘ সময় অনেকেরই কোন রোগের লক্ষণ থাকে না।

৪.২.৩. কনস্টিটিউশনাল লক্ষণ (constitutional symptoms):

এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণগুলোকে কনস্টিটিউশনাল লক্ষণ বলে। এর মধ্যে জ্বর, লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সেই সাথে টি-হেলপার কোষের সংখ্যা পাঁচশ'র নিচে নেমে আসে।

সেরোকনভারশন পর্যায়টি অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এসব শারীরিক সমস্যাগুলো আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। এরপর পাঁচ থেকে দশ বছর খুব অল্প কিছু লক্ষণ শরীরের মধ্যে দেখা দেয়।

৪.৩.১ এইডস রোগটি দেখা দেয়ার প্রাক্কালে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কেমন হয়ে থাকে?

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফলাফল মতে, এইচআইভি সংক্রমণের কারণে যখন এইডস রোগটি দেখা দেয় তখন রোগী যেসমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে হাজির হয় তা হল– ফুলে যাওয়া লসিকাগ্রন্থি, সেই সাথে রক্তে দুশ'র নিচে টি-হেলপার কোষ, এর সাথে থাকে জ্বর, ডায়রিয়া, ওজন হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ।

এই শারীরিক উপসর্গগুলো এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থাতেও একবার দেখা দিয়ে থাকে। তবে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতির পরে যখন এ সমস্যাগুলো পুনরায় দেখা দেয় তখন এর মধ্যে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নতুন করে দেখা দেয়া উপসর্গগুলোর সাথে আর যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তা হল ফুসফুসে নানা অসুবিধা। ফুসফুসের অসুবিধাগুলোর মধ্যে নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া বা পিসিপি'ই প্রথমে দেখা দেয়। নিউমোসিসটিস ক্যারিনি একজাতীয় ছত্রাক। এসময় অন্যান্য ছত্রাকের সংক্রমণও ঘটে থাকে। এতে নিউমোনিয়া ছাড়া গলাতেও ছত্রাকের সংক্রমণ দেখা দেয়।

ব্যাক্টেরিয়াজনিত নানা সংক্রমণ, যক্ষ্মা, যৌনবাহিত রোগসহ স্নায়ু সংক্রান্ত নানা সমস্যাও দেখা দেয় এসময়। এইডসের কারণে মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্সসহ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিসেরও সংক্রমণ ঘটে। এতে রোগীর যক্ষ্মা রোগ দেখা দেয়। হাঁচি, কাশির মাধ্যমে ড্রপলেট ইনফেকশনের কারণে যক্ষ্মা রোগীর শরীর থেকে জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া পূর্ব থেকেই শরীরের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা যক্ষ্মার জীবাণু এসময় কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটায় এটা কেবল ফুসফুসকেই আক্রমণ করে না, সেই সাথে শরীরের প্রায় সকল ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করে। এইডস রোগীরা যখন যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হয় তখন তা শনাক্ত করা ও চিকিৎসা করা হয় অত্যন্ত কঠিন।

পূর্বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংসের কারণে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণকেই এইডসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হত। এ ভাবেই চিকিৎসকরা রোগ শনাক্ত করতেন। বর্তমানে ইমিউন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবস্থান এবং টি-হেলপার কোষের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করেই এইডসকে শনাক্ত করা হয়।

অনেকে এইচআইভি সংক্রমণের পর প্রায় পনেরো বছর পর্যন্ত বেশ সুস্থভাবে বেঁচে থাকে। এরপর এক সময় হঠাৎ করেই এইডসের লক্ষণ দেখা দেয়। এরপর হয়তো বছর দুয়েক বেঁচে থাকে। আবার অনেকের মধ্যে এইডসের লক্ষণ আগে দেখা দেয় এবং রোগ নিয়ে এরা প্রায় দশ বছর বেঁচে থাকে। এইডস সংশ্লিষ্ট কোন অসুখগুলো রোগীকে আক্রমণ করছে তার ওপরই রোগীর আয়ু নির্ভর করে। যেমন, যাদের মধ্যে ক্যাফোসিস সারকোমা দেখা দেয়, তারা পিসিপি গ্রুপের চেয়ে বেশি বাঁচে। তবে এইডসের শেষ পর্যায়ে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে এবং সকল রোগে প্রতিরোধ হারিয়ে ফেলে। এইসময় কোন চিকিৎসাই এদের ওপর কাজ করে না এবং এ অবস্থাতেই এদের মৃত্যু হয়।

৪.৪.১. লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাবার ধরন :

প্রোগ্রেসিভ জেনারালাইজড লিম্ফাডেনোপ্যাথি (progressive generalized

lymphadenopathy) অথবা লিম্ফাডেনোপ্যাথি সিনড্রমটি এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতে লসিকাগ্রন্থিগুলো এমনভাবে ফুলে যায় যে হাত দিয়ে চামড়ার নিচে ফোলা গ্রন্থিগুলোকে অনুভব করা যায়। সাধারণত গলার দু'পাশে সুপারফিশিয়াল সারভাইক্যাল গ্রুপ (superficial cervical group), বগলের নিচে অ্যাক্সিলারি গ্রুপ এবং কুচঁকিতে ইনগুইনাল গ্রুপ গ্রন্থিগুলো ফুলে থাকে। প্রায় ৭০ ভাগ রোগীর মধ্যে এই লক্ষণটি দেখা দেয়। অনেকের মধ্যে এই লসিকাগ্রন্থি ফুলে না, কিংবা ফুললেও দীর্ঘমেয়াদী হয় না।

লসিকাগ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়া মানেই এই নয় যে, কেউ এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। এর সাথে ইমিউন ব্যবস্থার গুরুতর অবনতিরও তেমন সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রে শরীরে অন্য কোন লক্ষণের আগে এটিই প্রথম দেখা দেয় এবং যখন এগুলো ফুলে যায় তখন তা কয়েকমাস ব্যাপী স্থায়ী হয়।

এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে আর যেসব লক্ষণ সবচেয়ে আগে দেখা দেয় তা হল– দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিম্নমাত্রায় জ্বর, বিরামহীন দুর্বলতা, দু'সপ্তাহব্যাপী পাতলা পায়খানা, গায়ে লাল লাল দাগ, লক্ষ্যণীয় ওজন হ্রাস; ওজন হ্রাস পাঁচ কেজির ওপর ছাড়িয়ে যায়। এর সাথে রাত্রে রাত্রে ঘাম হয়, কখনও গলার মধ্যে সাদা সাদা আবরণ পড়ে বা ছত্রাকের সংক্রমণ হয়।

এই লক্ষণগুলোকে অনেকসময় এইডস রিলেটেড কমপ্লেক্স বা ARC বলে অভিহিত করা হয়। এখন অবশ্য এআরসি কথাটা ব্যবহৃত হয় না। কেননা, এই লক্ষণগুলো এমন নয় যে, এর পরিণতিতে সবসময় এইডস রোগ ঘটবে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কিছুটা ঘাটতি হলেও বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী সংক্রমণের কারণে এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণের এই লক্ষণগুলো দেখা দেবার পর যদি রক্ত পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এইচআইভি নেগেটিভ, সেক্ষেত্রে পরপর কয়েকবার পরীক্ষা করাতে হবে। অন্যান্য যেসব রোগের কারণে এসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ইনফেকশাস মনোনিউক্লিয়োসিস, ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রম (Infectious mononucleosis chronic fatigue syndrome)।

৪.৫.১. এইচআইভি ওয়েস্ট সিনড্রমের অন্তর্গত কয়েকটি লক্ষণ ও উপসর্গ

দশ ভাগের বেশি ওজন কমে যাওয়ার সাথে পাতলা পায়খানা (কমপক্ষে দৈনিক দু'বার করে ৩০ দিন) অথবা ওজন হ্রাসের সাথে ক্রমাগত দুর্বলতা এবং ৩০ দিনের বেশি জ্বর (সবসময় থাকে বা ছেড়ে ছেড়ে যায় এমন) ইত্যাদি লক্ষণ ও উপসর্গকে ওয়েস্টিং সিনড্রম বলে। এ জ্বরের সাথে শরীরে যক্ষ্মা, ক্যান্সার,

ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস অথবা সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এন্টেরাইটিস (enteritis)-এর উপস্থিতি এইডসের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। এইডসের লক্ষণগুলোর মধ্যে সার্ভিক্স (cervix) ভেতরে ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সারও অন্তর্গত।

বারবার নিউমোনিয়ার সংক্রমণও এইডসের লক্ষণ। তবে বছরে একাধিকবার নিউমোনিয়া হলেই তা এইডসের একটি লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। নিউমোনিয়া অবশ্যই প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা, কফের কালচার ও এক্সরে পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত হতে হবে। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া রোগ নির্ণয়কে অনুমানভিত্তিক বলে চিহ্নিত করা হবে।

৪.৫.২. স্লিম ডিজিজ (Slim disease) কী?

আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া এবং ওজন কমে যাওয়া এইচআইভি-এর একটি বড় লক্ষণ বলে ধরা হয়। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ৪০ ভাগই একমাসের অধিককাল ডায়রিয়ায় ভুগে থাকে। নানাবিধ ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, কৃমিসহ বিভিন্ন পরজীবী এসব রোগীর মলে পাওয়া যায়। অনেক রোগীর মলে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম (cryptosporidium) এবং আইসোসপোরা (isospora) পাওয়া গেলেও এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকের মলে কোন জীবাণুই শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। এরা অনেক সময় জীবাণু ও পরজীবী বিনাশী চিকিৎসাতেও ভাল হয়না। তবে এইচআইভি নেগেটিভদের মধ্যে কক্কিডিয়ান ইনফেকশন খুব কম হয়ে থাকে।

এইডসের সাথে যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া সম্পর্ক :

যক্ষ্মা ও ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়া এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে। আফ্রিকার মত ভারতীয় এইডস রোগীদের মধ্যেও যক্ষ্মা রোগের হার উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান। আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়াতে ব্যাপকভাবে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এইচআইভি সেরোপজিটিভদের মধ্যে শতকরা ২৮.৪ ভাগ রোগী হাসপাতাল ভর্তি হয়েছে ফুসফুসে নানা ধরণের সংক্রমণ নিয়ে।

বুরুন্ডির হাসপাতালে ফুসফুসের নানা রোগ নিয়ে ভর্তি হওয়া ৩০২ জন রোগীর মধ্যে ২২২জন অর্থাৎ শতকরা ৭৩.৫ ভাগ এইচআইভি পজেটিভ হয়েছে। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যে সব ফুসফুসের রোগ প্রাধান্য বিস্তার করছে তা হল যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া। এই সব রোগীদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ পিসিপি-তে আক্রান্ত হয়েছে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্তদের ব্যাপক অংশ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে পিসিপি একটি প্রধান রোগ হলেও আফ্রিকানদের মধ্যে এটি কম ঘটে থাকে। এর প্রধান কারণ সম্ভবত আপেক্ষিকভাবে আফ্রিকার আবহাওয়ায় এর নিম্ন

উপস্থিতি এবং রোগীর সাথে জীবাণুর নিম্নমাত্রায় সংযোগ।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশে প্রতি ৪জন এইচআইভি রোগীর মধ্যে একজন নিউমোনিয়াতে ভূগছে। এর মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগই হচ্ছে community based pneumonia। আফ্রিকা মহাদেশে এইচআইভি আক্রান্ত দের মধ্যে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল যক্ষ্মা। এইচআইভি রোগীদের প্রতি ৩ জনের মধ্যে একজন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে। সাব-সাহারা অঞ্চলের ২৬ থেকে ৬৭ ভাগ যক্ষ্মা রোগী এইচআইভি পজিটিভ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪.৬.১. শিশুদের মধ্যে এইডস-এর লক্ষণগুলো কী ধরনের?

অধিকাংশ শিশুদের রোগের লক্ষণের সাথে বড়দের লক্ষণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে শিশুদের মধ্যে নানা রকম রোগের ঘন ঘন সংক্রমণই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা দেয়। এরা এত রোগা এবং নানাবিধ জটিল সংক্রমণে মরণাপন্ন থাকে যে এদেরকে বাঁচানোই কঠিন বলে মনে হয়। খুব সহজেই এদের স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয় এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা।

আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ছোঁয়াচে নানা ঘাতক ব্যধি প্রতিরোধে ইমিউনাইজেশন পদ্ধতিটি কী হবে তা নিয়ে অনেক চিকিৎসকেরই প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন থাকে এই কারণে যে, এই সময় শিশুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা একেবারে নিম্ন পর্যায়ে থাকে। তাতে অনেকে মনে করেন যে, ভ্যাকসিনজনিত কারণেই শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। আসলে তা নয়। যদিও মনে করা হচ্ছে যে, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবেন, তবু সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, পোলিও, মাম্পস, টিটেনাস, যক্ষ্মা ইত্যাদির ভ্যাকসিন না দিলেই বরং ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে।

৪.৭.১. আক্রান্তের ত্বকে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় আফ্রিকাতে চর্মরোগের সমস্যাগুলো বেশি ঘটে থাকে। জাম্বিয়াতে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ৯৮ ভাগই বিভিন্ন চর্মরোগে ভুগে থাকে। ক্যাফোসিস সারকোমা, হারপেস জোস্টার, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, প্রুরাইটিক ম্যাকুলো প্যাপুলার র‍্যাশগুলো সাধারণভাবে এ অঞ্চলের এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে দেখা যায়।

এইচআইভি আক্রান্ত আফ্রিকানদের মুখে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ছত্রাকজনিত আবরণ (thrush), মাড়ির এক ধরনের ঘা যার নাম আলসারো-নেক্রোটাইজিং জিনজিভাইটিস (ulcero-necrotizing gingivitis)। এদের মধ্যে ক্যাফোসিস সারলোমা অনেক সময় মুখগহ্বরেই প্রথম দেখা দেয়। তবে মুখে লিউকোপ্লাকিয়া তেমন দেখা দেয়না।

মোটামুটিভাবে এইডস আক্রান্তদের শরীরের চামড়ায় যেসমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়, সেগুলো হল:

- প্রুরাইটিক ডার্মাটাইটিস
- প্রুরাইটিক ম্যাকুলো প্যাপুলার র‍্যাশ। এই লক্ষণটি আফ্রিকাতে বেশি দেখা যায়। জায়ারে এইডস আক্রান্তদের মধ্যে এ রোগ সংক্রমণের হার ২০ ভাগ।
- হারপেস জোস্টার। আফ্রিকাতে ১০ থেকে ১৫ ভাগ এইডস রোগীর ক্ষেত্রে এ রোগ সংক্রমণ হয়ে থাকে।
- হারপেস সিমপ্লেক্স
- ক্যাফোসিস সারকোমা
- সেবোরিক ডার্মাটাইটিস
- মাল্টি ডার্মাটোমাল নেক্রোটিক হারপেস জোস্টার। এই লক্ষণটি আফ্রিকাতে বেশি দেখা যায়।

৪.৮.১. এইডস রোগে চোখের সমস্যা :

এইডস রোগে চোখের সমস্যা সাধারণত চোখের ইনফেকশনের কারণেই হয়ে থাকে। তবে এরমধ্যে সচরাচর ঘটে এমন রোগ হল সাইটোমেগালো ভাইরাসের কারণে সিএমভি রেটিনাইটিস (retinitis)। বিশেষ করে যখন টি-হেলপার কোষের সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে নেমে যায়, তখন এ ধরনের ভাইরাস চোখের রেটিনাকে আক্রমণ করে সিএমভি রেটিনাইটিস তৈরি করে। এতে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। ফলে রোগী অনেক সময় চোখের সামনে দিয়ে এমন কিছু ভেসে যেতে দেখে যা কি না অস্পষ্ট ভাসমান ময়লা বা ছায়ার মত মনে হয়। এতে চোখের কোণার দিকে দৃষ্টিক্ষমতা বা পেরিফেরাল ভিশনও (peripheral vision) কমে যায়। টক্সোপ্লাজমোসিস নামক আরেকটি রোগ চোখ ও মস্তিষ্ককে আক্রমণ করতে পারে। এতেও দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

এসব রোগে শরীরের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তবে চিকিৎসা করলে ক্ষতিটা সামনে এগোয় না।

৪.৯.১. মস্তিষ্কে কীভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়?

মাথার কোষগুলোকে যা সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেয় তাতে রয়েছে সিডি-৪ সারফেস। এইচআইভি সংক্রমণের পর তাই এসব এলাকা আক্রান্ত হয়। এভাবে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হবার ফলে সংক্রমিত কোষগুলো এমন কিছু কেমিক্যাল তৈরি করে যা মগজের কোষের কাজগুলো ব্যহত করে। এর ফলে রোগীর চিন্তা শক্তি দুর্বল এবং ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিছু স্মৃতিও হারিয়ে যায়। গুরুতরভাবে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীরাই এ ধরনের জটিলতায় ভোগে। এই জটিলতার নাম এইডস ডিমেনশিয়া কমপ্লেক্স (Dementia complex)।

এইচআইভি সংক্রমণের কারণে যে সমস্ত সুযোগ সন্ধানী ইনফেকশনগুলো ঘটে, সেগুলো মাঝে মাঝে মস্তিষ্কেও জটিলতা তৈরি করে। এর মধ্যে টক্সোপ্লাজমোসিস এবং লিম্ফোমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগকৃত ওষুধও অনেক সময় স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে, সেই সাথে নষ্ট করে একাগ্রতা ও

মনোযোগ। অনেকসময় ওষুধের কারণে উত্তেজনা, উদ্বেগ ও মানসিক অবসাদ তৈরি হয়।

৪.১০.১. যেসব রোগ হলে এইচআইভি-এর কথা ভাবতে হবে

নিম্নলিখিত রোগগুলো হলে এইডস সংক্রমণকে সন্দেহ করতে হবে–

- একাধিকবার নিউমোনিয়া
- নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া (Pneumocystitis carinii pneumonia বা PCP)
- টিউবারকুলোসিস (Tuberculosis) ফুসফুসে এবং ফুসফুসের বাইরে।
- বারংবার ক্যান্ডিডা ইসোফ্যাজাইটিস (Candida oesophagitis)
- এনকেফ্যালোপ্যাথি (Encephalopathy)
- এবাধিকবার হারপেস জোস্টার, এক মাসের বেশি সময় ধরে হারপেস সিমপ্লেক্সজনিত ঘা।
- দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া
- ক্রিপ্টোকক্কোসিস (Cryptococcosis), যখন ফুসফুসের বাইরে ধরা পড়ে।
- টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis), যখন মস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়।
- সাইটোমেগালো ভাইরাসের সংক্রমণ: যকৃৎ, প্লীহা এবং লসিকাগ্রন্থির বাইরে।
- ক্যাফোসিস সারকোমা (Kaposi’s Sarcoma (Ks)
- ওয়েস্টিং সিনড্রম বা ওজন হ্রাস (Wasting syndrome)

তুলনামূলকভাবে হেটেরোসেক্সুয়াল নারী ও পুরুষদের মধ্যে ওজন হ্রাস প্রায় সমান সমান ঘটলেও (যথাক্রমে ২০ ভাগ ও ১৯ ভাগ) সমকামীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ওজন হ্রাস ঘটে (১৫ ভাগ)। সবচেয়ে বেশি ঘটে

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া বা পিসিপি আক্রান্ত দের মধ্যে (সূত্র- যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসি, ১৯৯০)। ৫৩ ভাগ এইচআইভি পজিটিভ নারীদের মধ্যে পিসিপি'র সংক্রমণ ঘটে থাকে। হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষদের মধ্যে এই হার ৫০ ভাগ এবং সমকামী পুরুষদের মধ্যে ৫৭ ভাগ। একারণে যেকোন ক্লিনিক বা হাসপাতালে রোগীর দেহে নিউমোসিসটিস শনাক্ত হবার পর পরই এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন।

১৯৯৩ সনে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সিডিসি তেরো বছরের বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে এইডসের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য ল্যাব ভিত্তিক প্রমাণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক রোগের প্রকাশকে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রমের লক্ষণ বলে নির্ণয় করছে। রোগগুলো হল–

- ক্যান্ডিডিয়াসিস (Candidiasis); শ্বাসনালী, ফুসফুস অথবা খাদ্যনালীতে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই এর সংক্রমণ হোক না কেন, মাইক্রোসকপি ও সাইটোলজি করে এ রোগটিকে শনাক্ত করতে হবে। সরাসরি এন্ডোসকপি অথবা ব্রঙ্কোসকপির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে এটির পরীক্ষা করতে হবে।

- নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া (PCP)

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স বা এম কানসাসি (Mycobacterium avium complex or M. kansasii) যখন ফুসফুসের বাইরে ধরা পড়ে বা ছড়িয়ে পড়ে।

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) যখন ফুসফুস বা ফুসফুসের বাইরে হয়।

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম (Mycobacterium); অন্যান্য ধরনের বা শনাক্ত করা যায় না এমন ধরনের যখন ফুসফুসের বাইরে ধরা পড়ে।

ক্রিপ্টোকক্কোসিস (Extra pulmonary); যখন ফুসফুসের বাইরে ছড়ায়।

ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস (Cryptosporidiosis) যখন অন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং রোগ মাসাধিকাল ধরে থাকে।

সাইটোমেগালোভাইরাস (সিএমভি) যখন যকৃৎ ও প্লিহার বাইরে রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis); যখন মস্তিস্কে ছড়ায়।

আইসোসপোরিয়াসিস (Isosporiasis); দীর্ঘস্থায়ী আন্ত্রিক, এক মাসের বেশি সময় ধরে স্থায়ী।

হিস্টোপ্লাজমোসিস (Histoplasmosis); ফুসফুসের বাইরে যখন ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যাফোসিস সারকোমা (Kaposi's Sarcoma)

কক্কিডিয়ইডোমাইকোসিস (Coccidioidomycosis), যখন ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে ফুসফুসের বাইরে।

হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস- এর ঘা যখন এক মাসের বেশি স্থায়ী হয়।

লিম্ফোমা (Lymphoma) যখন মগজ বা ব্রেইন প্রাথমিকভাবে আক্রমণ করে।

প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনকেফ্যালোপ্যাথি (Progressive multifocal leukoencephalopathy)

সার্ভিক্যাল ক্যান্সার (Invasive)

সালমোনেলা সেপটিসেমিয়া

ওয়েস্টিং সিনড্রম (Wasting syndrome)

এগুলো নির্ণয়ে মাইক্রোসকপি, হিসটোলজি, সাইটোলজি ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে। এগুলো কালচার করে অথবা সরাসরি এর স্পেসিমেন থেকে এন্টিজেন নির্ণয় করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যেসব রোগ দেখা দেয়

৫.১.১. এইডসে আক্রান্ত হলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে সমস্ত রোগ হয়

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া বা পিসিপি, ক্রিপ্টোকক্কোসিস (Cryptoccosis), টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis), সাইটোমেগালোভাইরাস (সিএমভি) সংক্রমণ এবং ক্যান্ডিডিয়াসিস (Candidiasis)-সহ বিভিন্ন ছত্রাকের সংক্রমণ। এরমধ্যে উল্লেখ করার মতো রয়েছে মাইক্রোস্পোরিডিয়া (Microsporidia) এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম (Cryptosporidiam)-এর সংক্রমণ।

এইচআইভি সংক্রমণের সাথে সাথে হারপেস গ্রুপ অব ভাইরাস এবং অ্যাপথাস আলসারেরও সংক্রমণ ঘটে থাকে। যক্ষ্মা, হোপাটাইটিস-বি ও সি'র সংক্রমণও হয় ব্যাপকভাবে।

৫.২.১. এইডস রোগে আক্রান্তরা সাধারণত নিম্নলিখিত অণুজীব ও পরজীবী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়–

ছত্রাক জাতীয় :

ক্যান্ডিডিয়াসিস (Candidiasis)

ক্রিপ্টোকক্কোসিস (Cryptococcosis)

অ্যাসপারজিলোসিস (Aspergillosis)

হিসটোপ্লাজমোসিস (Histoplasmosis)

কক্কিডিয়ইডোমাইকোসিস (Coccidioidomycosis)

প্রোটোজোয়া জাতীয় :

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি

ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস (Cryptosporidiosis)

টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis)

আইসোসপোরিয়সিস (Isosporiasis)

ভাইরাস জাতীয় :

হারপেস সিমপ্লেক্স

ভেরিসেলা-জোস্টার (Vericella Zoster)

সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytomegalovirus)

ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় :

স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া (Streptococcus pneumoniae)

হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা (Haemophilus influenzae)

নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস (Neisseria meningitidis)

মোরাক্সেলা ক্যাটারেলিস (Moraxella catarrhalis)

(এই চারটি একজাতীয় এনক্যাপসুলেটেড ব্যাক্টেরিয়া।)

এছাড়াও রয়েছে–

সালমোনেলা (Salmonella)

রোচালিমিয়া (Rochalimaea)

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম (Mycobacterium) ইনফেকশন :

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস

এনক্যাপসুলেটেড ব্যাক্টেরিয়া :

এই জীবাণুগুলো যে ধরনের রোগ ঘটায় তা হল–

নিউমোনিয়া

মেনিনজাইটিস

পেরিকারডাইটিস (Pericarditis)

মেডিয়াস্টিনাইটিস (Mediastinitis)

সেপটিক আর্থারাইটিস

সাইনোসাইটিস (Sinusitis)

অটাইটিস মিডিয়া (Otitis Media)

প্রাইমারি ব্যাক্টেরেমিয়া

স্পাইরোকিট জাতীয় (Spirochetal Infections) :

সিফিলিস

৫.৩.১. প্রোটোজোয়া জাতীয় ইনফেকশনঃ নিউমোসিসটিস ক্যারিনি

এইডস আক্রান্তদের ফুসফুসে নানা ধরনের অণুজীব নিউমোনিয়া নামক রোগ তৈরি করে। এদের মধ্যে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া এবং হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্বোচ্চ সংখ্যক কমিউনিটি বেজড্ নিউমোনিয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই ধরনের নিউমোনিয়াগুলো রোগের যেকোন অবস্থায় হয়ে থাকে।

কোন কোন দেশে বয়স্কদের মধ্যে যে কারও ঘন ঘন নিউমোনিয়া ঘটলে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া হয়। তবে এইডস আক্রান্তদের মধ্যে যে নিউমোনিয়া বেশি ঘটে তার কারণ নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নামক একধরনের প্রোটোজোয়া।

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি সম্পর্কে কিছু কথা :

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নামক এই প্রোটোজোয়াকে প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৯০৯ সনে। চাগাস নামে এক বিজ্ঞানী ব্রাজিলের সাওপাওলোতে একে প্রথম শনাক্ত করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এটি ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত ট্রিপানোসোম (Trypanosome) জাতীয় পরজীবীর একটি অংশ। পরে দেখা গেল, ট্রিপানোসোম দ্বারা আক্রান্ত নয় এমন ইঁদুর, গিনিপিগেও এটা পাওয়া যাচ্ছে। (উল্লেখ্য, ট্রিপানোসোম জাতীয় পরজীবীতে আক্রান্ত হয়ে রোগীরা শুধু ঘুমায়)। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এটা আবিষ্কৃত হয় পৃথিবীর সর্বত্র– ইঁদুর, বেড়াল, বানর, কুকুর, ছাগল, ভেড়া, শেয়াল, মানুষ সবার মধ্যে। অধিকাংশ মানুষের শরীরের মধ্যে বিদ্যমান নিউমোসিসটিস ক্যারিনির ল্যাবভিত্তিক উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রায় সবাই জীবনের কোন না কোন সময়ে এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে রোগটি চড়াও হয় ইমিউন ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটলে।

সাধারণত সুস্থ লোককে এটি যখন আক্রমণ করে তখন রোগের তেমন কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়না– এই প্রোটোজোয়ার আক্রমণের ধার এবং ক্ষমতা কম থাকার কারণে। এ কারণেই ২–৪ বছর বয়সসীমার প্রায় ৬৫ থেকে ১০০ ভাগ শিশু পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত প্রমাণিত হলেও সাধারণভাবে সুস্থ শিশুরা রোগাক্রান্ত হয়না। কেবল প্রি-ম্যাচিউরড্ (Prematured) এবং অত্যন্ত রোগাক্রান্ত শিশুদের মধ্যেই এ রোগের লক্ষণ কিছুটা দেখা দেয়।

শিশুদের মধ্যে যারা জন্মগতভাবেই ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম অথবা টি-কোষের দুর্বলতা নিয়ে জন্মায় তাদের মধ্যেই এ রোগের লক্ষণ সহজে প্রকাশ হয়ে থাকে।

এছাড়া লিউকোমিয়া, হজকিন ডিজিজসহ বিভিন্ন লিম্ফোমা এবং ক্যান্সার জাতীয় অসুখ নিউমোসিসটিস ক্যারিনি ঘটিয়ে থাকে। অনেক সময় বুড়োদের মধ্যেও নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া রোগটি কোন কারণ ছাড়াই ঘটে থাকে।

অবশ্য সম্প্রতি নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়ার আরএনএ বিশ্লেষণ করে এটাকে ছত্রাক গোত্রভুক্ত করা হয়েছে। এটাকে সিস্ট আকারে অথবা সিস্টবহির্ভূত স্পোরোজয়েড আকারে পাওয়া যেতে পারে। সিস্টগুলো হয় গোল অথবা ডিম্বাকৃতি, পাঁচ থেকে আট মাইক্রন ডায়াযুক্ত। একেকটা সিস্টের মধ্যে চার থেকে আটটা স্পোরোজয়েড থাকতে পারে। এগুলো জিমসা (Giemsa), গ্রাম (Gram) ও রাইট স্টেইন (Wright Stain) বা বিশেষ ধরনের রঞ্জক দ্বারা শনাক্ত করা যেতে পারে।

এ জাতীয় নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়াতে প্রাথমিক অবস্থাতে রোগের কোন লক্ষণ থাকেনা। ফুসফুসের এলভিয়োলাই (alveoli)-এর মধ্যে এরা বাসা বেঁধে থাকা অবস্থাতেও সাধারণভাবে কোন প্রদাহের সৃষ্টি হয় না। তবে যখন এর বৃদ্ধি একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে তখন রোগীর জ্বর, কাঁপুনি, ঘাম, কাশি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় এবং চলাফেরায় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সাধারণত কাশিগুলো বেশ পাতলা ও তরল হয়ে থাকে। কাশির মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট হয়। এইচআইভি আক্রান্ত নয় এমন রোগীদের মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই শ্বাসকষ্টই।

এইচআইভি এপিডেমিক শুরু হবার আগে ১৯৪ জন পিসিপি আক্রান্ত রোগীর ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, তাদের ৯১ ভাগেরই ছিল শ্বাসকষ্ট এবং ৪৬ থেকে ৪৮ ভাগের ছিল জ্বর ও কাশি।

আর এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে পিসিপি যা যা ঘটায় তা ক্রমান্বয়ে হল–

ক্লান্তি, দুর্বলতা, জ্বর, শীতবোধ, ঘেমে যাওয়া এবং পরিশেষে শ্বাসকষ্ট। হাঁটাচলা করলেই শ্বাসকষ্ট বেড়ে ওঠে। ফুসফুসের বাইরেও পিসিপি সমস্যা তৈরি করতে পারে। এটাকে বলে এক্সট্রা-পালমোনারি সংক্রমণ (Extra Pulmonary Infection)। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে এ ধরনের সংক্রমণ ঘটে ত্বক, চোখ, কান, থাইরয়েড, পিটুইটারিসহ বিভিন্ন গ্ল্যান্ডে। এর সংক্রমণ হতে পারে হৃদপিন্ড, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক, খাদ্যনালী, ফুসফুসের আবরণ, মুখের টাকরা, মজ্জা ও লিম্ফনোডেও।

পিসিপি'তে রক্ত পরীক্ষায় সাধারণভাবে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ধরা পড়ে না। তবে আক্রান্তের মধ্যে

এলডিএইচ (LDH) নামক এক রকম এনজাইমের মাত্রা বাড়ে এবং চিকিৎসার এক সপ্তাহ পরে এটা নেমে আসতে থাকে। রক্তের এলাইজা'সহ বিভিন্ন পরীক্ষাতেও এটা শনাক্ত করা যায়। এছাড়া বুকের এক্সরেতেও পরিবর্তন ধরা পড়ে।

ট্রাইমেথোপ্রিম সালফামেথোক্সাজল (Trimethoprim Sulfamethoxazole বা TMP-SMX) নামক সহজপ্রাপ্য ওষুধ পিসিপি'র চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আক্রান্তদের মধ্যে প্রতিদিন প্রতি কেজি ওজনে ২০ মিলিগ্রাম টিএমপি এবং ১০০ মিলিগ্রাম এসএমএক্স মুখে বা শিরায় দেয়া হয়। এভাবে চিকিৎসা চলে ১৪ থেকে ২১ দিন।

পিসিপি আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আরেকটি ওষুধ পেন্টামিডিন (Pentamidine) যাদের মধ্যে টিএমপি-এসএমএক্স কাজ করছে না তাদের ক্ষেত্রে পেন্টামিডিন দেয়া হয়। পূর্বে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে প্রতিদিন প্রতি কেজিতে চার মিলিগ্রাম পেন্টামিডিন শিরায় দেয়া হত। এখন দেখা যাচ্ছে, এটা নামিয়ে প্রতি কেজিতে তিন মিলিগ্রাম দিলেও ভাল কাজ হয়। এই চিকিৎসা চলে ১৪ থেকে ২১ দিন।

এছাড়া অন্যান্য যেসমস্ত ওষুধ পিসিপি আক্রান্তদের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে ড্যাপসোন (Dapsone) উল্লেখযোগ্য। এটি কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য নতুন ওষুধের মধ্যে রয়েছে ক্লিনডামাইসিন (Clindamycin) এবং প্রাইমাকুইন (Primaquine)। প্রাইমাকুইন দেয়া হয় মুখে, ৩০ মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন একবার এবং ক্লিনডামাইসিন দেয়া হয় ৬০০ মিলিগ্রাম প্রতি ছ'ঘন্টা অন্তর। ক্লিনডামাইসিন শিরাতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৯০০ মিলিগ্রাম করে ৮ ঘন্টা অন্তর শিরায় প্রয়োগ করতে হয়। শুরুতে শিরায় ক্লিণ্ডামাইসিনের সাথে মুখে প্রাইমাকুইন দেয়া হয়। অবস্থার উন্নতির পর দুটো ওষুধই মুখে দেয়া যায়। সব মিলিয়ে চিকিৎসা ২১ দিন চালাতে হয়।

পাইরিট্রেক্সিম (Piritrexim) নামক একটি নতুন ওষুধ বেরিয়েছে যা কি না পিসিপি এবং টক্সোপ্লাজমা গোনাডি (Toxoplasma gondii) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। এটার সুবিধা হল এই যে, এটি খাবার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর কার্যকারিতা টিএমপি থেকে এক হাজার গুণ বেশি। টিএমপি'র মত আরেকটি ওষুধ ট্রাইমেট্রেক্সেট (Trimetrexate)। এ দুটো ওষুধই ডাই-হাইড্রোফলেট রিডাক্টেস ইনহিবিটর। ওষুধ দুটো প্রয়োগ করা হয় লিউকোভোরিন (Leucovorin) নামক অন্য একটি ওষুধের সঙ্গে।

৫.৪.১. ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় সংক্রমণ

এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়ার সংক্রমণের লক্ষণগুলো সাধারণ নিউমোনিয়ার মতই– হঠাৎ জ্বর, কাশি, ঘন ঘন শ্বাস, বুকে ব্যথা, কখনও কাশির সাথে রক্ত, ফুসফুসে চাকা হবার জন্য লক্ষণীয় পরিবর্তন।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে শ্বেতকণিকা ১৫ হাজারের বেশি পাওয়া যায় না। এলডিএইচ (LDH) নামক একটি এনজাইম বৃদ্ধি পায় পিসিপি এবং হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাতে। বুকের এক্সরেতে দৃশ্যমান পরিবর্তন ধরা পড়ে– ফুসফুসে বিভিন্ন দাগ, চাকা বাধা ইত্যাদি শনাক্তকরণের মাধ্যমে। ফুসফুসে ফুটো বা পানি জমা খুব কমই ঘটে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে। তবে এইচআইভি সেরোনেগেটিভদের মধ্যে এনক্যাপসুলেটেড ব্যাক্টেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ার (নিমোকক্কাস নিউমোনিয়া) কারণে ১৫ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ফুসফুসে পানি জমতে পারে।

মাইক্রোস্কোপের নিচে কাশি পরীক্ষা করে নিউমোনিয়ার ধরন নির্ণয় করা যায়। গ্রাম স্টেইনের মত সাধারণ রঞ্জক ব্যবহার করে নিমোকক্কাস নিউমোনিয়া শনাক্ত করা যেতে পারে। নিমোকক্কাস নিউমোনিয়া হলে শিরায় পেনিসিলিন অথবা ইরিথ্রোমাইসিন দেয়া হয়। হেমোফাইলিয়াক্স সংক্রমণে দ্বিতীয় প্রজন্মের সেফালোসপোরিন (Cephalosporin), যেমন সেফুরক্সিম (Cefuroxime) দেয়া হয়। বিটাল্যাকটামেস (Betalactamase) নেগেটিভ ইনফ্লুয়েঞ্জাতে এমপিসিলিন অথবা এ্যামোক্সোসিলিন দেয়া হয়। রোগ শনাক্ত করতে অসুবিধা হলে ট্রাইমেথোপ্রিম সালফামেথোক্সাজল (টিএমপি-এসএমএক্স) দেয়া হয়। তবে যেহেতু এটা এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটায়, তাই এটি পরিহার করাই ভাল।

৫.৫.১. রোচালেমিয়া

রোচালেমিয়া (Rochalimaea) একধরনের ক্ষুদ্রাকার গ্রাম নেগেটিভ জীবাণু। এটা রক্তের শিরায় ব্যাসিলারি এ্যানজিয়োম্যাটোসিস (Bacillary angiomatosis) নামক একধরনের রোগ তৈরি করে থাকে। এই ব্যাসিলারি এ্যানজিয়োম্যাটোসিস ঘটতে পারে ত্বক থেকে শুরু করে শরীরের অভ্যন্তরে সর্বত্র। এটা আক্রান্ত করতে পারে স্নায়ু, হাড়, হাড়ের মজ্জা, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, প্লীহা, হৃদপিণ্ড এবং লিম্ফনোডকে।

৫.৬.১. সালমোনেলা (Salmonella)

সালমোনেলা জীবাণুটি টাইফয়েড রোগের কারণ। তবে টাইফয়েডের লক্ষণ না ঘটিয়েও সালমোনেলা জীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে এইডস আক্রান্তদের মধ্যে। বার বার এই ধরনের সালমোনেলা আক্রান্ত হবার বিষয়টিকে সিডিসি এইডস রোগের একটি লক্ষণ হিসাবে শনাক্ত করেছে।

এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যেসব রোগের সংক্রমণ দেখা যায় তার মধ্যে সালমোনেলার স্থান একভাগেরও নিচে। তবু পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে সালমোনেলার আক্রমণের হার একশ' গুণ বেশি। তাই ঘন ঘন সালমোনেলা ব্যাক্টেরিয়াম ইনফেকশনকে এইচআইভি ক্লাস-৩ বলে শনাক্ত করছে সিডিসি।

এতে সালমোনেলা গ্রুপের যে সমস্ত জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–সালমোনেলা টাইফিমিউরিয়াম (S. Typhimurium), সালমোনেলা এন্টারাইটিডিস (S. Enteritidis), সালমোনেলা অ্যারিজোনিয়া (S. Arizonea), সালমোনেলা ডাবলিন (S. Dublin)। এদের মধ্যে সাধারণভাবে সালমোনেলা টাইফিমিউরিয়াম শুধু মানুষকেই আক্রান্ত করে থাকে বা মানুষের শরীরেই বিদ্যমান থাকে। আর নন-টাইফিমিউরিয়াম সালমোনেলাগুলো থাকে জীবজন্তুতে। জীবজন্তু থেকে খাবারের মাধ্যমে এগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে– বিশেষ করে কাঁচা ডিম, সেদ্ধ করা হয়নি এমন মাংস, অন্যান্য খাবার দাবার এবং পাস্তুরাইজেশন করা হয়নি এমন দুধ থেকে। খাবার ছাড়াও মারিজুয়ানার মাধ্যমে টাইফয়েডের সংক্রমণ ঘটতে পারে। সালমোনেলা টাইফিমিউরিয়াম সমকামীদের মধ্যে যৌনবাহিতও হতে পারে।

সাধারণত এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে নন-টাইফিমিউরিয়াম সালমোনেলার লক্ষণ দৃশ্যমান হয় বমি ও পাতলা পায়খানা ঘটবার মধ্য দিয়ে। এগুলো একধরনের গ্যাসট্রো এন্টারাইটিস তৈরি করে। ৫ ভাগ ক্ষেত্রে এসব জীবাণু অন্ত্র থেকে রক্তে চলে যেতে পারে। রক্তে সালমোনেলা প্রবাহিত হয়ে যেকোন জায়গায় ফোঁড়া তৈরি করতে পারে বা পুঁজ জমিয়ে ফেলতে পারে। এভাবে পুঁজ জমতে পারে হৃদপিণ্ডে, ফুসফুসে, প্রস্রাবের থলিতে, অন্ত্রে, হাড়ে এবং মোটা শিরায়।

এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যারা এ ধরনের সংক্রমণের শিকার হয় তাদের মধ্যে কোন কোন অঙ্গের পচন বা সেপসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরমধ্যে প্রধান লক্ষণ হল জ্বর, সাথে ঘাম, কাঁপুনি, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধামন্দা।

রক্তের কালচার করে নন-টাইফিমিউরিয়াম সালমোনেলা রোগ নির্ণয় করতে হয়। এছাড়া মলের কালচার করাও প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ে রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা তেমন সহায়ক নয়। চিকিৎসার জন্য বেছে নেয়া হয় তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোসপেরিন, টিএমপি, এসএমএক্স, এমপিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি। ১৪ দিন চিকিৎসা চালাতে হয়। প্রথম দিকে ওষুধটি শিরায় দেয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যতদিন রোগের প্রধান লক্ষণগুলো বিদ্যমান থাকে।

সেফট্রায়াক্সন (Ceftriaxone) এক থেকে দুই গ্রাম শিরায় প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হয় ১৪ দিন, অথবা টিএমপি-এসএমএক্স পাঁচ থেকে পনেরো মিলিগ্রাম প্রতি কেজিতে, প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর শিরায় অথবা এমপিসিলিন ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর শিরায় অথবা ক্লোরামফেনিকল প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর শিরায় দিতে হয়। অনেক সময় এইডস আক্রান্তদের মধ্যে ক্লোরামফেনিকলের সাথে ৩০০ মিলিগ্রাম রিফামপিসিন দেয়া হয় মুখে।

৫.৭.১. মাইকোব্যাক্টেরিয়াম ইনফেকশন

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স (MAC) সাধারণভাবে পরিবেশে বিদ্যমান থাকে। এগুলো নানা ধরনের হয়ে থাকে এবং সুস্থ দেহে কোন রোগ ঘটায় না। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে এটি বড় ধরনের রোগ হিসাবে দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যাদের সিডি-৪ কোষের সংখ্যা প্রতি সিসিতে পঞ্চাশের নিচে।

এইচআইভি আক্রান্তের রোগ গুরুতর পর্যায়ে না পৌঁছালেও এমএসি আগ্রাসন ঘটিয়ে আস্তানা গাড়তে পারে ফুসফুসে ও অন্ত্রে, অনেকটা নীরবেই। এ পর্যায়ে গুরুতর অসুবিধা দেখা না দিলেও এটা একটা বিপর্যয়ের সংকেত বহন করে। রক্ত কালচার করে এমএসি সহজেই শনাক্ত করা যায়।

এমএসি আক্রান্তদের চিকিৎসায় এ্যাজিথ্রোমাইসিন ও ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন (Clarithromycin) প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয় এর একটিকে ইথামবুটল (Ethambutol) ও রিফামপিসিন (Rifampicin) কিংবা সিপ্রোফ্লক্সাসিনের সাথে প্রয়োগ করলে। সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৭৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার করে দেয়া যেতে পারে এমএসি আক্রান্তদের নিরাময়ের জন্য। অবশ্য তা দিতে হবে এ্যাজিথ্রোমাইসিন ও ইথামবুটলের সাথে। এমএসি সংক্রমণ নিরাময়ে এ্যাজিথ্রোমাইসিন প্রয়োগ করতে হবে ৫০০ মিলিগ্রাম মুখে দিনে একবার অথবা ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম মুখে দিনে দু'বার করে।

ইথামবুটল ও রিফামপিসিন (Rifampicin) যখন এ্যাজিথ্রোমাইসিনের সাথে প্রয়োগ করা হবে তখন তার মাত্রা হবে–ইথামবুটল দৈনিক প্রতি কেজিতে ১৫ মিলিগ্রাম, রিফামপিসিন ১০ থেকে ২০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজিতে।

৫.৮.১. ছত্রাক জাতীয় সংক্রমণ

অ্যাসপারজিলোসিসঃ

অ্যাসপারজিলাস এমন এক ধরনের ছত্রাক যা কি না পচনশীল ভেষজ বস্তু ও মাটিতে বিদ্যমান থাকে। এই ছত্রাকের স্পোরগুলো নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। প্রায় তিনশ' প্রজাতির অ্যাসপারজিলাস রয়েছে। এরমধ্যে

অল্প কয়েকটি মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায়। মানুষের জন্য যা বিপজ্জনক তা হল অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস (Fumigatus)। আর দু'ধরনের অ্যাসপারজিলাস মানুষের রোগ ঘটায়– এদের একটি হল অ্যাসপারজিলাস নাইজার (A. Niger), অন্যটা অ্যাসপারজিলাস ফ্ল্যাভাস (A. Flavus)।

সাধারণত অ্যাসপারজিলাস দুর্বল শরীরে অর্থাৎ শরীরের রোগ প্রতিরোধ কমে গেলেই আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগের পর, দীর্ঘ রোগে বিপর্যস্ত শারীরিক অবস্থায় অথবা ক্যান্সার আক্রান্ত অবস্থায়। এটা কোন অঙ্গ সংযোজনের পর অথবা লিউকোমিয়া ও লিম্ফোমা নামক রোগ ঘটবার পরেও হতে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত হবার পর টি-কোষের কার্যকারিতা কমে গেলে এটা শরীরে চড়াও হয়। এই ক্ষুদ্রাকায় বাতাসবাহিত অ্যাসপারজিলাস স্পোরগুলো প্রথমে ফুসফুসের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তারপর এলভিয়োলাই-এ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বৃদ্ধি পেয়ে এটি রক্তের শিরাকে আক্রমণ করে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত ঘটায়।

কখনও কখনও অ্যাসপারজিলাস একটি বলের মতন আকার নিয়ে অবস্থান নেয় ফুসফুসে। বিশেষ করে যক্ষ্মাজনিত ক্ষত বা ফুটোয় আস্তানা গাড়ে। ইমিউনিটি নিম্ন মাত্রায় পৌঁছে গেলে এটি রক্তবাহিত হয়ে শরীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থার নাম ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিস (Invasive aspergillosis)। এ অবস্থায় উচ্চমাত্রায় জ্বর হতে পারে এবং ফুসফুসে চাকা (Consolidation) হতে পারে। অ্যাসপারজিলোসিস ছড়িয়ে পড়তে পারে হৃদপিণ্ডে, খাদ্যনালীতে, হাড়ে, মাথার মগজে, ত্বকসহ নানা স্থানে। এতে যেসব রোগ ঘটতে পারে তা হল ইসোফ্যাজাইটিস, এন্ডোকারডাইটিস, মেনিনজাইটিস, সাইনোসাইটিস, অস্টিওমাইলাইটিস, ব্রেন অ্যাবসেস এবং ত্বকে ঘা। তবে এটা ফুসফুসের বাইরে রক্তবাহিত হয়ে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে মস্তিষ্ককে। ফুসফুসে অ্যাসপারজিলাস সংক্রমণ ঘটলে যেসমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় তা হল– জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, কদাচিৎ কাশির সাথে রক্তপাত।

যাদের রোগের লক্ষণ আছে তাদের কাশি অথবা নাকের শ্লেষ্মা কালচার করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। এক্সরেসহ অন্যান্য পরীক্ষাতেও রোগ শনাক্ত করা সম্ভব।

এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় এম্ফোটেরিসিন-বি। এটা প্রতিদিন প্রতি কেজিতে ০.৫ থেকে ০.৮ মিলিগ্রাম করে প্রয়োগ করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এম্ফোটেরিসিন-বি এর সাথে রিফামপিসিন

(Rifampicin) দেয়া হয়। এটি এম্ফোটেরিসিনের কাজকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে নিজেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এটা প্রতিদিন ৬০০ মিলি গ্রাম করে মুখে দিতে হয়। আরেকটি বিকল্প রয়েছে-ইট্রাকোনাজল (Itraconazole) নামক ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ। এটি দৈনিক ১০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম করে প্রয়োগ করলে ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে নিরাময় দেয়। তবে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ইট্রাকোনাজলের কার্যকারিতা কম থাকে।

৫.৯.১. স্নায়ু সংক্রান্ত জটিলতা

তাঞ্জানিয়ায় এক গবেষণায় দেখা গেছে সেখানকার এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ১০.৫ ভাগ স্নায়ু সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগেছে। এর মধ্যে প্রধান যে অসুবিধাগুলো ঘটেছে তা হল– পক্ষাঘাত, শরীরের অংশ বিশেষ অবশ হয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন স্নায়ুর বিপর্যয়। সবচেয়ে বেশি যা ঘটে তা হল–

এইচআইভি ডিমেনশিয়া
রেটিনোপ্যাথি
এ্যারিফ্লেক্সিয়া (Areflexia)
পিরামিডাল ট্র্যাক সাইন
ট্রেমার (Tremor)
ইন-কোঅর্ডিনেশন ইত্যাদি।

ঐ গবেষণায় দেখা যায় যে, ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স জনিত কারণে মেনিনজাইটিস হয়েছে ছয় থেকে বারো ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে। টক্সোপ্লাজমোসিস টাইটার পজিটিভ হয়েছে ১১ ভাগ ক্ষেত্রে।

৫.১০.১. হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতা :

হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতা বা পেরিকারডাইটিস দেখা দেয় ২৮ থেকে ৩৯ ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে। ক্যাফোসিস সারকোমা রোগটি মধ্য আফ্রিকাতে এমনিতেই এনডেমিক আকারে ঘটে থাকে। জায়ার, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, উগান্ডা, মালাবি, তাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া ইত্যাদি এলাকায় ক্যাফোসিস সারকোমার উপস্থিতি ছিল বেশ বড় মাত্রায়–এইডস এপিডেমিক ছড়িয়ে পড়বার আগে থেকেই। আশ্চর্য বিষয়, এ এলাকাগুলোতেই বর্তমানে এইচআইভি সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ঘটছে। ক্যাফোসিস সারকোমার ব্যাপক সংক্রমণসহ প্রথম এইডস রোগীটি ধরা পড়ে ১৯৮৪ সনে। জায়ারের ২২ জন এইডস রোগীর মধ্যে তিনজনেরই ছিল ক্যাফোসিস সারকোমা। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এইচআইভি আক্রান্তদের পাঁচ থেকে পনেরো ভাগের ক্ষেত্রে ক্যাফোসিস সারকোমা দেখা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আফ্রিকার এইডস রোগীদের আরেকটি পার্থক্য হল

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্সের তুলনামূলক অনুপস্থিতি।

৫.১১.১. এক নজরে যে রোগ ও লক্ষণসমূহ দেখে এইডসের কথা ভাবতে হবেঃ

- মুখে ছত্রাক সংক্রমণ
- যৌনাঙ্গে ছত্রাকের সংক্রমণ
- এক মাসের অধিক পাতলা পায়খানা
- টিবি, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ার সংক্রমণ
- যৌনরোগ বিশেষ করে সিফিলিস-গনোরিয়ার ইতিহাস রয়েছে, এমন রোগীর দেহে ছত্রাকের সংক্রমণ
- বিশেষ ধরনের চর্মরোগের উপস্থিতি; যেমন– ক্যাফোসিস সারকোমা। এ ধরনের লক্ষণ অবশ্য আমাদের দেশে দেখা যায় না। আফ্রিকান ও অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়।
- সিএমভি

৫.১১.২. সাধারণত কী কী স্ত্রীরোগ ও যৌনরোগ নিয়ে এইচআইভি আক্রান্তরা চিকিৎসকের নিকটে আসে?

- মাসিকের সমস্যা। অসময়ে মাসিক বন্ধ, অনিয়মিত মাসিক অথবা কম মাসিক হওয়া ইত্যাদি। মাসিকের এ সমস্যার কারণ হল রিপ্রোডাক্টিভ হরমোনের ওপর এইচআইভি ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া।
- ছত্রাকের কারণে যোনিপথে প্রদাহ ও সেই সাথে স্রাব।
- এইচএসভি-২ সংক্রমণ বা যোনিপথে হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস সংক্রমণ আরেকটি লক্ষণ। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)-এর গবেষণায় ১৮ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে হারপেস সিমপ্লেক্সের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।
- সিফিলিস। এ সমস্ত রোগীরা যোনিপথে ঘা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ রোগের সাথে এইডসের জটিল সম্পর্ক রয়েছে। এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে এ রোগের তীব্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ (পিআইডি)। এ রোগের লক্ষণ হল জরায়ু, ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, তলপেটসহ যোনিপথে প্রদাহ এবং টিউবো ওভারিয়ান অ্যাবসেস। এতে তলপেটে পুঁজ জমে। সাধারণ পিআইডি এবং এইডসের পিআইডি-এর তফাৎ হল এই যে, এইডস রোগে সাধারণত এই ইনফেকশন বা পুঁজ জমার কারণে শ্বেতকণিকার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে থাকে। যদিও জীবাণু সংক্রমণের ধরণ এবং জীবাণু টাইপ উভয় ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে থাকে।

●হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)। এটি একটি যৌনবাহিত ভাইরাস যা যোনিপথে ও পায়ুপথে ছোট ছোট আঙুরের মত গোটা বা অ্যানোজেনাইটাল কন্ডাইলোমাটা (anogenital condylomata) বা ওয়ার্টস তৈরি করে। অ্যানোজেনাইটাল ওয়ার্টসগুলো অনেকসময় কিছুটা বসে যাওয়া, নরম, ভেজা, গোলাপী থেকে লাল রঙের হতে পারে এবং সাধারণভাবে নারী যৌনাঙ্গের ল্যাবিয়া, সার্ভিক্স ও মলদ্বারের পাশে হয়ে থাকে। অনেক সময় এগুলো সিফিলিসজনিত কন্ডাইলোমাটার মত হতে পারে। সারভাইক্যাল ওয়ার্টসের ক্ষেত্রে Pap smear ব্যতিরেকে চিকিৎসা শুরু করা উচিত নয়।

●সারভাইক্যাল ইনট্রাএপিথেলিয়াল নিয়োপ্লাসিয়া (cervieal interaepithelial neoplasia) বা সিআইএন। এইচআইভি-এর সঙ্গে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) জেনোটাইপ ১৬, ১৮, এবং ৩১-এর সাথে সিআইএন এবং ইনভেসিভ সারভাইকাল ক্যান্সারের সম্পর্ক রয়েছে। এটা এ্যানোজেনাইটাল নিয়োপ্লাসিয়ারও কারণ। সাধারণত: যাদের মধ্যে ইমিউনিটি কমে যায় তাদের হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এইডস আক্রান্তের মধেও সিআইএন-এর হার সুস্থ লোকের তুলনায় প্রায় ৪৯ গুণ বেশি এবং হেপাটাইটিস-বি-এর হার প্রায় ৯ গুণ বেশি। তাই সুস্থ লোকের মধ্যে সিআইএন-এর উপস্থিতির সাথে সাথে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

●ক্যান্ডিডিয়াসিস এমন একটি রোগ যা দেখে এইচআইভি সংক্রমণের কথা মনে রাখতে হবে। সিডিসি-এর হিসাব অনুযায়ী নারীদের মধ্যে ১৯ ভাগ, হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষদের মধ্যে ১৪ ভাগ এবং সমকামী পুরুষদের মধ্যে ১১ ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত রোগী খাদ্যনালীতে ক্যান্ডিডার সংক্রমণ নিয়ে চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয়। সিডিসি কর্তৃক রোড আইল্যান্ডে (road island) পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে ক্যান্ডিডাতে আক্রান্ত হয়েছে ৩৪ ভাগ, অন্যদিকে পিসিপিতে ২০ ভাগ।

●এসব গবেষণার প্রেক্ষাপটে সিডিসি এইডসের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, সেই সমস্ত সেরো পজিটিভকেই এইডস আক্রান্ত বলা যাবে যাদের সারভাইক্যাল ক্যান্সার, ফুসফুসে বারংবার ব্যাক্টেরিয়াজনিত নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা যাবে অথবা যাদের মধ্যে সিডি-৪ কোষের সংখ্যা দুশ'র নিচে হবে।

- ওপরের তথ্যের আলোকে বলা প্রয়োজন, এইডস আক্রান্তের সঙ্গে মেলামেশার সাথে সাথেই কেউ এইডস আক্রান্ত হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এটা কোন ভরসারও কথা নয়। এইচআইভি অনেকদিন দেহের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। আর সেরোপজিটিভ হলেও তৎক্ষণাৎ এইডসের লক্ষণ প্রকাশ পাবে এমনও কথা নেই। লক্ষণ প্রকাশ পেতে প্রায় সতেরো বছর লেগেছে, এমন উদাহরণও রয়েছে।

- এইডসের ওষুধ জিডোভুডিন প্রয়োগকালেও পুরুষ থেকে নারীর মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

- আরও যেসমস্ত যৌনরোগে মেয়েদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ।

৫.১১.৩. ডায়রিয়ার সাথে এইচআইভি সংক্রমণের সম্পর্ক কী?

এইচআইভি সংক্রমণের পরেই যে প্রাথমিক লক্ষণগুলো শরীরে দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হল ডায়রিয়া। প্রায় ৫০ ভাগ আক্রান্তের মধ্যেই এই লক্ষণটি দেখা যায়।

ভাইরাসের প্রাথমিক আক্রমণের পর পরই সাময়িকভাবে ইমিউন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে বেশ কিছু ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী আন্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় এই ডায়রিয়া এতটা মারাত্মক হয় যে, জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রান্তেও এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া হয় এবং মারাত্মক ওজন হ্রাস ঘটে।

প্রাথমিক আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ত্বকে যে লাল লাল দাগ দেখা দেয় সেগুলো বিভিন্ন রকম জীবাণু, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী দ্বারা ঘটতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণ না ঘটলেও এসব অণুজীবের কারণে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় ক্যান্সারেও শরীরে এ ধরনের লাল লাল দাগ তৈরি করে। এইচআইভি সংক্রমণ হলে যে দাগগুলো হয় সেগুলো হয় ছোট ছোট, একটু উঁচু ও লালচে। এগুলো সাধারণত মুখে, বাহুসহ শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে এবং পায়ে হয়ে থাকে।

এইচআইভি শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্ট

৬.১.১. এইডস শনাক্ত করতে যে সমস্ত টেস্ট করতে হয়ঃ

এইচআইভি এন্টিবডি টেস্ট (HIV antibody test)

এইচআইভি এন্টিজেন টেস্ট (HIV antigen test)

ভাইরাস আইসোলেশন (isolation) এবং পরিমাণ নির্ণয়

পিসিআর-এর মাধ্যমে ভাইরাসের পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদি।

ফুসফুস ও ফুসফুসের বাইরে যক্ষ্মাসহ সালমোনেলা (Salmonella) জাতীয় রোগগুলো সংক্রমণ নির্ণয়ের জন্য কালচারই গ্রহণযোগ্য। এইচআইভি এনকেফ্যালোপ্যাথি-এর জন্য ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াও সিএসএফ-এর (CSF)-এর পরীক্ষা এবং ব্রেন স্ক্যান করা অপরিহার্য।

৬.২.১. এইচআইভি স্ক্রিনিং ও অন্যান্য টেস্ট

ল্যাবে যে সব পদ্ধতিতে এইচআইভি শনাক্ত করা হয় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এইচআইভি স্ক্রিনিং-এর কথা। বার বার এইচআইভি স্ক্রিনিং পজিটিভ হলে তাকে এইচআইভি আক্রান্ত বলেই ধরে নিতে হবে, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। কেননা এই টেস্ট অনেক সময় ভুল পজিটিভ (False positive) হতে পারে। এজন্য ইমিউনোফ্লুরেসেন্স এ্যাসে (immunofluorescence assay) বা এইচআইভি ব্লট টেস্ট করিয়ে নিতে হবে।

তবে সরাসরি ভাইরাস শনাক্তকরণ ও আইসোলেশন করাও সম্ভব। স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে এইচআইভি এন্টিবডিটি পরিমাপ করা হয়। যে সব দেশে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ নেই সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ক্লিনিক্যালি এইচআইভি শনাক্ত করা হয়। তবে রক্ত পরীক্ষা ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে কিছুতেই শনাক্ত করা সম্ভব নয় যে একজন এইচআইভি আক্রান্ত কি না। ১৯৮৫ সনে এইচআইভি নির্ণয়ের টেস্টগুলো প্রচলিত হয়।

এইচআইভি স্ক্রিনিং, এলাইজা (Enzyme Linked Immunosorbent Assay বা ELISA) ও ব্লট টেস্টের সাথে রোগ নির্ণয় ও রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আরও যে সমস্ত পরীক্ষা করা হয় তা হল–সিডি-৪ কোষ নির্ণয় ও টি-হেলপার লিম্ফোসাইট কোষ নির্ণয়। এছাড়া পি-২৪ নামক এক ধরনের ভাইরাল এন্টিজেনও পরিমাপ

করা হয়। ভাইরাল এন্টিজেন পরিমাপ করে ভাইরাল লোড নির্ণয় করা সম্ভব।

পরীক্ষা করে যা নির্ণয় করা হয় তা হল– শরীরে এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশ করেছে কি না এবং প্রবেশ করে থাকলে শরীরে তা কতটা রয়েছে। সরাসরি ভাইরাস শনাক্ত করার বিষয়টি বেশ শক্ত এবং ব্যয় বহুল। ইমিউন ব্যবস্থা আক্রান্ত হবার পর শরীরে যে এইচআইভি এন্টিবডি তৈরি হয় তা দেখে রোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

৬.৩.১. ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট (Western Blot Test)

Immunoelectrophoresis অথবা immunoblot পদ্ধতিতে এইচআইভি confirmation test-কে বলা হয় western blot test। ভাইরাসের অন্তগর্ত বিশেষ প্রোটিনের আধিক্যের কারণে ইমিউনোলজিক্যাল পরিবর্তনের বিষয়টি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্নয় করে সুনিশ্চিতভাবে এইডস রোগ নির্ণয় করা যায়। এইডস নির্ণয়ের পরীক্ষাটি অত্যন্ত কার্যকর। এ পদ্ধতিতে এইচআইভি এন্টিজেনের উপস্থিতিতে এন্টিবডি পরিমাপ করা গেলেও এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইডস রোগের শুরুতে ও শেষে ভাইরাসের সকল এন্টিজেন সমমাত্রায় উপস্থিত থাকে না। এ জন্য এইডস রোগীদের অবস্থা জানার জন্য WB পজিটিভ ব্যান্ডস বা রিঅ্যাকটিভ ব্যান্ডসটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

সিডিসি প্রাথমিকভাবে P_{24} অথবা GP_{41} ব্যান্ডের উপস্থিতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ দুটো পরীক্ষাকে এইচআইভি পজিটিভের সমার্থক বলে গণ্য করেছে।

এইচআইভি মুক্ত সেরামের মধ্যে বিদ্যমান গ্যাগ প্রোটিনগুলো বিশেষ করে P_{24}, P_{17}, P_{55} এর উপস্থিতিতে কখনও কখনও Non Specific Reaction হওয়াতে অন্যান্য ব্যান্ডগুলোর উপস্থিতি দেখার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। তবে সাধারণভাবে P_{24} এন্টিবডির উপস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে প্রায় সুনিশ্চিতভাবে এইডসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। এই এন্টিবডিটিই রোগের প্রাথমিক অবস্থাতে ধরা পড়ে।

বার বার এলাইজা নেগেটিভ হওয়া মানে রোগের অনুপস্থিতি। তবে এটি পজিটিভ হলে একশভাগ ক্ষেত্রে রোগের নিশ্চয়তার কথা বলা যায় না। কেননা এইচআইভি এন্টিবডি এলাইজা টেস্টে ধরা পড়ে। এজন্য ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট করতে হয়। ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট এমন এক পরীক্ষা যেখানে এইচআইভি সুনির্দিষ্ট এন্টিজেনকে শনাক্ত করা সম্ভব, যার বিরুদ্ধে এন্টিবডিটি তৈরি হয়েছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাসের তিনটি এন্টিজেনের মধ্যে অন্তত দুটোর

বিরুদ্ধেও এন্টিবডি তৈরি হলে তা ব্লট টেস্টের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব। তবে ভাইরাসের আবরণ কেন্দ্র এবং পলিমারেস এনজাইমের সঙ্গে সংযুক্ত প্রোটিনগুলো মানবদেহে যে তিন ধরনের এন্টিবডি তৈরি করে তাদের দুটো শনাক্ত না হলে ওয়েস্টার্ণ ব্লট টেস্টকে পজিটিভ ধরা হয় না। এসব কারণে এইচআইভি ব্লট টেস্ট এলাইজা টেস্টের চেয়ে অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট।

যেখানে এলাইজা টেস্টের মাধ্যমে শুধু এন্টিবডি শনাক্ত করা হয়, সেখানে ব্লট টেস্টের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এন্টিজেন এবং ভাইরাসের অংশ যার বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয় তা শনাক্ত করা সম্ভব। তুলনামূলকভাবে ওয়েস্টার্ণ ব্লট টেস্ট এলাইজার চেয়ে কিছুটা ঝামেলাযুক্ত ও ব্যয়বহুল পরীক্ষা।

ওদিকে এলাইজা ও স্ক্রিনিং অতি দ্রুত এবং কম খরচে সম্পাদন করা সম্ভব। আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যার মাধ্যমে এইচআইভি'র উপস্থিতি পরিমাপ করা সম্ভব। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাইরাসের প্রোটিন ও এনজাইম নির্ণয়।

রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেস নামক ভাইরাসের এনজাইমটি নির্ণয়ের মাধ্যমে রেট্রোভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। প্রতিটি রেট্রোভাইরাসে এই এনজাইম থাকে। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সেরাম সুস্থ কোষে প্রবেশ করিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি'র উপস্থিতি প্রমাণ করা সম্ভব।

রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য শরীরে প্রবাহমান ভাইরাস নির্ণয় করা সম্ভব, বিশেষ করে রোগের শুরুতে এবং শেষ পর্যায়ে। সরাসরি এইডস ভাইরাস শনাক্তকরণের মাধ্যমে সদ্যজাত শিশুর দেহে এইডসের উপস্থিতি প্রমাণ করা সম্ভব। কেননা এসব ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত তার দেহে এইচআইভি এন্টিবডি বিদ্যমান থাকে। শিশুটি নিরোগ হলেও প্লাসেন্টা মারফত সঞ্চারিত মায়ের এন্টিবডি ধারণ করতে পারে ছয় মাস থেকে দশ বছর পর্যন্ত।

৬.৪.১. পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশনঃ

পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশন (Polymerase Chain Reaction বা PCR) বলে একটি টেস্ট রয়েছে এইচআইভি শনাক্তকরণের জন্য। এই টেস্টের মাধ্যমে ভাইরাসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যামপ্লিফিকেশন করে রোগ শনাক্ত করা হয়। যেহেতু জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের একটি ভগ্নাংশ থেকেও এ পদ্ধতিতে ভাইরাস নির্ণয় সম্ভব, তাই এটি এইচআইভি নির্ণয়ে অতি কার্যকর।

পলিমারেস চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) টেস্ট পদ্ধতিটি '৮০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী নানা রোগ শনাক্তের

জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিএনএ'র জেনেটিক অংশের যে কোন কণার সংকেতকে যন্ত্রের সাহায্যে পরিবর্ধন (amplify) করে বিশেষ ধরনের ভাইরাসকে শনাক্ত করা হয় এই পরীক্ষার সাহায্যে। এভাবে জটিল ব্যাক্টেরিয়াসহ মানব শরীরের বিভিন্ন কোষও শনাক্ত করা হয়।

৬.৫.১. পি-২৪ এন্টিজেন পরীক্ষাটি কী?

HIV_1 P_{24} Core protein বা P_{24} antigen নির্ণয় করা হয় Antigen Capture Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ পি-২৪ এন্টিজেন টেস্টটি অনেকটা এলাইজা টেস্টের মত। তবে এক্ষেত্রে এইচআইভি'র এন্টিবডি টেস্ট না করে এইচআইভি কোরে বিদ্যমান প্রোটিন পি-২৪কে শনাক্ত করা হয়। পি-২৪-এর মত প্রোটিনগুলো এইচআইভি সংক্রমণের অব্যবহিত পর থেকে সবসময় রক্তে বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে রোগীর রক্তের প্লাজমা কিংবা শরীর নিঃসৃত যেকোন রস থেকে পি-২৪ শনাক্ত করা সম্ভব। রোগের সকল স্তরে পি-২৪ নির্ণয় করা সম্ভব। রোগ সংক্রমণের প্রথম সপ্তাহে এবং শেষ দিকে যখন রক্তে প্রবাহমান ভাইরাসের পরিমাণ বেশি থাকে তখন এটি নির্ণয় করা সহজ। স্ক্রিনিং টেস্টগুলো অনেক সময় হোম টেস্ট কীটে ব্যবহৃত হয়। তবে নানা কারণে বাড়িতে এ ধরনের পরীক্ষা না করাই ভাল।

CD_4+T-cell levels :

টি-সেলের সংখ্যা গণনা শুধু রোগ নির্ণয়ের জন্যই নয়, রোগের অবস্থা ও পরিণতি জানবার জন্যও অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসার প্রেক্ষাপটে রোগের উন্নতি বা অবনতি নির্ণয়ের জন্য এর মূল্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ। জিডোভুডিন এবং didanosine জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করলে প্রথম আট সপ্তাহে CD_4-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর পরে সংখ্যাটি আবার নিচে নেমে আসায় প্লাসেবো ট্রিটমেন্টের কার্যকারিতার সাথে নানাবিধ anti-retroviral drug-এর কার্যকারিতা তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ কারণে নানা প্রক্রিয়ায় ভাইরাল লোড পরিমাপ করা হয় রোগীর পেরিফেরাল (Peripheral) রক্ত পরীক্ষা করে।

৬.৬.১. এইডস শনাক্তকরণের সহজ কোন পদ্ধতি আছে কি না:

যেসব স্থানে ল্যাব সুবিধা নেই সেখানে সহজভাবে এইডস শনাক্ত করার জন্য কিছু লক্ষণ ও উপসর্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব লক্ষণ ও উপসর্গভিত্তিক রোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৮৬ সনে। সিডিসি-ও এ বিষয়ে কাজ করেছে। তবে তাদের রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা সম্ভব কেবল ল্যাব সুবিধাপ্রাপ্ত উন্নত দেশগুলোতে। যেখানে

এইচআইভি শনাক্তকরণসহ সিডি-৪ লিম্ফোসাইট, পি-২৪ এন্টিজেন নির্ণয় এবং অন্যান্য উন্নত পরীক্ষা সহজলভ্য সেখানেই এটা কার্যকর হতে পারে।

অনুন্নত বিশ্বের অনেক স্থানে ল্যাব সুবিধা না থাকার কারণে লেখক নিজেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে লক্ষণ ও উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসার ওপর জোর দিচ্ছেন। এ ধরনের পদ্ধতিতে এইচআইভি স্ক্রিনিং-এর পর রোগীর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা, রোগের উন্নতি ও অবনতি সংক্রান্ত প্যারামিটারগুলো পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে চিকিৎসা চালানো সম্ভব। তবে এলাইজা ফর এইচআইভি পরীক্ষাটি সম্পন্ন করে চিকিৎসা পরবর্তী অবস্থায় মূল পরীক্ষাগুলো করিয়ে নিতে পারলে একটি গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব।

কোন কোন গবেষক ম্যানুয়ালি সিডি-৪ কোষের পরিমাপের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে বিকল্প ব্যবস্থা ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ ব্যতিরেকে বিশ্বব্যাপী এইডস মহামারি এড়ানো সম্ভব নয়। যেখানে ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট ও এলাইজা ফর এইচআইভি টেস্ট করা সম্ভব হবে না সেখানে এইচআইভি স্ক্রিনিং-এর সাথে সাথে রোগীর কিছু শারীরিক লক্ষণ মিলিয়ে দেখতে হবে।

এ পদ্ধতিতে এইচআইভি শনাক্ত করার জন্য রোগীর প্রধান তিনটি লক্ষণ হল– শতকরা দশভাগের বেশি ওজন হ্রাস, এক মাসের অধিক ডায়রিয়া, মাসাধিক সময় ধরে জ্বর– সব সময়ের জন্য কিংবা ছেড়ে ছেড়ে।

এছাড়া কিছু অপ্রধান লক্ষণের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে; যেমন–

এক মাসের বেশি কাশি,
মুখে ও গলায় ছত্রাকের সংক্রমণ,
লিম্ফনোডগুলো ফুলে যাওয়া,
বার বার হারপেস জোস্টার হওয়া,
সমস্ত শরীরের চামড়ায় চুলকানিসহ প্রদাহ দেখা দেয়া,
শরীরের নানা স্থানে হারপেস সিমপ্লেক্সের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ ইত্যাদি।

এইডস নির্ণয়ের জন্য শক্ত লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয় শরীরের সর্বত্র ছড়ানো ক্যাফোসিস সারকোমা এবং ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিসের সংক্রমণ। আফ্রিকা মহাদেশের কোন কোন স্থানে কোনরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র লক্ষণগুলো দেখেই এইডস শনাক্ত করা হয়। আফ্রিকার মধ্যে কেবল আইভরিকোস্টেই রক্ত পরীক্ষার ওপর বা এইচআইভি পজিটিভ টেস্টের ওপর জোর দেয়া হয়। জায়ারে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৫৯ থেকে ৭৯ ভাগ সফলতা পাওয়া গেলেও যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে রক্ত পরীক্ষার বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

সাধারণত যক্ষ্মা সংক্রমণ ও রোগের প্রকাশগুলো এইচআইভি সংক্রমণের শুরুতেই প্রকট হয়ে থাকে। তবে আমাদের মত দেশগুলোতে একমাসের বেশি কাশিকে এইচআইভি সংক্রমণের লক্ষণ হিসাবে গণ্য না করে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া ও পাতলা পায়খানা, জ্বর, ওজন হ্রাস, লিম্ফনোডগুলো ফুলে যাওয়া এবং ব্যাপক ছত্রাকের সংক্রমণকে প্রধান লক্ষণ হিসাবে ধরে নেয়া উচিত। এতে করে এইডস শনাক্তকরণ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এই সাথে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে যৌনরোগগুলোর সহ-অবস্থান এবং রোগীর বিপজ্জনক যৌনজীবনের ইতিহাস।

এইডস রোগের লক্ষণগুলো নির্ভর করে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ব্যর্থতা বা ইমিউনোসাপ্রেশনের সাথে সাথে এলাকাভিত্তিক সুবিধাবাদী রোগ ও জীবাণুর প্রাদুর্ভাবের ওপর। যেমন- ইউরোপে এইডস রোগীরা আক্রান্ত হতে পারে টক্সোপ্লাজমোসিস, ক্রিপ্টোকক্কোসিস, খাদ্যনালীর ছত্রাকজনিত সমস্যা, যক্ষ্মা, পিসিপি, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস (Cryptosporidiosis) ইত্যাদি দ্বারা।

উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, জায়ারসহ আফ্রিকার অনেক দেশে এইডসের প্রধান লক্ষণগুলো হল– ভয়ভঙ্করভাবে ওজন হ্রাস, প্রচন্ড দুর্বলতা, জ্বর, ডায়রিয়া, কাশি ইত্যাদি।

একমাসের অধিক ডায়রিয়া ছাড়া অন্যান্য লক্ষণগুলোর প্রকাশ অন্য কোন রোগের কারণেও হাতে পারে। তাই দীর্ঘ সময়ব্যাপী ডায়রিয়া ছাড়া অন্য লক্ষণগুলোকে দুর্বল লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এসবের সাথে মুখে ও গলায় ছত্রাকের সংক্রমণ এবং গায়ে প্রুরাইটিক প্যাপুলার ইরাপশন (Pruritic papular eruption) থাকলে প্রায় ৭৭ ভাগ ক্ষেত্রে এইডস রোগ বলে সন্দেহ করা যায়।

এসব লক্ষণ দেখা দেবার পর দ্রুত এইচআইভি স্ক্রিনিং ছাড়াও যে সমস্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন তা হল–

- HIV antibody confirmatory test
- Full blood count
- Urea and electrolytes
- Liver function tests
- Hepatitis, A, B and C serology
- Syphilis serology
- HIV viral load
- Immune profile
- Toxoplasma and cytomegalovirus serology পরীক্ষা।

রোগের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য মাপতে হবে সিডি-৪ কোষ সংখ্যা, সিডি-৪ : সিডি-৮, পি-২৪ এন্টিজেন এবং

ভাইরাল লোড। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে হার্ট (HAART) থেরাপি দিতে হবে।

থেরাপি দেবার পর পরীক্ষা করতে হবে–

- Full blood count
- Urea and electrolytes
- Liver function tests
- Lipid profile
- Glucose
- HIV viral load
- Immune profile
- Weight

প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং জেনোটাইপিক এ্যাসে (Genotypic assay)-এর মাধ্যমে চিকিৎসার সফলতা মূল্যায়ন করতে হবে।

৬.৬.২. সাধারণ জ্ঞানে এইচআইভি আক্রান্তদের শনাক্ত করা যায় কি?

এইচআইভি'তে আক্রান্ত হবার পর একজন আপাতঃদৃষ্টিতে সুস্থ থাকতে পারে লম্বা সময়। যখন রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তখন তা অন্যান্য অনেক সাধারণ রোগের মতই হয়ে থাকে। তবে এই এইডসের লক্ষণ দেখা দিতে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর কেটে যায়। খুব অল্প সংখ্যক আক্রান্তের মধ্যেই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে লক্ষণ দেখা দেয়। ৫০ ভাগ এইচআইভি আক্রান্তের দশ বছরের মধ্যে এইডসের লক্ষণ দেখা দেয়।

আক্রান্তের দেহের লক্ষণ দেখে একজন দক্ষ চিকিৎসক এইচআইভি টেস্ট করালেই রোগ শনাক্ত করতে পারবেন। তবে সাধারণত এইচআইভি আক্রান্ত হবার দুই থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে শরীরের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটাকে এইচআইভি সংক্রমণের অ্যাকিউট (acute) বা শীর্ষ লক্ষণ বলে। এছাড়া এইডসের সহযোগী অসুখগুলো দেখেও রোগ শনাক্ত করা যায়।

অনেকসময় প্রতিরোধ ক্ষমতার বিভিন্নতার কারণে প্রাথমিকভাবে যে ব্যক্তি ভাইরাস ছড়ায় তার আগেই তার থেকে যে রোগ পায় সে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ক ব্যক্তি থেকে খ ব্যক্তি আক্রান্ত হল। অথচ ক-এর পূর্বে খ-ই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বিশেষ বিশেষ রোগের সহাবস্থান এইডসের বিস্তৃতি দ্রুত ঘটিয়ে থাকে। এইচআইভি অনেক সময় ইমিউন কোষে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে বা লুকিয়ে থাকে। এ সময় বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে যখন টি-হেলপার লিম্ফোসাইট কোষগুলো প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা

করে তখন প্রায় ঘুমন্ত এইচআইভি ভাইরাসগুলো উজ্জীবিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত নিজেদের বৃদ্ধি ঘটায়।

এ ধরনের যে সমস্ত ভাইরাস এইচআইভিকে উজ্জীবিত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

সাইটোমেগালোভাইরাস বা সিএমভি
এপস্টেইন বার ভাইরাস
হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস
ক্যান্ডিডা
মাইক্রোসপোরিডিয়া এবং ক্রিপ্টোসপোরিডিয়াম
হারপেস ভাইরাস ইত্যাদি।

৬.৬.৩. অনুমানভিত্তিক এইডস নির্ণয় : ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন

অনুমানভিত্তিক এইডস নির্ণয়ের জন্য যে রোগগুলো বিবেচনায় আনা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হল খাদ্যনালীতে ছত্রাকের সংক্রমণ। যেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা নেই সেখানে চোখে দেখে এবং লক্ষণ ও উপসর্গগুলো অনুধাবন করে রোগ নির্ণয় করতে হয়।

এ প্রক্রিয়ায় এইডসজনিত কারণে খাদ্যনালীতে ছত্রাকের সংক্রমণ নির্ণয় করতে হলে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হল– ঢোক গিলতে অসুবিধা এবং ঢোক গেলার সময় বুকে ব্যথা। সেই সাথে মুখে সাদা সাদা দাগ, দৃশ্যমান ছত্রাক, লালাভ মিউকোসার উপস্থিতি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ফাংগাল ফিলামেন্ট শনাক্ত করা উচিত।

সাইটোমেগালোভাইরাস রেটিনাইটিস:

চোখের (Opthalmoscopic) পরীক্ষা করে রেটিনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সাদা দাগ চিহ্নিত করার সাথে সাথে কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে এমন কিছু শ্বেত চিহ্ন রক্ত শিরার পাশে দেখতে পেলে তা রোগের লক্ষণ হিসাবে ধরতে হবে। এটা মাসের পর মাস বাড়তে থাকে। এতে রেটিনার শিরাগুলো ফুলে ওঠে প্রদাহের কারণে। রেটিনাতে রক্তপাত এবং ঘা-এর চিহ্ন থাকে। শেষে রেটিনাতে চিরস্থায়ী ছিটছিটে দাগ ও ক্ষত হয় এবং রেটিনা শুকিয়ে আসে (Atrophy)।

মাইকোব্যাক্টেরিয়োসিস (Mycobacteriosis) :

মল অথবা শরীরের কোন তরল পদার্থ পরীক্ষা করে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই (AFB) শনাক্ত করে এটা নির্ণয় করতে হয় ।

ক্যাফোসিস সারকোমা (Kaposi's sarcoma) :

ক্যাফোসিস সারকোমা এমন একটি যৌনবাহিত রোগ যা কি না ত্বক, মিউকাস আবরণ এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

এটা দেখে শনাক্ত করা বেশ কঠিন। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ত্বক ও মিউকাস আবরণ লালাভ বেগুনি ক্ষত দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। এটি ত্বক ও মিউকাস আবরণের ওপর এটি একটি আস্তরণের মত দৃশ্যমান হয়। লালাভ বেগুনি ক্ষতগুলো দেখা দেয় ফর্সা গাত্রবর্ণের ব্যক্তিদের ত্বকে। কালোদের ক্ষেত্রে কালচে অথবা খয়েরি দাগ হয়। পরবর্তীতে ত্বকে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে চাকা হতে পারে।

নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া (পিসিপি) :

নড়াচড়া ও হাঁটাহাঁটিতে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি এবং শ্লেষ্মাবিহীন কাশি এ রোগের লক্ষণ। তিন মাসের বেশি এ ধরনের লক্ষণ থাকলে এক্সরের মাধ্যমে রোগ শনাক্ত করা হয়। এ রোগে রক্তের অক্সিজেনের পরিমাণ ৭০ মিলিমিটার মার্কারির (Hg) নিচে নেমে আসে।

মস্তিষ্কের টক্সোপ্লাজমোসিস :

মগজের বিশেষ স্থান অথবা নার্ভের বিপর্যয় বা ফোকাল অ্যাবনরমালিটি (Focal abnormality) নির্ণয়ের সাথে সাথে চেতনার স্তর নেমে যাওয়া দেখে এ রোগ নির্ণয় করতে হয়। মস্তিষ্কের এক্সরে–সিটি, এমআরআই (CT, MRI) করেও রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রক্তে টক্সোপ্লাজমোসিস এন্টিবডি নির্ণয়ের মাধ্যমে অথবা ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের সাফল্য বিবেচনা করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

৬.৭.১. কীভাবে শনাক্ত করা যাবে যে একটি শিশু এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে?

শুধু এইচআইভি স্ক্রিনিং করে অথবা এইচআইভি এন্টিবডি শনাক্ত করেই বলা যাবে না যে একটি শিশু এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কেননা, এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়ার পর পরই প্রায় সব শিশুই এইচআইভি পজিটিভ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর কারণ প্লাসেন্টা বা গর্ভফুলের মাধ্যমে মায়ের এন্টিবডি শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া। জন্মের তিন থেকে ছ'মাস পরে শিশুর শরীর থেকে মায়ের এন্টিবডি সরে গেলে দেখা যাবে ৫০ ভাগের বেশি শিশু এইচআইভি পজিটিভ থাকছে না। যারা সত্যিকার অর্থে এইচআইভি আক্রান্ত হবে তাদের শরীরে নতুন করে তৈরি হবে এইচআইভি এন্টিবডি। তাই ছ'মাসের আগে এইচআইভি সংক্রান্ত সাধারণ পরীক্ষাগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

অবশ্য পি-২৪ নামক একধরনের এন্টিজেন শনাক্তকরণের মাধ্যমে শিশুর জন্মের পর পরই রোগ শনাক্ত করা যায়। তবু সাধারণভাবে দশমাস বয়সের পর যে সমস্ত শিশু বিভিন্ন পরীক্ষায় নীরোগ প্রমাণিত হবে তাকেই এইচআইভি মুক্ত বলা যাবে।

৬.৮.১. কখন পরীক্ষা করতে হবে, কীভাবে পরীক্ষা করতে হবে?

এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন যৌনসংযোগ ঘটলে অথবা ধর্ষণ বা কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে সংক্রমণ ঘটলে সাথে সাথেই একটি প্রাথমিক (Base line) পরীক্ষা করিয়ে নেয়া প্রয়োজন। তবে এইচআইভি এন্টিবডি তৈরি হতে কমপক্ষে ছ'সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণত ছ'সপ্তাহ থেকে ছ'মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হয়ে থাকে।

৬.৯.১. এইচআইভি টেস্ট সংক্রান্ত কিছু আইনগত ও এথিক্যাল বাধ্যবাধকতাঃ

যে কাউকে পরীক্ষা করবার পূর্বে তার সাথে খোলামেলা কথা বলা প্রয়োজন এবং সম্মতিরও প্রয়োজন। টেস্ট রেজাল্ট সাধারণত অন্য কাউকে জানানো হয় না। এমনকি নিকটজনের টেস্ট ফলাফল জানতে হলেও সম্মতির প্রয়োজন হয়; কখনও কখনও আদালতের আদেশেরও প্রয়োজন হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এসব বিধি-নিষেধের ব্যত্যয় রয়েছে; যেমন– ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, চাকুরির নিয়োগদাতাসহ কোন কোন সরকারি সংস্থার এটা জানবার অধিকার রয়েছে। কোন কোন দেশে সেনাবাহিনী, পুলিশ, জেলখানায় কর্তব্যরত কর্মীসহ জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের বাধ্যতামূলক এইচআইভি স্ক্রিনিং করা হয়। এছাড়া অপারেশনের পূর্বে রোগীকে, রক্তদানের পূর্বে রক্তদাতার, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী রোগী এবং যৌনকর্মীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে এইচআইভি স্ক্রিনিং করা হয়।

বাংলাদেশে যারা বিদেশ প্রত্যাগত, বিশেষ করে দেশে ফিরে আসা পাচারকৃত নারীদের ক্ষেত্রে এইচআইভি স্ক্রিনিং করা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মত দরিদ্র দেশে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রিক্সাচালক ও মটরযানের ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

কোন কোন দেশে বিয়ের পূর্বে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়াটা বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সিফিলিসের মত অন্যান্য যৌনরোগের পরীক্ষা এবং রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমেরিকার অনেক স্টেটেও। আমাদের দেশে প্রতিটি রিস্ক গ্রুপকে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নিতে মোটিভেশন করা প্রয়োজন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন জাতিকে এই মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই। যারা একক যৌনসম্পর্ক বজায় রেখেছে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তেমন নেই। একনিষ্ঠ সম্পর্ক ও শুদ্ধ যৌনাচারই এইডসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা।

অধ্যায় সাত

এইডসের কো-ফ্যাক্টর

কিছু রোগ রয়েছে যেগুলোতে আক্রান্ত হলে যে কারও ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে এইডসের সঙ্গে এসব রোগের সহাবস্থান থাকে। এগুলো এইডস সংক্রমণের কো-ফ্যাক্টর।

৭.১ ভাইরাল কো-ফ্যাক্টরঃ

যেসমস্ত ভাইরাস এইডস ভাইরাসগুলোকে উদ্দীপ্ত করতে এবং ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে তার মধ্যে অন্যতম হল-

- হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (HBV)
- হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস; এটার সাথে এইডস রোগের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে।
- হিউম্যান-টি লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস টাইপ-১ (Human T-lymphotropic virus type-1 বা HTLV-1)
- সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytomegalovirus বা CMV)
- এপস্টেইন বার ভাইরাস (Epstein Barr virus বা EBV)
- হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ-২ (Herpes simplex virus type-2 বা HSV-2)
- হারপেস জোস্টার ভাইরাস (Herpes zoster virus বা HZV)

CMV, EBV, HSV_2 এবং HZV এই চারটি ভাইরাস এইডস রোগের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক বা কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ এসব রোগের সংক্রমণ হলে এইডস রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অন্যান্য কো-ফ্যাক্টর :

- সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, জেনাইটাল হারপেসসহ অন্যান্য যে সমস্ত যৌনবাহিত রোগ, যৌনাঙ্গে ঘা (Jenaital ulcer) ও প্রদাহ সৃষ্টি করে। এসব রোগ এইডস সংক্রমণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ঠোঁট, গলা, যৌনাঙ্গ, পায়ুপথ ও মুখ-গহ্বরের ক্ষত। মেয়েদের খাৎনা, শুকনো মিলন, ঘনঘন মিলন ও অস্বাভাবিক যৌন আচরণের কারণে এসব ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।
- গুরুতর যক্ষ্মা ও দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়া রোগ। বিশেষ করে পিসিপি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৭.১.১. যৌনরোগে আক্রান্তদের এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কি বেশি?

যৌনবাহিত রোগগুলো এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে কেবল যোনিপথে ঘা-ই তৈরি করে না, সেই সাথে এইচআইভি টার্গেট কোষের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের যে কোন সংক্রমণ যোনিপথে একটিভেটেড বা সক্রিয় লিম্ফোসাইট ও মনোসাইটের সংখ্যা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। এগুলো সহজে এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর উপস্থিতিতে যোনিপথে প্রবিষ্ট ভাইরাস আক্রমণের সহজ লক্ষ্যবস্তু পেয়ে যায়। সিফিলিস, হারপেস, হেমোফাইলিয়া (Haemophilia), ডুক্রি (Ducreye) এবং ক্ল্যামাইডিয়া সংক্রমণের কারণে যোনিপথে ঘা হলেও সিএমভি সংক্রমণ, এপস্টেইন বার ভাইরাস সংক্রমণে কোন ক্ষত তৈরি হয় না। তবে এগুলো এইচআইভি টার্গেট কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। এসব কারণে এই যৌনবাহিত রোগগুলো এইচআইভি সংক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ কো-ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচিত হয়।

যৌনরোগাক্রান্ত সমকামীদের মধ্যে সিফিলিস ও গনোরিয়াজনিত ঘা ও ক্লামাইডিয়াজনিত প্রদাহ এইচআইভি সংক্রমণ সহজ করে দেয়। এর ওপর প্যাসিভ সমকামীদের মধ্যে অনেকের হেমোরয়েড (পাইলস) রোগের ক্ষত, এনালফিশার বা ফেটে যাওয়া মলদ্বার ও এনাল ওয়ার্টস এইডস সংক্রমণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ঘা বা ক্ষত দু'ভাবে এইডস সংক্রমণে সহায়তা করে। ক্ষতের কারণে এইচআইভি জীবাণু সরাসরি রক্তে সংক্রমিত হতে পারে; অন্যটি ইমিউনিটি সংক্রান্ত– যা পরোক্ষ সহায়ক ভূমিকা রাখে টার্গেট কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে।

ঠোঁট ও মুখগহ্বরের ক্ষত এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ কারণে যৌনমিলনে কনডম ব্যবহারের সাথে সাথে অজানা অচেনা কারও সাথে মিলনের ক্ষেত্রে ওরাল সেক্স পরিহার করার উপর জোর দেয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে ডেন্টাল ড্যাম বা এক ধরনের ল্যাটেক্স ব্যারিয়ার ব্যবহার করতে হবে। জানা থাকা প্রয়োজন, ঠোঁট ও মুখের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ কম হলেও এটা অসম্ভব নয়। এছাড়াও এ পথে গনোরিয়া, সিফিলিস ও হারপেসের মত যৌনরোগের সংক্রমণ হয়ে থাকে।

৭.২.১. হেমোফাইলিয়া রোগী (Haemophilia patients) :

হেমোফাইলিয়া আক্রান্তদের জন্য ক্লটিং ফ্যাক্টর ব্যবহারের আগে তা এইচআইভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। ১৯৮০ সনের পূর্বে এখনকার মত তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রক্ত বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। তখন কেবল রক্ত পরিসঞ্চালন ও চিকিৎসার কারণে আমেরিকায় যথাক্রমে ৮০ ভাগ ও ৫০ ভাগ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আজকে সে পরিস্থিতি না থাকলেও হেমোফাইলিয়া রোগাক্রান্তদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ঘটনা শেষ হয়ে যায়নি। সেরোপজিটিভ হেমোফাইলিয়া (Haemophiliacs)-দের যৌনসঙ্গীরা দশ থেকে বিশ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্ত হয়। হোমোফাইলিয়াকদের শরীরে ফ্যাক্টর-৯ দেবার পূর্বে তা নিয়মমাফিক স্টেরিলাইজেশন করে নিলে শুরুতেই এইচআইভি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব :

কারও যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হলে অবহেলা না করে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কেউ যৌনরোগে আক্রান্ত হলে ঐ রোগের পরীক্ষার সাথে সাথে এইচআইভি, সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্লামাইডিয়া, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হারপেস রোগের উপস্থিতি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে, বিশেষ করে যখন কোন যৌনরোগ সাধারণ চিকিৎসায় নিরাময় হচ্ছে না।

যারা হেপাটাইটিস–বি রোগে আক্রান্ত তাদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। তাই হেপাটাইটিস–বি স্ক্রিনিং করা এবং সবাইকে ভ্যাকসিন দেয়া অতি জরুরি।

৭.৩.১. নারীদের মধ্যে যে কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয় :

নারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের একটি প্রধান কারণ হল ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণ এবং নেশা গ্রহণকারীদের সঙ্গে মিলন। যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ ভাগ নারী ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করার কারণে এইচআইভি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ৩৮ ভাগ নারী এইচআইভি আক্রান্ত হয় নেশাগ্রস্তদের সঙ্গে যৌনমিলনের কারণে অথবা এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা নারীর সঙ্গে যৌনমিলনের প্রেক্ষাপটে।

নারী দেহের দুর্বল দিক হল একটি বিস্তৃত মিউকোসা আবৃত যোনিপথ। এর মধ্যে প্রচুর রক্তবাহী শিরা এবং টার্গেট কোষ বিদ্যমান থাকায় নারীরা সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনরোগের সাথে যে লক্ষণগুলো এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয় তা হল–

- স্থায়ী দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব,
- যোনিপথে বারবার তীব্র অস্বাভাবিক ছত্রাকের সংক্রমণ (ক্যান্ডিডিয়াসিস), সেইসাথে লিম্ফএ্যাডোনোপ্যাথি,
- বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগের ঘন ঘন সংক্রমণ,

●সেই সাথে জ্বর, কাশি, ওজন হ্রাস ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে যৌনরোগের কারণ নির্ণয়সহ সারভাইক্যাল প্যাপস্মিয়ার (Pap smear) করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সারভাইক্যাল ডিসপ্লেশিয়া ও স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা (Squamous cell carcinoma) নির্ণয়ের জন্য।

এইডস রোগের সাথে সারভাইক্যাল ডিসপ্লেশিয়া, সারভাইক্যাল ইন্ট্রাইপিথেলিয়াল নিয়োপ্লাসিয়া (Intraepithalial neoplasia) অথবা স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়ে থাকে। এসব রোগের কারণে এইডস সংক্রমণের পরিবেশও তৈরি হয়ে থাকে। যোনিপথে কিছু কিছু ছত্রাকের সংক্রমণ ও দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণের কারণেও এই ধরনের রোগগুলো হতে পারে।

লেখকের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ভ্যাজাইনাল ইস্ট-এর সংক্রমণ, ক্যান্ডিডিয়াসিস এবং বিশেষ ধরনের ইকোলাই সংক্রমণ যোনিপথে যেমন এইচআইভি সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে, তেমনি সারভাইক্যাল ক্যান্সার ও ক্যাফোসি'স সারকোমা তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। নারী ও হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষদের মধ্যে ক্যাফোসিস সারকোমার হার অতি নগণ্য। সমকামীদের মধ্যে উচ্চহারে পাওয়া যায় ক্যাফোসি'স সারকোমা। যাদের এ্যানাল ওয়ার্টস রয়েছে তাদের মধ্যেই ক্যাফোসিস সারকোমা রয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন গবেষক সমকামীদের মধ্যে sexually transmitted agent-এর একটি বিশেষ ভূমিকার কথা মনে করেন। সূত্র- Beral V. Peterman, TA, Berkelman RI, et al Kaposi's Sarcoma among persons with AIDS a sexully transmitted infection; Lancet ১৯৯০, ৩৩৫; ১২৩-৮।

৭.৪.১. যেসমস্ত ভাইরাস এইচআইভি সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে :

যেসমস্ত ভাইরাস ইনফেকশন এইচআইভি সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস এবং হিউমান টি-লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস ($HTLV_1$)। অন্যান্য যে ভাইরাসগুলো কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে সেগুলো হল– সাইটোমেগালোভাইরাস, হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, হারপেস জোস্টার ভাইরাস ইত্যাদি।

●সমকামীদের মধ্যে সাইটোমেগালোভাইরাসের উপস্থিতি এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মধ্যে এইচটিএলভি-১ এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

●অনেক গবেষকই মনে করেন, সাধারণভাবে যক্ষ্মার উপস্থিতি এবং সমকামীদের মধ্যে এন্টেরিক পরজীবী (Enteric parasite) এইচআইভি সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। তবে যক্ষ্মা সংক্রান্ত এই পূর্বানুমানটি সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

- সাইটোমেগালোভাইরাস সংক্রমণের সাথে ক্যাফোসি'স সারকোমার একটি সম্পর্ক রয়েছে। ক্যাফোসি'স সারকোমার উদ্ভবের পেছনে মুখ ও পায়ুপথে নিঃসৃত একটি উদ্দীপক বস্তুর কথা চিন্তা করা যাচ্ছে। এটার নাম দেওয়া হয়েছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড কেএস এজেন্ট হিসাবে। গবেষকরা এটাও মনে করেছেন যে, এটা আমেরিকা থেকে বৃটেনে সংক্রমিত হয়েছে। (সূত্র : Beral-V, Bull-D, Jaffe-H, etal Is risk KS in AIDS patients in Britain in sexual partnars came from US or Africa; BMJ 1991; 302 : 624-5)

লেখক নিজেও **এ্যানোরেক্টাল এজেন্টকে শুধু কেএস-ই নয়, এইডস সংক্রমণেরও একটি অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচনা করেন।**

৭.৫.১. এইডস রোগের শুরুর সঙ্গে ফ্লু'র কোন সম্পর্ক আছে?

সাম্প্রতিক সময়ে হংকং, চীন, কানাডাসহ নানা দেশে সার্স ভাইরাসের আঘাত এবং আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ১৫ ভাগের মৃত্যু বিশ্বব্যাপী ভীতি সৃষ্টি করছে। তবে এইচআইভি'র সাথে এ রোগের সম্পর্ক এখনও জানা যায়নি।

এইডস আক্রান্তদের মধ্যে কোল্ড ভাইরাস বা ফ্লু'র সংক্রমণ নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে এইচআইভি আক্রমণের শুরুতে এসব প্রতিরোধ কিছুটা সম্ভব হলেও পরবর্তীতে এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ কারণে ভ্যাকসিন দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় এমন অসুখগুলো প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে সিডিসি। ফ্লু ভ্যাকসিন প্রয়োগে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে তেমন কোন সমস্যা হয় না। সাধারণভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগের সমস্যার চেয়ে নতুন রোগ সংক্রমণের ভয়াবহতা ও বিপদ অনেক বেশি থাকে।

অধ্যায় আট

এইচআইভি সংক্রমণ– ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন

৮.১ টার্গেট গ্রুপ

সম্ভাব্য এইচআইভি আক্রান্তদেরকে বিপদের মাত্রা অনুযায়ী তিনটি আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা–

৮.১.১. ক্যাটাগরি-১ : শীর্ষ ঝুঁকিতে যারা (High Risk Group)

- সকল ধরনের যৌনকর্মী; যেমন–
- মহিলা যৌনকর্মী
- পুরুষ সমকামী/যৌনকর্মী

●ইনজেকশনের মাধ্যমে যারা ড্রাগ গ্রহণ করে (Injectable Drug Users বা IDUs)

●ভাসমান যৌনকর্মী (FSWs)। এরা নিবন্ধিত নয়, এদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থানও নেই। বড় শহরগুলোর রাস্তা ও পার্ক এদের আবাসস্থল।

●বহুগামী নারী ও পুরুষ।

●এইডসে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের সন্তানেরা।

●আন্তঃজেলা ও অভ্যন্তরীণ বাস-ট্রাকের ড্রাইভার, হেলপার, কন্ডাক্টর এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন। এই শ্রেণীর শ্রমজীবীরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পতিতাদের সাথে মিলিত হয়।

●স্থল বন্দরগুলোতে আমদানি রপ্তানি ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত বহিরাগত লোকজন, শ্রমিক ও ড্রাইভাররা। এছাড়া সমুদ্র বন্দরগুলোতে আগত জাহাজি ও বিদেশী নাবিক। এরা এদেশে এসে বিভিন্ন যৌনকর্মীদের সাথে মেলামেশা করে।

●রিক্সাচালক ও বিভিন্ন ধরনের দিনমজুর। এরা ভাসমান পতিতাদের সাথে মিলিত হয়।

●বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া নারী– যাদেরকে পরে উদ্ধার করে দেশে ফেরত আনা হয়।

●পুলিশ, নাইট গার্ড, দারোয়ান শ্রেণীর লোক– যারা বিভিন্ন ভাসমান পতিতাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

●এইচআইভি আক্রান্তদের পরিবার ও নিকট আত্মীয়স্বজন।

●সহজে আক্রান্ত হতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গ তাদের পরিবারও আত্মীয়স্বজন।

- পেশাদার রক্তদাতা।

৮.১.২. ক্যাটাগরি-২: যাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে (Potential Threat Group)

- যারা হরহামেশা বিদেশে যাওয়া আসা করে।

●যারা বিদেশে বিভিন্ন ধরনের চাকরি করে এবং দীর্ঘদিন পর পর দেশে ফেরে।

●সেনাবাহিনীর যে সকল সদস্য বিদেশে বিভিন্ন শান্তি রক্ষা মিশনে কাজ করছে।

●বিদেশী যে সব খেলোয়ার বাংলাদেশে খেলতে আসছে বা নিয়মিতভাবে স্থানীয় লীগে খেলছে, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোর খেলোয়ারবৃন্দ।

●যেসব বিদেশী বাংলাদেশে যাওয়া আসা করছে, থাকছে এবং বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

●সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ। এরা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়।

●সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বিডিআর সদস্যরা।

৮.১.৩. ক্যাটাগরি-৩: আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে যারা নাজুক অবস্থায় আছে (Vulnerable Group)

- সমকামী নারী ও পুরুষ– যারা যোনিপথ ও পায়ুপথ উভয় পথেই মেলামেশা করে।
- ইনজেকশনের মাধ্যমে যারা ড্রাগ গ্রহণ করে।
- হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মী, প্যাথলজি ও রক্ত সঞ্চালন বিভাগের কর্মীসহ সংশ্লিষ্টরা।
- দরিদ্র কর্মজীবী নারী শ্রমিক, বিশেষত গার্মেন্টস ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যারা কায়িক শ্রম দেয়। দারিদ্রের কারণে এরা ব্যবহৃত হয়।
- বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর কিংবা এসব বন্দরের আশেপাশে বিভিন্ন কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত লোকজন এবং তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন।
- বিভিন্ন যৌনরোগে (STD) আক্রান্ত নারী ও পুরুষ।

৮.২. বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী ও বয়সের লোকের মধ্যে এইডসের সম্ভাবনা :

৮.২.১. কাদের জন্য এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক?

যাদের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা গেছে তাদের তো স্ক্রিনিং করতেই হবে, এছাড়াও–

- যারা সম্প্রতি ও অতীতে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণ করেছে।
- সম্প্রতি ও অতীতে যাদের যৌনসঙ্গী ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবন করেছে।
- প্যাটার্ন-২ দেশগুলোর নারী অথবা পুরুষদের সঙ্গে যাদের যৌনসংযোগ ঘটেছে।
- হেমোফাইলিয়াতে আক্রান্তদের সাথে যারা মেলামেশা করেছে।
- যারা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৮-১৯৮৫ সনের মধ্যে রক্ত গ্রহণ করছে এবং অন্যান্য দেশে যারা স্ক্রিনিং বিহীন রক্ত গ্রহণ করেছে।
- যারা বর্তমানে ও অতীতে একাধিক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে।
- ক্যারিবিয়ান এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে বসবাসরত অথবা ঐ অঞ্চল থেকে অভিবাসী নারী-পুরুষ।
- যে সমস্ত নারীকে কৃত্রিম উপায়ে বীর্য সঞ্চালন করা হয়েছে।

৮.২.২. কোন বয়সিদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি?

আমেরিকার এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৪-২১ বয়স সীমার মধ্যে ৬৩ ভাগই বিবিধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। এই বয়সিদের মধ্যে নানাবিধ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত রয়েছে বাংলাদেশের কিশোর, কিশোরী, তরুণ ও তরুণীরাও। এদের মধ্যে এইডসসহ অন্যান্য যৌনরোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। র‍্যান্ডম পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই বয়সসীমার মধ্যেই প্রায় ৩৩ ভাগ বাংলাদেশী যৌন অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয় অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তবে এটি কোন জাতীয় পর্যায়ের জরিপ ফলাফল নয়। অপর পক্ষে, এইচআইভি আক্রান্ত নারীদের ৮৮ ভাগই ১৫-৪৪ বয়সসীমার মধ্যে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে আক্রান্ত হচ্ছে ৩০-৩৯ বয়স সীমার নারীরা।

এই বয়সীদের মধ্যে অবৈধ যৌনসংযোগের ঘটনা বেশি হওয়ায় এদের মধ্যে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কনডম ব্যবহারের শিক্ষাটা এবং এইচআইভি সংক্রান্ত তথ্য এই বয়সসীমার মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে দেশের তরুণ সম্প্রদায় শুধু এইচআইভি থেকেই রক্ষা পাবে না, বিভিন্ন যৌনরোগ থেকেও সুরক্ষা পেতে পারবে।

জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ড. নাফিস সাদিক গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ উল্লেখ করেন যে, ‘Despite low prevalence of HIV/AIDS, less than one percent among sex workers, Bangladesh is a high-risk country for many reasons.’

তিনি আরও জানান, ‘There are thirty million people below the age of twenty years, and there is evidence that young people are experimenting with commercial sex and multiple partners. Only 19 percent of ever-married women and 33 percent of currently married men had ever heard of AIDS. High infection rates among the drug users and unsafe blood transfusion are among the basic modes of HIV transmission.’

৮.৩ যৌন আচরণের সঙ্গে এইডসের সম্পর্ক:

৮.৩.১. সমকামীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি কতটুকু?

সমকামিতা এইডস সংক্রমণের অন্যতম কারণ। তাই এ অভ্যাস পরিহার করতে হবে। তবে একেবারে পরিত্যাগ করা না গেলে তাদের জন্য বিশেষ কতগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। পায়ুপথ ও যোনিপথ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং মিলনের পূর্বে অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে।

সমকামীদের পায়ুপথে মিলন (Insertid) ছাড়া আর যেভাবে এইডস ছড়াতে পারে তা হল এমন সব যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ যাতে মলদ্বার ও মুখের ত্বক এবং মিউকোসায় ক্ষত সৃষ্টি হয়। হাত, আঙ্গুল বা কঠিন কোন বস্তুর ব্যবহার এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। মলাশয়কে ডুশ দ্বারা পরিষ্কার করাকেও এইচআইভি সংক্রমণের একটি সহায়ক কারণ বলে মনে করা হয় এই কারণে যে, এতে মলাশয়ের মিউকোসা শুকিয়ে যায় এবং সহজে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে।

স্পারমিসাইড (Sparmicides) অনেক সময় যোনিপথে প্রদাহ তৈরি করে বিপদ বাড়িয়ে দিতে পারে।

যোনিপথ লেহনের (কানিলিঙ্গাস) কারণে ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা ফেলাসিও বা পুরুষ যৌনাঙ্গ লেহনের চেয়ে কম। কেননা বীর্যের চেয়ে যোনিপথে ভাইরাসের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

সমকামীরা একসময় এমালনাইট্রেট ও বুটালনাইট্রেট ব্যবহারের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এক সময় অনেক গবেষক এগুলোকে Etiologic agent হিসাবে মনে করেছেন। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে একজন যেমন বিপজ্জনক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তেমনি এসব বস্তু রক্তের শিরাগুলোকে প্রসারণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে (Immune suppressive) এইচআইভি সংক্রমণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সমকামীদের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার বেশি। এ বিষয়ে লেখক মনে করেন যে, এইডস সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে পারে এমন ধরনের ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক রয়েছে মলাশয়ে। এটি স্ত্রী যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট হলে এইডস সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয় এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের চামড়ার নিচেও অনুরূপ ভূমিকা রাখে।

সমকামীদের মাঝে মাঝে এইচআইভি স্ক্রিনিং করাতে হবে। এদের যৌনাঙ্গ ও এর আশেপাশে, গলায় যেসব ক্ষত ও ঘা হয় সেগুলো অবহেলা করলে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এজন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করে ক্ষত বা ঘাগুলো সারিয়ে তুলতে হবে।

৮.৩.২. ওরাল সেক্স:

সুরক্ষাসহ ওরাল সেক্স, চুম্বন, আলিঙ্গন, আদর, ম্যাসেজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ওরাল সেক্স একেবারে বিপদমুক্ত কোন বিষয় নয়। আর কনডম ছাড়া পায়ুপথে কিংবা যোনিপথে মিলন তো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

পায়ুপথ, যোনিপথ এবং পুরুষ যৌনাঙ্গ লেহনের মত যৌনক্রিয়াতে ভাইরাস সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও তা আদৌ নিরাপদ নয়। যোনিপথ ও পায়ুপথ লেহনের আরও বিপত্তি হল এই, এ প্রক্রিয়ায় হেপাটাইটিস-বি, হারপেস সিমপ্লেক্স, সিএমভি, সিফিলিস, গনোরিয়াসহ নানা ধরনের পরজীবী ও যৌনরোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে এটাকে আপেক্ষিকভাবে বিপজ্জনক যৌন আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করছেন লেখক।

এ প্রক্রিয়ায় এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় চিকিৎসকগণ ল্যাটেক্স ব্যারিয়ার ও ডেন্টাল ড্যাম ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

৮.৩.৩. লেসবিয়ানদের ঝুঁকি

নারীর সঙ্গে নারীর যৌনসংযোগে অর্থাৎ লেসবিয়ানদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে এদের মধ্যে ঠোঁট ও যোনিপথের সংযোগের মাধ্যমে এইডস ছড়াতে পারে। আমেরিকায় পরিচালিত এক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, একহাজার এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে মাত্র একজন নারী অন্য নারীর সঙ্গে যৌনসংযোগে লিপ্ত হয়েছিল। লেসবিয়ানদের মধ্যে যারা এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশই অন্য পুরুষের সাথে যৌনসংযোগের ফলে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণের কারণে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে।

যে সব প্রক্রিয়ায় লেসবিয়ানদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–পায়ুপথ ও যোনিপথ লেহন এবং **একাধিক নারী কর্তৃক একই যৌন খেলনা ব্যবহার**। তবে এটি একটি গৌণ সম্ভাবনা। তৃতীয় বিশ্বে নারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান কারণ এইচআইভি আক্রান্তের সাথে যোনিপথে বা পায়ুপথে মিলন।

যাদের একাধিক যৌনসঙ্গী রয়েছে এবং যারা পায়ুপথ ও যোনিপথ উভয় দিকেই মেলামেশা করে তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার বেশি। তাই এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে যোনিপথ ও পায়ুপথের পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেয়া যাচ্ছে। দিনে দু'বার এসব স্থান পরিষ্কার পানি, পটাশ মিশ্রিত পানি, ক্লোরিন যুক্ত পানি, আয়োডিন ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মেলামেশার পর যোনিতে অবস্থিত তরল নিঃসরণ ও বীর্য ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৮.৩.৪. হেটেরোসেক্সুয়ালদের মধ্যে উচ্চ হারে এইডস সংক্রমণের কারণ

যুক্তরাষ্ট্রেও হেটেরোসেক্সুয়াল সম্পর্কের কারণে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনাটি ক্রমবর্ধমান। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫

সন পর্যন্ত ছ'বছরের মধ্যে এ সংখ্যাটি চতুর্গুণ হয়েছে। এর কারণ হেটেরোসেক্সুয়ালদের মধ্যে যৌন সুরক্ষা গ্রহণ করবার প্রবণতা খুব কম। নানা অজুহাতে তারা কনডম ব্যবহারে আপত্তি জানায় এবং তারা এরকম বিশ্বাস করতে চায় যে, এইডস কেবল সমকামী এবং নেশাগ্রহণকারীদের মধ্যেই ঘটে থাকে।

এছাড়াও কিছু এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত না হবার কারণে নীরবে এইডস ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের বহুগামী সম্পর্কের মাধ্যমে।

৮.৩.৫. এককগামী : গোপন সম্পর্কের মাধ্যমে এইডস সংক্রমণ

একক বা মনোগেমাস সম্পর্কের বিষয়টি আক্ষরিক অর্থে এটা বোঝায় যে একজনের সঙ্গে অন্য আরেকজনের সারা জীবনের সম্পর্ক। একজনের পর একজন একাধিক সঙ্গী ব্যবহার করে একাধিক বিচ্ছিন্ন একক সম্পর্ক (Serial monogamy) সম্পর্কের দৃষ্টান্তও রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে একের পর এক স্ত্রী গ্রহণ কিংবা আইনগত সম্পর্কের বাইরে সম্পর্ক স্থান এ ধরনের বিচ্ছিন্ন একক সম্পর্কের উদাহরণ। এ সম্পর্কও বিপদমুক্ত নয়।

দৃশ্যতঃ একনিষ্ঠ দম্পতিদের মধ্যে কেউ গোপনে এক বা একাধিক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা ও বিপদ বেড়ে যায়। সঙ্গীদের এইচআইভি সংক্রান্ত অবস্থা অজ্ঞাত থাকার কারণে একক সম্পর্কের তুলনায় একাধিক সম্পর্ক বহুগুণে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ায়। সমকামীদের মধ্যে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পাঁচজনের অধিক ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা ১৮ গুণ বৃদ্ধি করে।

৮.৩.৬. দীর্ঘকালের একক সঙ্গীর কাছ থেকে কীভাবে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে? এইডস প্রতিরোধে যৌনসঙ্গীকে কতটুকুন জানা প্রয়োজন?

যৌনসঙ্গীর অতীত যত বেশি অজানা থাকবে কিংবা তার নানা গোপন সম্পর্ক যত অজ্ঞাত থাকবে তত বেশি যৌনবাহিত রোগ এবং এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়বে। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুগামীদেরই এইচআইভি স্ক্রিনিং করা হয়নি। তাছাড়া অনেক নতুন বা পুরানো সঙ্গী তাদের রোগ সংক্রমণের বিষয়টি গোপনও করতে পারে। এ কারণে যাদের যৌনসঙ্গী একাধিক তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। এসবের প্রেক্ষাপটে নতুন সঙ্গীর সাথে সংযোগের পূর্বে কনডম ব্যবহার করা উচিত।

৮.৪.১ বহুগামী: বহুগামীদের ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি কেন?

বহুগামীদের ক্ষেত্রে এইডসহ বিভিন্ন যৌনরোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বহুগামীদের যৌনস্বাস্থ্য রক্ষা করাও কঠিন ব্যাপার। এ কারণে

বহুগামিতার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে একজন মাত্র সঙ্গী বেছে নেবার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

যারা একাধিক ব্যাক্তির সাথে মেলামেশা করেছেন কিংবা করেন তাদের সবারই এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া প্রয়োজন সকলের নিরাপত্তার জন্যই। এ কারণে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী উভয়ের যৌনবাহিত রোগসহ এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

বহুগামীদের ক্ষেত্রে সাধারণত যে রোগগুলো হয় তা হল রেকারেন্ট হারপেস জোস্টার (Recurrent herpes zoster), প্যাপিলোমা, সিএমভি ইনফেকশন, ইবিভি ইনফেকশন, হিউম্যান লিম্ফোসাইটিক ভাইরাস সংক্রমণ ইত্যাদি। এগুলোর বেশ কয়েকটি আবার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। যেমন সিএমভি ভাইরাস তৈরি করে ক্যাফোসিস সারকোমা, বিশেষ করে সমকামীদের সহযোগী সঙ্গীদের মধ্যে। সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্লামাইডিয়াসহ বিভিন্ন যৌনরোগ সংক্রমণের প্রধান কারণ বহুগামিতা এবং রোগাক্রান্তদের সাথে মিলন। সিফিলিস এইডস সংক্রমণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে সমকামী, বহুগামী ও যৌনকর্মীরা বিভিন্ন যৌনরোগসহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় বেশি।

৮.৫.১ যৌনকর্মীদের জীবনঃ এদের এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি কেন?

বাধ্যতামূলকভাবে যৌনকর্মীদের প্রতিমাসে এইচআইভি ও অন্যান্য যৌনরোগ সংক্রান্ত চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ পতিতারা যাতে কাজ না করে সেজন্য তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।

যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিপজ্জনক মেলামেশার কারণে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের যৌনকর্মীদের মধ্যে উচ্চহারে এইচআইভি'র উপস্থিতি এবং এদের সাথে বিপজ্জনক মেলামেশা অনেক দেশেই এইচআইভি সংক্রমণের অন্যতম কারণ। কনডম ব্যবহারসহ নিরাপদ মিলন এবং দূষিত বীর্য, যোনিরস ও রক্তের সাথে সংযোগ পরিহার এসব ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় ।

এরপরও যৌনকর্মীদের সাথে মেলামেশা বিপজ্জনক– এদের নানা ধরনের সঙ্গীর বিপজ্জনক আচরণের কারণে। নানা বর্ণের, নানা জাতের অসংখ্য সঙ্গীর যে কারও শরীর থেকে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়তে পারে এদের দেহে। এরপর এরাই ভাইরাস সংক্রমণের উৎস হিসাবে কাজ করে।

এসব কারণে বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যকর্মী ও এনজিও'রা যৌনকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করছে যৌন সুরক্ষা গ্রহণ করবার জন্য। এদের যৌনস্বাস্থ্য রক্ষার সাথে সাথে ফিমেল কনডম ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে এদের গ্রাহকদেরকে কনডম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে বলা

হচ্ছে। এতে কাজও হচ্ছে। ফিমেল কনডমের গ্রহণযোগ্যতা তেমন আশাব্যঞ্জক না হলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এর সফল ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেক যৌনকর্মী একটি ফিমেল কনডম একাধিক পুরুষের জন্য ব্যবহার করছে। এ কারণে কনডমে উপস্থিত একজনের বীর্যের সাথে অন্যের যৌনাঙ্গের সংযোগ ঘটছে এবং এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

ফিমেল কনডমের লুব্রিকেন্টের সাথে ভাইরিসাইডাল প্রয়োগের করে এ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসার এ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখানকার দরিদ্র যৌনকর্মীরা সামাজিক অবস্থানের কারণে অনেকক্ষেত্রে গ্রাহককে কনডম ব্যবহারে বাধ্য করতে পারছে না। এ সম্পর্কে এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ প্রক্রিয়ায় যারা কনডম ব্যবহার করছে না, তাদের যে কেউ রোগ ছড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা রাখছে এবং নিজেরাও সংক্রমিত হবার দ্বার উন্মুক্ত করছে।

এর ওপর রয়েছে সঠিক পদ্ধতিতে কনডম ব্যবহারের শিক্ষার অভাব। যৌনকর্মীদের বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, গ্রাহকদের বীর্য এবং যৌনরসের সাথে সংস্পর্শ তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, এগুলো যেন কোনভাবেই তাদের যোনিপথ, ক্ষতস্থানযুক্ত ত্বক বা মিউকাস আবরণের সাথে সংস্পর্শে না আসে।

এছাড়া মেলামেশার পর পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যৌনকর্মীদের হাত ও যোনিপথ সাবান, ভাইরিসাইডাল ইত্যাদি দিয়ে ধৌতকরণের বিষয়টির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন নিজেদের পরিচ্ছন্নতা এবং নানা রোগ প্রতিরোধের জন্যই।

৮.৫.২ যে সব ক্ষেত্রে যোনিপথে ভাইরাসযুক্ত বীর্য বিদ্যমান থাকেঃ

যাদের ক্ষেত্রে একাধিক যৌনসংযোগ ঘটে (যেমন, যৌনকর্মীদের মধ্যে) যৌনক্রিয়ার পর যোনিপথে ভাইরাসযুক্ত বীর্য বেশ কিছুক্ষণ বিদ্যমান থাকতে পারে। এটি অন্য নীরোগ ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত করারে ক্ষমতা রাখে। এ কারণেও যারা একাধিক লোকের সাথে মিলিত হচ্ছে তাদের যোনিপথ যৌনক্রিয়ার পর ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন।

এসব ক্ষেত্রে ওপরে উল্লিখিত ধৌতকরণ পদ্ধতিতে যোনিপথ পরিষ্কার করলে ভাইরাসের সংখ্যা কমে আসবে। তবে তা কখনই গ্রাহকের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয়। যৌনকর্মীর নিজের জন্য তো নয়ই।

৮.৬.১ যৌনসংযোগঃ পায়ুপথে মিলন

পায়ুপথে কোন কাটা-ছেঁড়া বা ক্ষত না থাকলেও পায়ুপথে মিলন বিপজ্জনক। মলাশয়ের নরম লালচে আবরণ বা

মিউকোসার নিচে মাস্ট কোষ (M-cell) এবং ল্যাঙ্গারহ্যান্স (langerhans) কোষ নামক দু'ধরনের কোষ থাকে। এগুলো বহিরাগত পদার্থের সাথে সাথে ভাইরাসকে দ্রুত ইমিউন কোষের কাছে নিয়ে যায়। এই দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে এইচআইভি ভাইরাস ইমিউন ব্যবস্থাকে চটজলদি আঘাত করতে পারে।

যেসব কারণে পায়ুপথে মিলনে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে তার মধ্যে অন্যতম হল মিউকোসা ছিঁড়ে যাওয়া এবং আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া। এ ধরনের ইনফেকশনের কারণে এইচআইভি সংক্রমণের হার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যৌনসংযোগের সময় রোগের স্তর এবং রক্তে বিদ্যমান ভাইরাল লোড। শুধু রোগের শেষ পর্যায়েই নয়, এইচআইভি অ্যাকিউট ইনফেকশনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাইরাল লোড বেশি থাকাতে এ সময় যেকোন ধরনের মিলন অধিক হারে রোগ ছড়ায়। আর রোগের শেষ পর্যায়ে ভাইরাল লোডের বিষয়টি তো সহজেই বোধগম্য।

এছাড়া সুরক্ষা ছাড়া পায়ুপথে মিলনের সংখ্যা এবং সঙ্গীর সংখ্যার সাথে সাথে রোগ বিস্তারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। যত বেশি সুরক্ষা ছাড়া মিলন হবে তত বেশি রোগ ছড়াবে। তবে সমকামী সঙ্গীদের কেউই যদি এইচআইভি আক্রান্ত না হয় তাহলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য অন্যান্য যৌনরোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এতে এইচআইভি সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশও তৈরি হয়।

সমকামীদের মধ্যে অর্থাৎ পায়ুপথে যৌনসংযোগে অংশগ্রহণকারী দু'পক্ষেরই সম্ভাবনা থাকে এইচআইভি সংক্রমণের। কনডম ছাড়া এ ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ একদিকে যেমন মলাশয়ের মিউকাস আবরণ ও তার ক্ষতের মুখোমুখি হয়, অন্যদিকে তেমনি পুরুষাঙ্গে বিদ্যমান ক্ষত বা আঁচড় উন্মুক্ত পথ তৈরি করে দেয় এইচআইভি ভাইরাসের জন্য।

আর এ ধরনের ক্ষত ছাড়া ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না, এটাও ঠিক নয়। মূত্রনালীর মিউকাস আবরণের নিচে রোগ প্রতিরোধকারী এমন সব কোষ (মাস্ট কোষ, ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ ইত্যাদি) থাকে যা বহিরাগত শত্রুগুলোকে ইমিউন কোষের কাছে নিয়ে যায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করবার জন্যই। এ প্রক্রিয়ায় এ কোষগুলো ঘাতক এইচআইভি'কেও নিয়ে যায় ইমিউন কোষের নিকট। এরপরও এটি সত্যি যে, সহযোগী সঙ্গী বা রিসেপ্টিভ সঙ্গী (receptive partner) তার অ্যাকটিভ বা সক্রিয় সঙ্গীর চেয়ে দ্বিগুণ মাত্রায় বিপদ বহন করে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে। এর প্রধান কারণ হল এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তির বীর্যে অসংখ্য ভাইরাসের উপস্থিতি এবং মলাশয়ের বিস্তৃত জায়গা জুড়ে মিউকাস আবরণের বিস্তৃতি।

এসব কারণে পায়ুপথে মিলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কনডমের মত সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পায়ুপথ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া জেনেটিক কারণে পায়ুপথে মিলন প্রবণতা যাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তাদের চেষ্টা করতে হবে এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর মেলামেশা পরিহার করবার জন্য।

৮.৬.২. পায়ুপথে মিলনে অ্যাকটিভ ও সহযোগী (Passive) সঙ্গীদের ঝুঁকি কতটুকু ?

সমকামীদের মধ্যে সহযোগী সঙ্গীদের নিকট থেকে এইডস সংক্রমণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক এইডস ভাইরাস আশ্রয় নেয় বীর্যে। সাধারণভাবে মলদ্বার এবং রেকটাম খুব পাতলা মিউকোসা দ্বারা আবৃত থাকে। মলদ্বারে ও রেকটামে রক্ত সরবরাহকারী শিরা বেশি থাকায় এবং ঘর্ষণের দ্বারা ক্ষত সৃষ্টির কারণে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

এছাড়া মলদ্বারটি তুলনামূলকভাবে সরু, স্পর্শকাতর ও সংকোচনশীল হয়ে থাকে। এসব কারণে পায়ুপথে যৌনমিলন অতিসহজে নানাবিধ ক্ষত তৈরি করে এবং এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া এই স্থানে বিদ্যমান মাস্ট কোষ (Mast cells) ও ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ (Langerhans cells) খুব সহজেই বহিরাগত বস্তুগুলোকে ইমিউন ব্যবস্থার নিকট হাজির করে। মলদ্বারের রক্ত সরবরাহকারী শিরাগুলো কত সহজে বহিরাগত বস্তুকে রক্তের ভেতরে নিয়ে যায় তার একটি উদাহরণ হল জ্বর ও ব্যথানাশক ওষুধগুলোর শোষণ বা অ্যাবজরপ্শন কার্যক্রম। ব্যথা বোধ কমে যাবার কারণে মলদ্বারে ক্ষত বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এইচআইভি ভাইরাস একারণেও সরাসরি ইমিউন ব্যবস্থাকে আঘাত করতে পারে।

৮.৬.৩. নারীর পায়ুপথে পুরুষের মিলন :

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০ ভাগ নারী-পুরুষ নানা কারণে এ ধরনের যৌনসংযোগ ঘটিয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল– সতীত্ব রক্ষা, গর্ভধারণ পরিহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক যৌনআনন্দ ও বৈচিত্র্যের জন্য। এছাড়া অপ্রতিরোধ্য হোমোসেক্সুয়াল প্রবণতার সাথেও এর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে বলে লেখক মনে করেন।

পুরুষদের মত নারীদের সাথে পায়ুপথে মিলনের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা একই রকম। শুধু এইচআইভি পজিটিভ পুরুষের সাথে সুস্থ নারীর মিলনেই বিপজ্জনকভাবে রোগ ছড়ায় না, এইচআইভি পজিটিভ নারীর সাথে সুস্থ পুরুষের মিলনেও একইভাবে রোগ সংক্রমণ ঘটে থাকে।

পায়ুপথে সকল ধরনের মিলনে কনডম তো ব্যবহার করতেই হবে, তাছাড়া জানা এইচআইভি পজিটিভ

ব্যক্তির সাথে যৌনমিলনের ক্ষেত্রে পায়ুপথ পরিহার করা নিরাপদ। আর এইচআইভি পজিটিভদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হল সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যৌনসংযোগ পরিহার করা। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা চিকিৎসকের পরামর্শে সকল সুরক্ষা নিয়ে স্থায়ী একক সঙ্গীর সাথে নিরাপদ যৌনমিলন ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে উভয় সঙ্গীকেই তৃতীয় পক্ষের সাথে যৌনসংযোগ বর্জন করতে হবে এবং নিজ সম্মতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিকভাবে নিরাপদ যৌনসংযোগ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। নিরাপদ যৌনসম্পর্ক বিষয়ে এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৮.৬.৪. পায়ুপথে মিলিত হলেই একজন এইডস আক্রান্ত হবে কি না :

পায়ু পথে মিলিত হলেই যে একজন এইডস আক্রান্ত হবে, এমন কোন কথা নেই। এইচআইভি আক্রান্ত প্যাসিভ বা সহযোগী সঙ্গীর সাথে মিলিত হলে তবেই এইডস ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। আর সক্রিয় সহযোগী যখন এইচআইভিতে আক্রান্ত তখন রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা এমনিতে বেশি থাকে। পায়ুপথে মিলিত হলে এইডস সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয় প্যাসিভ ও অ্যাকটিভ উভয় সঙ্গীর মধ্যে। এর কারণ–যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে পায়ুপথে আঘাত ও ক্ষত সৃষ্টি, পায়ুপথের রক্তের শিরা উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে অধিকতর ইমিউন কোষ বা টার্গেট কোষ তৈরি। সেই সাথে পায়ুপথে নিঃসৃত এইডস সংক্রমণ সহায়ক অজ্ঞাত (Unknown) ফ্যাক্টর তো রয়েছেই।

৮.৬.৫. পায়ুপথ বা যোনিপথে বীর্য নির্গত না হলেও এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে?

অনেকের মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে যে, যৌনমিলনের সময় পায়ুপথ বা যোনিপথে বীর্য নির্গত না হলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে না। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বীর্য নির্গত হওয়ার আগে যৌনাঙ্গের শীর্ষপথে যে যৌনরস নির্গত হয় তাতেও ভাইরাস বিদ্যমান থাকে। তবে যত বেশি তরল পদার্থ নিঃসৃত হবে তত বেশি ভাইরাসের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়বে।

এইচআইভি আক্রান্তদের পুরুষাঙ্গ নিঃসৃত যৌনরসের মত এইচআইভি আক্রান্ত নারীদের যোনিপথে বিদ্যমান রস বা তরল নিঃসরণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ এইচআইভি থাকে। তবে তুলনামূলকভাবে যোনিরসের তুলনায় বীর্যে বিদ্যমান ভাইরাসের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে।

সুস্থ পুরুষের যৌনাঙ্গে বিদ্যমান আঁচড়, কাটা-ছেঁড়া, ঘা ইত্যাদি এইচআইভি সংক্রমণের জন্য সহজ পথ করে দেয়। যৌনবাহিত রোগের কারণে যৌনাঙ্গে তৈরি ফোস্কা, প্রদাহ এবং আলসারগুলো এইচআইভি দ্রুত সংক্রমণের সহজ ব্যবস্থা করে দেয়।

৮.৭.১ ইনজেকশনের সূঁচের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। এইচআইভি সংক্রমণের এটা একটা অন্যতম পথ।

৮.৭.২. নারীদের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে এইডস ছড়াবার ঝুঁকি কতটুকু?

যৌনসংযোগ ব্যতীত যে সমস্ত নারী এইচআইভি আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীর সংখ্যা খুব কম নয়। এছাড়া রয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে দুর্ঘটনাক্রমে এইডস ছড়াবার ঘটনা। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোতে আরও বাড়তি ঝুঁকি রয়েছে নবজাত শিশুর হসপিটাল ইনফেকশন-এর ক্ষেত্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা যায়, মেট্রোপলিটন এলাকাতে একসময় প্রতি হাজারে ২.৬ ভাগ শিশু এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এই হার মফঃস্বল অঞ্চলে ০.৩ ভাগ এবং গ্রাম্য এলাকায় ১.২ ভাগ, প্রতি হাজারে। অবশ্য এশীয়-আমেরিকান এবং সাদা চামড়ার মহিলাদের মধ্যে প্রতি দশ হাজারে ৩ ভাগ আক্রান্ত হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকাতে প্রতি দশ হাজারে আক্রান্ত হয়েছে ৭ ভাগ, আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি দশ হাজারে ৩৬ ভাগ আক্রান্ত।

৮.৭.৩. নারীর ক্ষেত্রে এই ঝুঁকির কারণ কী?

- অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ যৌনমিলন,
- ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণ,
- পেশাগত দুর্ঘটনা,
- অঙ্গ প্রতিস্থাপন,
- কৃত্রিম উপায়ে (artificial) গর্ভধারণ ইতাদি।

১৯৯০-এর শেষের দিক থেকে যেসব নারী বহুমুখি যৌনমিলনে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইনজেকশন ও অন্যান্য মাধ্যমে এইডস সংক্রমণ কমে আসছে।

যেসব কারণে নারীরা এ ধরনের অধিকতর ঝুঁকিতে পড়ছে–

- বহুমিলন,
- বিপজ্জনক যৌনসংযোগ,
- জন্মনিয়ন্ত্রণসহ নানা কারণে পায়ুপথে মিলন,
- যৌনরোগের কারণে যোনিপথে ঘা বা ক্ষত
- হারপেস, প্যাপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণ
- আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে নারীদের খাৎনা ও মিউটিলিশন (mutilation) বা যৌনাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করণ,
- ধর্ষণসহ বিভিন্ন রকম যৌননির্যাতন,

●শুকনো মিলন (Dry Sex) যা কি না যোনিপথে ক্ষত তৈরি করে ইত্যাদি।

৮.৮.১ কোন বিশেষ ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের (IDUs) ক্ষেত্রে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় কি না?

এক সময় ভাবা হয়েছিল এমালনাইট্রেট ও বুটালনাইট্রেট এইডসের একটি কারণ। এ সংক্রান্ত ভুল ধারণা এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা এই বইয়ের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

ইনজেকশনের মাধ্যমে হেরোইন, কোকেন, এমফেটামাইনসহ নানা ওষুধ ব্যবহার করে থাকে মাদকাসক্তরা। এই ওষুধগুলো সরাসরি এইডস সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি না করলেও এসব ওষুধের কারণে ব্যক্তিত্ব ও আচরণের পরিবর্তন বিপজ্জনক যৌনসংযোগের সম্ভাবনা তৈরি করে যা এইচআইভি সংক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া নেশাগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা স্টেরয়েড নেয় তাদের মধ্যে ইমিউনোসাপ্রেশন ঘটার কারণে এইডস-সহ ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসজনিত নানা রোগ সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। তবে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের জন্য মূল বিষয়টি হল দূষিত নিড্‌ল, যা একজনের শরীর থেকে আরেকজনের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে থাকে। এ ছাড়া নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীর সূঁচের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি ও সি সংক্রমণ হয়ে থাকে।

৮.৯.১ মেয়েদের খাৎনা এইচআইভি সংক্রমণের পথ সহজ করে দেয়?

মেয়েদের খাৎনা, ক্ষত সৃষ্টি করে এমন শুকনো মিলন, মাত্রাতিরিক্ত মিলন (Frequent Sex) এবং বহুগামিতাসহ বিভিন্ন যৌন অনাচার পরিহার করতে হবে। সাধারণত এসবের পরিপ্রেক্ষিতে যে ক্ষত ও পরিবেশ তৈরি হয় তা এইডস সংক্রমণে সহায়ক।

আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েদের ভগাঙ্কুর (Clitoris) কেটে ফেলে সতীত্ব রক্ষার নামে যৌনসংবেদনশীলতা কমিয়ে দেবার বর্বর রীতি প্রচলিত আছে। যৌনাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি করার এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনমূলক রীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

৮.১০.১. মুখের লালার (স্যালাইভা) মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় কি না :

মুখের লালায় (স্যালাইভা) সাধারণত ভাইরাসের পরিমাণ থাকে খুব কম। তবে মুখে বা দাঁতের গোড়ায় রক্তপাত হলে লালায় ভাইরাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া আক্রান্তের দেহের লালায় ভাইরাস ছাড়া এইচআইভি আক্রান্ত ইমিউন কোষ থাকতে পারে। সাধারণভাবে মুখের লালার মধ্যে ভাইরাস ও জীবাণু বিনাশী একটি

ক্ষমতা থাকে এবং এটি ভাইরাস বিরোধী ভূমিকা রাখে। এতে অনেক সময় ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।
এরপরও অনেক ক্ষেত্রে ভাইরাস ইমিউন কোষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মুখের ঘা, দাঁতের গোড়ায় সংক্রমণ, মাড়ির ক্ষত, দাঁতের গোড়াসহ মুখের যেকোন স্থান থেকে রক্তপাত আক্রান্তের দেহে ভাইরাস নিঃসরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

এইচআইভি আক্রান্তদের মুখের লালায় ভাইরাসের পরিমাণ বা সংখ্যা কম থাকাতে সাধারণত চুম্বন বা কৃত্রিম উপায়ে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার পদ্ধতির (Cardio Pulmonary Resuscitation ev CPR) মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে না। তবে ঠোঁটে ও মুখে ক্ষত, ঘা বা প্রদাহ থাকলে এইচআইভি ছড়াতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণের জন্য ভাইরাসের সংখ্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তবে কম পরিমাণ ভাইরাস থাকলেই যে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে না কিংবা কী পরিমাণ ভাইরাস থাকলে (মিনিমাম ডোজ) এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

লেখক মনে করেন, এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ভাইরাসের সংখ্যার সাথে সাথে ভাইরাল ভিরুলেন্সেরও (Virulence) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোন কোন এইচআইভি মিউটেট এতটা ভয়ঙ্কর (Virulent) হয়ে থাকে যে, এটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দ্রুত সময়ে এইডসের লক্ষণ তৈরি করতে পারে এবং মৃত্যুও তাড়াতাড়ি ঘটাতে পারে।

ভাইরাসের সংখ্যা এবং ভিরুলেন্স যেমন এইচআইভি সংক্রমণের জন্য একটি শর্ত হিসাবে কাজ করে, তেমনি শরীরের ইমিউন কোষের সিডি-৪ আবরণের সাথে ভাইরাসের সংযোগ রোগ সংক্রমণের জন্য একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। এ কারণে সরাসরি রক্তের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে সংক্রমণ ঘটে।

এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত ৩০ ভাগ মানুষের দেহে রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। অক্ষত ও সুস্থ ঠোঁটে ইমিউন কোষের সংখ্যা কম থাকায় এর মাধ্যমে ভাইরাসের সংক্রমণ কম ঘটে। আবার যোনিপথে ও পায়ুপথে রক্ত সরবরাহ বেশি থাকায় এবং ইমিউন কোষের সংখ্যা বেশি থাকায় ওসব পথে ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি হয়ে থকে।

৮.১০.২. ধূমপান এবং মদ্যপান এইচআইভি সংক্রমণে কতটুকু ভূমিকা রাখে?

ধূমপান এবং মদ্যপান এইচআইভি বিস্তারে সহায়ক ভুমিকা পালন করে এবং এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মদ্যপান যৌন আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে আচরণগত সমস্যা তৈরি করে বিপজ্জনক যৌনসংযোগের দিকে ঠেলে তো দেয়ই, সেই সাথে এ অভ্যাস ইমিউন ব্যবস্থাকে আঘাত করে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

ধূমপানের কারণে কার্বোক্সিমেথ (meth) হেমোগ্লোবিন বেড়ে যাবার কারণে বিভিন্ন টিস্যুতে অক্সিজেন পরিসঞ্চালন বা পারফিউশন এমনিতেই কমে আসে এবং রোগ নিরাময় ও সুস্থ কোষ তৈরির প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া এ অভ্যাস ফুসফুসের প্রদাহ সৃষ্টি করার সাথে সাথে নিউমোনিয়াসহ নানাবিধ অসুখ নিরাময়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

অ্যালকহল শরীরের রক্তবাহী শিরাগুলোকে ফুলিয়ে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা যেমন বাড়ায়, তেমনি রোগ নিরাময়ে প্রয়োগকৃত ওষুধের সাথে বিক্রিয়া করে ওষুধের কার্যকারিতা কমায়।

৮.১১.১. যে সব কারণে মদ এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থ এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় :

- নেশাগ্রস্ত হবার পর একজন এমন বেপোয়ারা যৌনসংযোগে লিপ্ত হয় যে নিজের নিরাপত্তা বিস্মৃত হয়।
- যারা নেশা করে তাদের এমন চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তারা অসতর্ক এবং বেপরোয়া হয়ে থাকে।
- নেশার কারণে এমন সব যৌনক্রিয়ার সম্পৃক্ত হয় যাতে সাধারণত একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি সম্পৃক্ত হয় না।
- যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে তাদের মধ্যে এমনিতেই রক্তবাহিত এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

এইচআইভি আক্রান্তরা যৌনমিলন ছাড়াও রক্তদান প্রক্রিয়ায় মাধ্যমেও এইডস ছড়িয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বে নেশাগ্রস্তরা সাধারণত রক্ত বিক্রি করে থাকে।

৮.১২.১. মহিলাদের মাসিককালীন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু?

মাসিকের সময় যৌনসংযোগের ফলে পুরুষ থেকে নারীর দেহে নানাবিধ জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ প্রক্রিয়ায় এইডস সংক্রমণের বিষয়টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এসময় মিলনের ফলে এইচআইভি আক্রান্ত নারী থেকে পুরুষদের দেহে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বহু অংশে বৃদ্ধি পায়।

মহিলাদের মাসিক সংক্রান্ত কিছু সমস্যা যেমন এইচআইভি আক্রান্তদের প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারে, তেমনি এইচআইভি সংক্রমণের কারণেই প্রজনন হরমোন চক্র বা এ্যাক্সিসে বিপত্তি ঘটে থাকে এটাও সত্যি। একারণে এদের মধ্যে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া (Amenorrhoea), মাসিক কমে যাওয়া (Oligomenorrhoea) ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে রোগীর অস্বস্তি ও অসুবিধার সাথে সাথে একদিকে যেমন আক্রান্তদের মা হওয়ার সময় নির্বাচন

করা সম্ভব হয় না, তেমনি অসময়ে রক্ত ঝরার কারণে যৌনমিলনের ক্ষেত্রেও এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

৮.১৩.১. এইচআইভি প্রতিরোধে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির ভূমিকা কিরকম?

অনেক নারী ভুলবশতঃ এইডস ও যৌনরোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি সেবন করে। এতে কোন লাভ তো হয়ই না, বরং অনেক সময় এটি পুরুষ থেকে নারীতে এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (সূত্র- HIV Infection in Women; Lora A Warth)

জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (PID) কমিয়ে এবং মাসিক নিয়ন্ত্রণ করে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কিছুটা কমায়, সেই সাথে যোনিপথ ও সারভিক্সের মিউকোসার ঘনত্ব বাড়িয়েও এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রোগের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্যদিকে সারভাইক্যাল একটোপি (Ectopy) তৈরি করে কোষ পরিবাহিত প্রতিক্রিয়া (Cell mediated response) কমিয়ে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ায় এবং রোগের অবনতিও ঘটায়।

৮.১৪.১. দৃশ্যমানভাবে এইডসের কোন লক্ষণ নেই, অথচ এইচআইভি পজিটিভ– এমন ব্যক্তি এইডস ছড়ায় কি?

এমন প্রশ্ন অনেকেই করে। অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্ত হবার পর তার লক্ষণ প্রকাশিত হতে কয়েক বছর লেগে যায়। এসময় তারা নীরবে রোগ ছড়ায়, বিশেষ করে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এবং রোগের শেষ পর্যায়ে রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৮.১৪.২. এইডসের লক্ষণবিহীন একজন পুরুষ তার সঙ্গীকে আক্রান্ত করতে পারে কি?

পুরুষের শরীর থেকে নারী দেহে এইচআইভি সংক্রমণের জন্য আক্রান্ত পুরুষের দেহে এইডসের লক্ষণ দেখা দিতেই হবে এমন কথা নেই; বরং এইডসের লক্ষণ দেখা দেবার পূর্বেও একজন পুরুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করতে পারে।

একজনের শরীরে এইচআইভি আছে কি না তা জানবার প্রকৃত উপায় হল রক্ত পরীক্ষা করা। এটি সবসময় সম্ভব না হবার কারণেই অজানা-অচেনা সঙ্গী বা নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা অতি আবশ্যক।

৮.১৪.৩. একবার মাত্র যৌনসংযোগ হলেই এইচআইভি সংক্রমিত হবে?

পায়ুপথে সংযোগের মাত্রার সাথে এইচআইভি সংক্রমণের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা নারীর সাথে বার বার মিলনের পরেও অনেকে এইচআইভি'তে আক্রান্ত হয়

না। আবার এটাও ঠিক যে, অনেকে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একবার মিলনের পরেই এইচআইভি'তে আক্রান্ত হয়েছে।

৮.১৪.৪. এইচআইভি আক্রান্তের সঙ্গে মিলিত হলেই নিশ্চিতভাবে রোগ সংক্রমিত হবে?

এইচআইভি আক্রান্ত সঙ্গীর সাথে মিলিত হলে ১০০ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমিত হবেই- এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ম্যাজিক জনসন পরিবার। কেন একজন নারী এইচআইভি আক্রান্তের সঙ্গে মেলামেশার পরেও ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না সেটি আরও বিশদ গবেষণার বিষয় হলেও এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

ব্যক্তিগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়াও যৌনসঙ্গীর দেহে বিদ্যমান ভাইরাসের প্রকৃতি ও পরিমাণটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থা ও শেষ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি যতটা ভাইরাস ছড়ায়, রোগের মধ্যবর্তী অবস্থায় ততটা ভাইরাস নিঃসৃত হয় না। এছাড়া যোনিপথে কাটা-ছেঁড়া, ঘা, বিভিন্ন যৌনরোগের উপস্থিতি এবং মিউকাস আবরণের পুরুত্বসহ কো-ফ্যাক্টরগুলো এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এরপরও এমন একজনকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, যাকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে এইচআইভি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বলা যাবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যৌনসংযোগের ক্ষেত্রে পুরুষের শরীর থেকে নারীদেহে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত হতে পারে। এর কারণ, বীর্যে বিদ্যমান ভাইরাল ডোজ। এর অর্থ এই নয় যে, এইচআইভি আক্রান্ত নারী থেকে পুরুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়টি কোন গৌণ ব্যাপার।

৮.১৪.৫. জীবনের প্রথম মিলনেই একজন এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে কি?

কনডম ছাড়া বিপজ্জনক যৌনমিলনের কারণে একজন জীবনের প্রথম মিলনেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। একারণে বহুগামিতাকে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এইচআইভি সংক্রমণের অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোকে আড়াল করা বিপজ্জনক বিষয় বলে বিবেচিত হবে।

যৌনাঙ্গ ও পুরুষাঙ্গে কাটা-ছেঁড়া, ক্ষত বা যৌনরোগ বিহীন কারও সঙ্গে মিলনেও এইচআইভি সংক্রমণ হয়ে থাকে। কেননা ভাইরাস মিউকাস আবরণ দ্বারা যোনিপথে শোষিত হতে পারে। তাই প্রতিটি বিপজ্জনক যৌনসংযোগের ক্ষেত্রে যৌন সুরক্ষা অবলম্বন করা অতি আবশ্যক।

৮.১৫.১. অজ্ঞাত ফ্যাক্টর (Unknown factor) :

অনেক গবেষকই অন্ত্র ও মলদ্বার থেকে নিঃসৃত এমন একটি অপরিচিত বস্তু এবং কার্যক্রমের কথা ভাবছেন যা সহজে ইমিউন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটায় এবং সমকামীদের ক্ষেত্রে সক্রিয় সঙ্গীসহ তাদের স্ত্রী সঙ্গীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

লেখক 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফ্যাকশাস ডিজিজ ইনস্টিটিউটের এইডস ডিভিশনের রিভিউ কমিটি'তে প্রদত্ত এক গবেষণা পত্রে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে বিশেষ ধরনের ইকোলাই ও ইস্ট অন্ত্রে ক্যান্সার উদ্দীপক ভূমিকা পালনের সাথে সাথে এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। বিশেষ করে যাদের খাৎনা করা হয়নি তাদের বাড়তি চামড়ার নিচে এবং মহিলাদের অপরিচ্ছন্ন যোনিপথে এসব মাইক্রোবের অবস্থান গ্রহণ এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। ইস্ট কর্তৃক সৃষ্ট মাইক্রো লেভেল ইউভি (U.V) রেডিয়েশন মিউটেশন সহায়ক ও ক্যান্সার উদ্দীপকও বটে। সম্ভবত একারণেই সমকামীদের মাধ্যমে এইডস সংক্রমণ অধিক হারে ঘটে থাকে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী প্যাটার্ন-২ দেশসমূহের সেইসব নাগরিকের মধ্যে এইডস সংক্রমণ বেশি দেখা যাচ্ছে যারা কি না সমকামী। সাধারণভাবে প্যাটার্ন-২ দেশসমূহের নাগরিকদের সাথে যারা মেলামেশা করবে তাদের এইচআইভি স্ক্রিনিং করা নৈতিক কারণেই প্রায় বাধ্যতামূলক। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আইনে এ ধরনের সকল অভিবাসীর জন্য এইচআইভি স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মানবাধিকারকর্মীরা এর বিরোধিতা করলেও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য এটি অবশ্য করণীয়।

৮.১৬.১. ধর্ষণ, পাচার এবং নারী দাসত্বের সঙ্গে এইডসের সম্পর্ক

আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ঘন ঘন জাতিগত সংঘাত ও যুদ্ধ এইডস বিস্তারের একটি কারণ। এসব যুদ্ধে ধর্ষণকে জাতিগত নিপীড়ন এবং শত্রু উৎখাতের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করায় এইডসের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। গণধর্ষণ প্রক্রিয়া ছাড়া সাধারণ ধর্ষণেও এইডস সংক্রমণের একটি বড় ধরনের সম্ভাবনা থাকে। কেননা সাধারণত ধর্ষণকামীরা নেশাগ্রহণকারী এবং বিপজ্জনক যৌনচরিত্রের হয়ে থাকে। এদের ব্যাপক অপরাধমূলক যৌন অভিজ্ঞতাও থাকে। এ ধরনের অপরাধীরা জেলখানায় অন্তরীণ হয়েও এইডস ছড়াতে পারে। অপরাধীদের মধ্যে বেশ্যালয়ে গমনের ইতিহাস এবং নেশাগ্রহণ প্রবণতা খুব সাধারণভাবে দৃশ্যমান হয়।

৮.১৭.১. অন্যান্য ঝুঁকি :

এছাড়া যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাগ্রহণ করছে তাদেরকে শনাক্ত করে নিখরচায় এইচআইভি স্ক্রিনিং করতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবীদেরকে সাময়িকভাবে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে নেশা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার সাথে সাথে ব্যবহৃত সূঁচ পরিত্যাগের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সেই সাথে সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও বর্জ্য নিরাপদ পদ্ধতিতে ধ্বংস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মরফিন, পেথিডিনসহ নানা ধরনের মাদক ও নেশার ইনজেকশন বিক্রয়ের ওপর কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সেই সাথে সকল যৌনবাহিত রোগী, রক্তদাতা, সমকামী, বিদেশী শ্রমিক ও কর্মীদের এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

অধ্যায় ৯

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি

৯.১.১ পেশাগত কারণে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু?

এই সম্ভাবনার একটি চিত্র পাওয়া যাবে সিডিসি'র এক রিপোর্টে। ১৯৯৮ সনে প্রমাণসহ এ ধরনের ৫৪টি কেস পাওয়া যায়, যেখানে পেশাগত বিপত্তির কারণে এইচআইভি'র সংক্রমণ ঘটেছে। এছাড়া আরও ১৩৪ জন সম্ভাব্য রোগী পাওয়া যায় যারা ১৯৮৫ সনের পরে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার কালে এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। সূঁচের ফুটোতে কিংবা ছুরির খোঁচাজনিত অতি ছোট ক্ষত এইচআইভি সংক্রমিতের রক্তের সংস্পর্শে এলে বিপদ হতে পারে। তবে পরিসংখ্যানে এ সম্ভাবনাটি ০.৩ ভাগ অর্থাৎ প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে তিনজনের ক্ষেত্রে এভাবে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত দুর্ঘটনাক্রমে লেগে যেতে পারে চিকিৎসাকর্মীদের চোখে, নাকে অথবা মুখে। এ ধরনের দুর্ঘটনার হার ০.১ ভাগ অর্থাৎ প্রতি হাজারে একজন। ল্যাবে পিপেটিংসহ নানা কাজে, অপারেশন চলাকালে, এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের ডেলিভারিসহ বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

৯.২.১. সংক্রমিত রক্ত চিকিৎসাকর্মীদের ত্বকের সংস্পর্শে আসলে কী হতে পারে?

অল্প পরিমাণ রক্ত যদি অক্ষত ত্বকে লেগে যায় তাতে রোগ সংক্রমণের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কয়েক ফোঁটা রক্ত ত্বকে লেগে যাবার ফলে রোগের সংক্রমণ হয়েছে এমন প্রমাণ কোথাও নেই। তবে ত্বকে যদি কোন ক্ষত থাকে অথবা ইদানিংকালে ঘটে যাওয়া কোন কাঁটা ছেঁড়া থাকে, তাহলে এইচআইভি সংক্রমণের একটা সম্ভাবনা থাকে।

এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর বেশ খানিকটা রক্ত যখন চিকিৎসাকর্মীর ত্বকের একটি বড় স্থানকে আবৃত করে অথবা কয়েক ঘণ্টাব্যাপী লেগে থাকে, তখন এইচআইভি সংক্রমণের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ০.১ ভাগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতি হাজারে একজনের এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে।

৯.২.২. এইচআইভি আক্রান্তের রক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর চোখে, মুখে, নাকে লেগে গেলে কী করতে হবে?

- নাক, মুখ, ত্বক প্রথমে পানির ঝাপটা বা পিচকারী দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- চোখে বিশুদ্ধ পানি অথবা স্যালাইন ইরিগেশন করতে হবে।
- ত্বকের যেখানটায় ফুটো হয়ে যাবে বা কেটে যাবে তৎক্ষণাৎ সে স্থানটি সাবান পানি দিয়ে রগড়িয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৯.২.৩. এন্টিসেপটিক দিলে অথবা রক্ত ঝরিয়ে ফেললে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে কি?

এ প্রসঙ্গে লেখক মনে করেন, ক্ষতস্থানে আয়োডিন অথবা ভাইরিসাইডাল প্রয়োগ করলে নিশ্চিত লাভ না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। পোভিডন-আয়োডিন (০.৫% আয়োডিন) সাধারণ ইনফেকশনগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে।

৯.৩.১. ভুলে বা দুর্ঘটনাক্রমে কোন এইডস আক্রান্তের সঙ্গে সংযোগ ঘটে গেলে কিছু করার আছে কি?

হ্যাঁ, আছে। সিডিসি এসব ক্ষেত্রে পিইপি (Post exposure prophylaxis) নামক একটি পদ্ধতির কথা বলেছে। এতে জিডোভুডিনসহ অন্যান্য এন্টি-এইচআইভি ড্রাগ প্রদান করা হয় যৌনসংযোগের ৭২ ঘন্টার মধ্যে। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে বলেছে সেই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রে যারা দুর্ঘটনাক্রমে এইডস আক্রান্তের সূঁচ বা রক্ত থেকে আক্রান্ত হয়। রক্তবাহিত এইচআইভি সংক্রমণ ছাড়াও ধর্ষণজনিত যৌনসংযোগ বা দুর্ঘটনাজনিত মেলামেশার ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবার একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হল পিইপি।

৯.৩.২. এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে আর কী করতে হবে?

দুর্ঘটনার সাথে সাথে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে জানাতে হবে, বিশেষ করে এইডস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এই কারণে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি দেয়া যেতে পারে তা তারাই নির্ধারণ করবে। এটা যত তাড়াতাড়ি দেয়া যায় ততই ভাল।

অনেক এইডস রোগী হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত থেকে থাকে। তাই এই সমস্ত দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যকর্মীর রক্তে হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাসের সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে। যারা বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের মধ্যে ইনফেকশনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আর যারা ভ্যাকসিন নেননি তাদের মধ্যে সূঁচ ও দুর্ঘটনাজনিত সার্জিক্যাল ক্ষতের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণের

সম্ভাবনা ছয় থেকে ত্রিশ ভাগ। যাদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি সারফেস এন্টিজেনের সাথে হেপাটাইটিস-ই (HBe Ag) বিদ্যমান তারা অধিক সংখ্যায় বি ভাইরাস ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

৯.৪.১. হেপাটাইটিস-সি (HCV) সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু?

হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস (HCV) সংক্রমণের ওপরে ব্যাপক কাজ হয়নি। তবে সিডিসি'র একটি স্টাডি থেকে জানা যায় যারা হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসে আক্রান্ত থাকবে তাদের রক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে বিদ্যমান কাটা ছেঁড়ায় লেগে গেলে ১.৮ ভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই স্টাডিটি অকুপেশনাল এক্সপোজার-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, অকুপেশনাল এক্সপোজার বাস্ত বক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষাভেদী দুর্ঘটনা। এ ধরনের রক্তের (সি ভাইরাসে আক্রান্ত) ছিটে ফোঁটা কিংবা ঝাপটাও যদি ত্বকে লেগে যায় তাহলে রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা কম হলেও থেকে যায়। এভাবে রোগ সংক্রমণের বেশকিছু প্রমাণ রয়েছে।

৯.৫.১. এ ধরনের পেশাগত দুর্ঘটনা এড়াবার পথ কী?

পানি জাতীয় পদার্থ প্রতিরোধ করতে পারে এমন মাস্ক, টুপি, গাউন ব্যবহার করা উচিত প্রতিটি চিকিৎসাকর্মীকে। সেই সাথে গ্লাভস, চশমা এবং জুতোর কভার ব্যবহার করা উচিত। এতে চোখ, নাক, মুখ ও ত্বককে বাঁচানো সম্ভব।

ব্যবহৃত সূঁচগুলোকে রিক্যাপিং (recapping) না করে সরাসরি ধ্বংস করা এবং নিরাপদ ধ্বংস বা ডিসপোজাল পদ্ধতি অনুযায়ী একত্রিত করে ধ্বংস করা প্রয়োজন। মেডিক্যাল ডিভাইসগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

৯.৬.১. দুর্ঘটনা থেকে প্রতিরক্ষার জন্য পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি:

দুর্ঘটনার পর উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা নিতে হবে। এর পর পরই রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে বিভিন্ন সংক্রমণের অবস্থা বা স্ট্যাটাস জেনে নিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীর রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে এবং পিইপি গ্রহণ করতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করে হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাসের ইমিউনিটি সংক্রান্ত অবস্থা জেনে নিতে হবে। বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেয়া থাকলেও ভ্যাকসিন সম্পর্কিত ইমিউনিটি জানতে হবে। এমনিতেও বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেয়ার এক থেকে দুই মাস পরে টেস্ট করে এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন ভ্যাকসিনটি বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরি করেছে কি না।

এইচআইভি সংক্রান্ত পিইপি নেবার আগে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানানো বেশ প্রয়োজন। পিইপি প্রয়োগকালে হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ প্রতিরোধে হেপাটাইটিস-বি ইমিউনোগ্লোবিউলিন (globulin) প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটা হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে এটা প্রয়োগের পূর্বে রক্তে হেপাটাইটিস-বি সারফেস এন্টিজেনের উপস্থিতি,

ভ্যাকসিন সংক্রান্ত ইমিউনিটি ইত্যাদি বিষয়গুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

এমন কোন ভ্যাকসিন তৈরি হয়নি যা কি না হেপাটাইটিস-সি প্রতিরোধ করতে পারবে। এমন কোন চিকিৎসাও নেই যা এটা রোধ করতে পারবে। এ রোগে ইমিউনোগ্লাবিউলিন প্রয়োগ করে কোন ফল হবেনা। অতএব দুর্ঘটনার পর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কিছু করণীয় নেই।

৯.৬.২. পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি-এ আর কী করা যায়?

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন না দেয়া থাকলে যেকোন দুর্ঘটনায় ভ্যাকসিন দিয়ে নেয়া ভাল। হেপাটাইটিস-বি ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে রোগী বা সোর্সের সংক্রমণের অবস্থাটা পর্যালোচনায় আনা যেতে পারে।

৯.৬.৩. যাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হয় তাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর কী কী ওষুধ দিতে হবে?

সাধারণত চার সপ্তাহের জন্য জিডোভুডিন ও ল্যামিভুডিন (Lamivudine) ওষুধ দুটো দেয়া হয় দুর্ঘটনার পর পরই। তবে যেখানে দুর্ঘটনা ব্যাপক হয়, অর্থাৎ অনেক রক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অথবা রোগীর রক্তে বিদ্যমান ভাইরাসটি এইচআইভি ড্রাগ রেজিসস্ট্যান্স, সেক্ষেত্রে জিডোভুডিন ও ল্যামিভুডিনের সাথে একটি প্রোটিয়াস ইনহিবিটর যোগ করা প্রয়োজন। প্রোটিয়াস ইনহিবিটরগুলোর মধ্যে ইন্ডিনাভির (Indinavir) অথবা নেলফিনাভির (Nelfinavir) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তবে ক্লিনিশিয়ান ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে উপস্থিত নানা জটিলতা মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সাথে ওষুধের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা মাথায় রাখতে হবে।

৯.৬.৪. পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট নেবার সময়সীমা কতটুকু?

এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুত কয়েকঘন্টার মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। দুর্ঘটনার পর দিন গড়াতে না দেয়াই ভাল। জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, চব্বিশ থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরে ওষুধ প্রয়োগ করলে সংক্রমণ আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে। অবশ্য মানুষের মধ্যে পরিচালিত কোন পরীক্ষার ফলাফল আমাদের জানা নেই। এসব কারণে মানুষের মধ্যে এক থেকে দুই সপ্তাহের পরেও এ ধরনের পিইপি দেয়া হয় এই কারণে যে, এতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ না করা গেলেও রোগের তীব্রতা হ্রাস করে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

এইডস সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট বা পিইপি আমেরিকার চিকিৎসকরা অনুমোদন করলেও এফডিএ এখনও এটা অনুমোদন করেনি। তবে আইনের দৃষ্টিতে চিকিৎসক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করে এমন ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন যা রোগীর জীবন রক্ষা

করতে পারে। (সূত্র: ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস; সিডিসি)।

৯.৬.৫. পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত ওষুধগুলো কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে?

সাধারণত জিডোভুডিন বমি বমি ভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, দুর্বলতা, মাথাব্যথা ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট হেপাটাইটিস-বি, রক্তশূন্যতা, রক্তের কোষ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাসহ কিডনিতে পাথর তৈরি করতে পারে। প্রোটিয়াস ইনহিবিটরগুলোর মধ্যে ইন্ডিনাভির অথবা নেলফিনাভির গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া করে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন অথবা ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রয়োগকালে যদি দেখা যায় যে, আক্রান্ত মহিলা মা হতে যাচ্ছেন অথবা শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছেন সেক্ষেত্রেও ওষুধ প্রয়োগে কোন বাধা নেই। বরং এটা তাকে এবং তার শিশুকে সুরক্ষা দেবে। এই ভ্যাকসিনে ভ্রুণের কোন ক্ষতি সাধন হয় না। (সূত্র : ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস; সিডিসি)।

তবে এইডসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মায়েদের ওষুধ গ্রহণের পূর্বে সহস্রবার ভাবতে হবে। এইচআইভি সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় যারা জড়িয়ে পড়বে তাদের একটি বেজলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি এন্টিবডি নির্ণয় ছাড়াও ছ'সপ্তাহের মাথায়, বারো সপ্তাহের মাথায় এবং ছ'মাস পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ হয়েছে কি না। দুর্ঘটনার পরে হঠাৎ করে ফ্লু'র মত অসুখ হলে বিশেষ করে জ্বর, গা ব্যথা, গায়ে লাল লাল চাকা, দুর্বলতা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে ধরে নিতে হবে যে এমন একটি অসুখ হয়েছে যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এটা হতে পারে এইডস, ড্রাগ রিয়্যাকশন অথবা অন্য কোন অসুখ। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে প্রকৃত অসুখটি।

ছয় থেকে বারো সপ্তাহ পরে যে মুহূর্তে রোগের লক্ষণ দেখা দেবে সেই মুহূর্ত থেকেই কিছু বিধি নিষেধ মানতে হবে। এর মধ্যে প্রথম হল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও যৌনসংযোগ পরিহার করা। এরপর হল রক্ত দানে রাজি না হওয়া। আর শরীরের টিস্যু, অর্গান, বীর্য এগুলো দানের তো প্রশ্নই ওঠে না।

৯.৬.৬. এ অবস্থায় মায়েরা কী করবে?

মায়েরা শিশুদের স্তনদান একেবারেই বন্ধ করে দেবে। এটি হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত মায়েদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য।

৯.৭.১. ডেন্টিস্টদের নিকট থেকে এইচআইভি রোগের সংক্রমণ হতে পারে কী?

এইচআইভি আক্রান্ত ডেন্টিস্টদের নিকট থেকে রোগীরা আক্রান্ত হবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। আমেরিকার ফ্লোরিডাতে একবার দু'জন রোগী একজন ডেন্টিস্ট মারফত সংক্রমিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এ

প্রেক্ষাপটে ফরেনসিক তদন্তের পর দেখা যায় যে, ডেন্টিস্টের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তার নিজের রক্তে সিক্ত ছিল। ঘটনাটি দুর্ঘটনাক্রমে, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছিল তা প্রমাণিত হয়নি। তবে সাধারণভাবে যে সমস্ত সুরক্ষা পদ্ধতি একজন ডেন্টিস্টের মেনে চলা উচিত তা অনুসরণ করলে ডেন্টিস্ট মারফত এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

৯.৮.১. অন্যান্য ঝুঁকি :

এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর রক্ত দ্বারা যন্ত্রপাতি দুষিত থাকলে এইডস ছড়াতে পারে। তবে যন্ত্রপাতি ডিটারজেন্ট দ্বারা ধুলে এবং তাপ প্রয়োগে স্টেরিলাইজেশন করলে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে না। এটা সকল সার্জিক্যাল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধারালো যে সমস্ত যন্ত্রপাতিতে তাপ প্রয়োগ করা যায়না সেগুলো ডিটারজেন্ট দ্বারা পরিষ্কার করে ক্লোরিনযুক্ত পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ডিসপোজেবল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সার্জিক্যাল ব্লেডগুলো কখনই পুনঃব্যবহার করা উচিত নয়।

আর যেসব চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ সম্ভব তার মধ্যে অন্যতম হল কিডনি ডায়ালাইসিস। একারণে ডায়ালাইসিস যন্ত্রপাতি রোগীর জন্য ব্যবহারের পর পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া যারা রোগীর শরীরাভ্যন্তরে হাত বা আঙ্গুল ব্যবহার করবে কিংবা রোগীর রক্তের সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজ করবে তাদের সবাই ল্যাটেক্স গ্ল্যাভস ব্যবহার করবে। যে সমস্ত চিকিৎসক এবং সেবাকর্মী এইডস আক্রান্ত তারা এমন কোন কাজে হাত দেবে না যা এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

৯.৯. অন্যান্য সেবাকর্মীদের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি

৯.৯.১. যারা সেলুন ও পার্লারে কাজ করে এইডস থেকে বাঁচতে তারা কী করবে?

এইডস আক্রান্তদের কাছাকাছি আসবার কারণে নাপিত, হেয়ার ড্রেসার, মালিশ প্রদানকারী এ রকম পেশাদারদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ ঘটেছে কিংবা পেশাগত সেবা দানকালে রোগের সংক্রমণ ঘটেছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আবার এইডস আক্রান্ত কর্মীর হাতের ছোঁয়ায় কোন গ্রাহক এইডস আক্রান্ত হয়েছে এটাও দেখা যায়নি। এইচআইভি সংক্রমণের জন্য সবসময় কাটা ছেঁড়া ত্বকসহ মিউকাস আবরণের সাথে দুষিত রক্ত অথবা তরল নিঃসরণের (secration) সংযোগ প্রয়োজন। অক্ষত ত্বকের মাধ্যমে এইডস সংক্রমণ কখনই ঘটে না।

এসব কারণে পেশাদারদের যেসব সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। হাতের বা ত্বকের কোন স্থান থেকে যখন কষ বেরুবে অথবা শরীরে দগদগে ঘা থাকবে তখন গ্রাহক এবং কর্মীর মধ্যে যোগাযোগ না ঘটাই ভাল। প্রতিটি গ্রাহককে

সেবা দেয়ার আগে এবং পরে ভাল করে হাত ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন।

সেলুনে চুল কাটা ও সেভ করার সময় নিশ্চিত হতে হবে যে ব্লেডটি নতুন। ব্যবহৃত ব্লেড ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে। ডিসপোজেবল ব্লেড ব্যবহার করতে হবে। ক্ষুর জাতীয় কিছু ব্যবহারের আগে আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কাঁচিসহ অন্যান্য ধারালো অস্ত্রগুলো যথাযথ নিয়মে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

উল্কি দেবার সূঁচ, তারের ব্রাশ, কান ফুটো করার ও আকুপাংচার করার যন্ত্র ইত্যাদিও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্টেরিলাইজেশন করা প্রয়োজন। ব্যবহার করার পর এগুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং কেমিক্যালসে ডুবিয়ে অথবা ড্রাই হিটের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যেগুলো ফেলে দেয়া সম্ভব, সেগুলো ফেলে দিতে হবে– বিশেষ করে যেগুলোর সাথে রক্তের সংযোগ ঘটে।

কেমিক্যালসের মধ্যে ক্লোরিন পানি এবং কনসেন্ট্রেটেড আয়োডিন ভাল জীবাণুনাশক। ড্রাই হিট ওভেনে অথবা অটোক্লেভ যন্ত্রের সাহায্যে আকুপাংচার ও উল্কির সূঁচগুলোকে জীবাণুমুক্ত করা যেতে পারে। ফুটিয়ে নিয়েও এইচআইভি ভাইরাসকে সহজে মেরে ফেলা যায়। তবে ক্লষ্ট্রিডিয়াম-এর মত কোন কোন জীবাণু উচ্চ তাপ ছাড়া নিশ্চিহ্ন হয় না। ১২১° সেন্টিগ্রেডের উপর তাপমাত্রায় এটি নিষ্ক্রিয় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ব্যবহারের পর ফেলে দেয়া হবে এমন জিনিসগুলোকে সবসময় নিশ্চিদ্র ডিসপোজাল ব্যাগে ভরে নিরাপদ স্থানে ফেলা উচিত। সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করা উচিত যেন তা কারও নাগালের মধ্যে না আসে এবং পুনঃব্যবহৃত না হয়।

অধ্যায় দশ

এইডস প্রতিরোধ

১০.১.১. নিরাপদ যৌনজীবন : কনডম ব্যবহার ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা

জানা থাকা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ ও এইডস সংক্রমণ একই সুতোয় বাঁধা। এ ক্ষেত্রে এইডস থেকে প্রতিরক্ষা পাবার জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিতে হবে। যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌনজীবন যাপন হল এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধের মূলমন্ত্র। যে কোন ধরনের যৌনরোগ হলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এইচআইভি স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া এইডস থেকে বাঁচার পূর্বশর্ত।

এইচআইভি পজিটিভদের জন্য আলাদা ও বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেখানে ল্যাব

সুবিধা নেই সেখানে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট বা লক্ষণ-উপসর্গ ভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর চিকিৎসা চালাতে হবে।

এইচআইভি ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সকল ধরনের যৌনমিলন পরিহার এবং আক্রান্তদের সঙ্গীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অনেক ক্ষেত্রে এইডস রোগের সাথে অন্যান্য যৌনরোগের সহাবস্থান থাকে। তাই এসব রোগের উপস্থিতিতে এইচআইভি স্ক্রিনিং করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এইডস রোগাক্রান্তরা সরাসরি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। তাই এ রোগের লক্ষণগুলো এবং এ রোগ হলে সম্ভাব্য যেসব সংক্রমণ হয় তা জানা ও জানানো অতি জরুরি।

১০.১.২. কাদের জন্য কনডম ব্যবহার বাধ্যতামূলক?

- যখনই একজন অজানা কারও সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হবে কিংবা এমন কারও সাথে মেলামেশা করবে যার নীরোগ অবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবার মিলনের পূর্বে সতর্কতার সঙ্গে একটি নতুন কনডম ব্যবহার করতে হবে।
- সিডিসি'র একটি জরিপে দেখা গেছে ৩১ ভাগ ক্ষেত্রে ছিঁড়ে যাওয়া, ফেটে যাওয়া, ফুটো থাকা, নিম্নমানের হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে কনডম অকার্যকর হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এফডিএ দাবী করে যে, তাদের অনুমোদিত ইলেক্ট্রোনিক্যালি টেস্টেড কনডমগুলো সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা পাওয়া যাবে। অন্য একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, সাধারণভাবে কনডম ৬৯ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি ইনফেকশন রোধ করতে পারে।
- যে পরিবারের একজন সেরোডিসকর্ডেন্ট অর্থাৎ যেখানে যৌনসঙ্গীদের একজন এইচআইভি পজিটিভ এবং অন্যজন নেগেটিভ সেক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

১০.১.৩. কনডম ব্যবহারে যে নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত :

- প্রতিবার মিলনের ক্ষেত্রে (ওরাল, পায়ুপথ কিংবা যোনিপথ) নতুন কনডম ব্যবহার করতে হবে।
- সতর্কতার সাথে কনডম ব্যবহার করতে হবে যাতে নখের আগা, দাঁত বা অন্য কোন ধারালো কিছুর সাথে লেগে এটা ছিঁড়ে বা ফেটে না যায়।
- এটা পরতে হবে মিলনের আগে এবং কোনরকম সংযোগের পূর্বে।
- ওয়াটার বেজড লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করলে সাধারণত কনডমের কোন ক্ষতি হয় না। তবে পেট্রোলিয়াম জেলি, বডিলোশন, খাবার তেল ইত্যাদি ব্যবহার করলে কনডমের ল্যাটেক্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- কনডম খুলবার সময় গোড়া চেপে ধরে সম্পূর্ণটা সাবধানে খুলতে হবে যাতে এটা শরীরের সাথে সংস্পর্শে না আসে।
- তবে এ ব্যবস্থার বিকল্প হল ফিমেল কনডম। এর একটি নাম রয়েছে– রিয়ালিটি (Reality)। এটি পলিইউরেথিন শিটে তৈরি লুব্রিকেন্টযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা। এর দু'পাশে লাগানো থাকে দুটি রিং। এটি একটি মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার যা কি না মেয়েদেরকে এইচআইভি ও যৌনরোগ থেকে প্রতিরক্ষা দিতে পারে।
- সার্ভিক্যাল ক্যাপ ও ডায়াফ্রাম আংশিক প্রতিরক্ষা দেয়। আমাদের মতো দেশে যেখানে যৌনকর্মীদের মানবাধিকার নেই, প্রতিরোধের ভাষা নেই, সেখানে এ ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে ভাইরাসনাশক ওষুধ এবং ইমিউন রেসপন্স মডিফাই করতে পারে এমন ওষুধ ব্যবহারের পরার্মশ দিচ্ছেন লেখক। এক্ষেত্রে যোনিপথে ঘা বা প্রদাহের চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে আগে থেকে। সেই সাথে নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপও করতে হবে। তবে এসব ব্যবস্থা কনডম ব্যবহারে কোন বিকল্প নয়। এগুলো অসহায় যৌনকর্মীদের কিছু বাড়তি নিরাপত্তা মাত্র।

১০.১.৪. কনডম ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচার কতটুকু সার্থক হয়?

কনডম ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচার কতটুকু সার্থক হয় তার একটি উদাহরণ সুইজারল্যান্ডে রয়েছে, যেখানে সতেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সীদের মধ্যে একক সম্পর্কের বাইরে কনডম ব্যবহার ৮ থেকে ৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সনের মধ্যে।

দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে যৌনরোগ প্রতিরোধে কনডম ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য এবং এইডস বিষয়ক প্রচারণা ও জ্ঞান জনগণের নিকট বিশেষ করে নারী সম্প্রদায়ের নিকট খুব কমই পৌঁছেছে। এমনকি নারী যৌনকর্মীদের মধ্যে এবং তাদের গ্রাহকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছেনি।

ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল (এফএইচআই), ডিএফআইডি এবং ইউএসএইড-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণায় (Trends in Sexual and Drug-Taking Behaviours in Bangladesh) দেখা যায়, বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্মীরা খদ্দেরদের সঙ্গে মিলনের সময় মাত্র ২১ ভাগ ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে ভারতের মহারাষ্ট্রে এই হার শতকরা ৭৭.৪ ভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৮০ ভাগ, গুজরাটে ৯৩ ভাগ, কেরালাতে ৮৯ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯২ ভাগ। একই গবেষণায় দেখা গেছে, লাওসে এই হার ৯১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়াতে ৪১ ভাগ, নেপালে ৬৭ ভাগ এবং ভিয়েতনামে ৯৪ ভাগ। কনডম ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে থাইল্যান্ড এইডস এপিডেমিক অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখানো হয়েছে– বাংলাদেশের পেশাদার যৌনকর্মীরা তাদের সর্বশেষ খদ্দেরের সঙ্গে

মিলনের সময় সরাসরি কনডম ব্যবহার করেছে শতকরা মাত্র ০.৫ ভাগ। পক্ষান্তরে এই হার মহারাষ্ট্রে ৭৪ ভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬২ ভাগ, গুজরাটে ৭৩ ভাগ, কেরালাতে ৫২ ভাগ, উড়িষ্যাতে ৫১ ভাগ, পশ্চিম বাংলায় ৭৬ ভাগ, কম্বোডিয়ায় ৭৮ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় ১২ ভাগ, লাওসে ৭২ ভাগ, নেপালে ৪০ ভাগ এবং ভিয়েতনামে ৬৪ ভাগ।

আরও একটি বিষয় হল গ্রাহকের সংখ্যা। সাম্প্রতিক সময়ে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের পতিতারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাহকসেবা দিয়ে থাকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, এই সংখ্যা কখনও কখনও ২৪ ঘণ্টায় ৪০ জনেরও ওপরে হয়ে থাকে। সীমাহীন দারিদ্র এর একটি অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে ভাসমান যৌনকর্মী কর্তৃক কনডম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক উপরোক্ত গবেষণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। লেখকের গবেষণায় দেখা গেছে দেশের ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে শতকরা ৯.৮৪ ভাগ কনডম ব্যবহার করছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনকর্মীরা কনডম ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছে খদ্দেরের আপত্তির কারণে। কনডম ব্যবহার ও রোগ সচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়টি এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কনডম ব্যবহারের সমস্যা সম্পর্কে মতামত :

- ৫৪ ভাগ লোকের মতে যৌনসংযোগে কনডম অকার্যকর।
- ৪১ ভাগ লোকের মতে এটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
- ৩৫ ভাগ লোকের মতে কনডম কেনাকাটা ও জোগাড় করা অসুবিধা।
- ২১ ভাগ লোকের মতে এটা একটি বাড়তি ঝামেলা।

কনডম ব্যবহারে গ্রাহককে রাজি করানোর ব্যাপারে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল–

যৌনকর্মীদের অধিকার বোধ সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব,
জাতীয় পর্যায়ে গুরুতরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রবণতা,
ভাসমান পতিতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং নিরাপত্তার অভাব,
যৌনকর্মীদের গ্রাহকদের মানসিক প্রবণতা,
সমাজে নারীর অবস্থান ও নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি।
এছাড়াও যৌনকর্মীদের মধ্যে যৌনরোগ উপেক্ষা করা বা গোপন করার জন্য নানান রকম চাপ ইত্যাদি।

খাবার বড়ির ভূমিকা :

খাবার বড়িতে সার্ভিক্সের মিউকোসার ঘনত্ব কিছুটা বেড়ে যায় যা ভাইরাস প্রতিরোধে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপত্তিও তৈরী করে।

১০.২.১. এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে ভাইরিসাইডাল প্রয়োগ :

এইচআইভি ভাইরাস যোনিপথের মিউকোসার সংস্পর্শে আসলেই এইডস রোগের সংক্রমণ ঘটবে কিংবা কতভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমণ ঘটবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান

নেই। তবে একটি পরীক্ষায় আটজনের মধ্যে চারজন নারীর এইডস রোগের সংক্রমণ ঘটেছিল এইচআইভি সেরোপজিটিভ ডোনারদের বীর্য কৃত্রিমভাবে যোনিপথে প্রবেশ করাবার পর। এতে যে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় তা হল– (ক) যোনিপথে ভাইরাসযুক্ত বীর্য প্রবেশ করলেই এইচআইভি সংক্রমণ ঘটবে এটা ঠিক নয়, (খ) যোনিপথে ঘা বা অন্যকোন সহায়ক পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতেও এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইরাস সরাসরি সার্ভিক্সের মধ্য দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করলে অধিকাংশ এইডসের সংক্রমণ ঘটে থাকে। নীরোগ যোনিপথের মিউকোসার প্রতিরোধ কতটা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে পারে তা গবেষণার বিষয়।

ইমিউন মডিফাইং ওষুধ প্রয়োগ এবং যোনিপথে ভাইরিসাইডাল প্রয়োগ এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রিস্ক গ্রুপের অন্তর্গত নারীদের ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটি একটি বাড়তি সুরক্ষা দিতে পারে। দেখা গেছে ০.০৫% হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন জেল নিয়মিতভাবে প্রয়োগের ফলে নানা প্রক্রিয়ায় ইমিউন রেসপন্সের পরিবর্তন ঘটে থাকে। ফটোঅক্সিডেশনের মাধ্যমে এটি ভাইরাস বিনাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেখকের গবেষণায় দেখা গেছে এনথ্রাকুইনান জাতীয় ওষুধগুলো এই প্রক্রিয়ায় এনভেলপ ভাইরাস বিনাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটা ভাইরাল ফিউশন প্রতিরোধ করে এইচআইভি বৃদ্ধি এবং প্রতিলিপন রোধ করে। লেখক আরও দেখিয়েছেন যে, ডেক্সট্রান সালফেট এর মত ওষুধ জেল আকারে যোনিপথে ব্যবহার করলে কোষগাত্রে ভাইরাস এ্যাডজরপশন রোধ করা সম্ভব। এটা এইচআইভি ইনফেকশন ও ভাইরাস সিনসিটিয়া ফরমেশন রোধ করে। এ প্রসঙ্গে লেখক কনডমের ব্যর্থতা এবং এটা ব্যবহারে পুরুষের অনাগ্রহের কথা চিন্তা করে যৌনসক্রিয় নারীদের সুরক্ষার জন্য সারভাইক্যাল ক্যাপ ও ডায়াফ্রামের মত ফিজিক্যাল ব্যরিয়ারের সাথে সাথে যৌনমিলনের সময় এ জাতীয় ভাইরাসনাশক ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর স্বউদ্ভাবিত এইচআইভি ভাইরাসনাশক জেল-এ ইমিউন রেসপেন্স মডিফায়ার এর সাথে সাথে মাইক্রোবনাশক একটি ওষুধ প্রয়োগের কথা বলেছেন (DQX Combi Gel)। এটা প্রয়োগে পুরুষের বীর্যে বিদ্যমান ভাইরাসগুলো যোনিপথে সহজেই মারা যায় এবং যোনিপথের মিউকোসার বাড়তি প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এ ধরনের ওষুধ যা করে তা হল–

- যোনিপথে প্রবিষ্ট ভাইরাসের এনভেলপ প্রোটিন ধ্বংস সাধন।
- শুরুতে ভাইরাস এ্যাডজরপশন প্রতিরোধ।

- জিপি-১২০ ও সিডি-৪ এর মধ্যে আর্ন্তবিক্রিয়া ও বন্ধন প্রতিরোধ।
- ভাইরাস ফিউশন ও প্রতিলিপন প্রতিরোধ।

ভাইরাসনাশক দুটি ওষুধের সংমিশ্রণের ফলে এটা যে সমস্ত কোষগাত্রে সিডি-৪ এর অবস্থান নেই তার সাথে এইচআইভি'র বন্ধন ও প্রতিরোধ করতে পারে। এসব ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খেয়াল করতে হয় তা হল–

- এটা যেন সহজে দ্রবণীয় হয়।
- এবং ব্যবহৃত অঙ্গের কোষের জন্য ক্ষতিকারক না হয়।

আলোচ্য ডেক্সট্রান সালফেট কোষ দ্বারা শোষিত না হওয়ায় এটা কোষের মেটাবলিক ক্রিয়াতে কোন ক্ষতিকারক প্রভাব রাখে না। অপরদিকে DQX Combi Gel এ এমন একটি ভাইরাস ও নিরাপদ ভেষজ pesticide ব্যবহার করা হয়েছে যা কোষের কোন ক্ষতি না করেই কোষের সাথে বন্ধনযুক্ত ও বন্ধনহীন সকল এইচআইভি ভাইরাসকে নিধন ও নিষ্ক্রিয় করতে পারে। এটা এইচআইভি-১ ও এইচআইভি-২ জাতীয় ভাইরাসের সকল সাবটাইপের (Subtype) উপরও কার্যকর। সুনির্দিষ্টভাবে এ ওষুধের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীতাকে বোধগম্য করবার জন্য ২০০২ সনে প্রকাশিত লেখকের মূল গবেষণা পত্র থেকে উদ্বৃত করা যাচ্ছে –

Initial Target of DQX Combi Gel was

- To create a hostile field for the virus for its survival.
- To kill the virus outright.
- To suppress its replication by preventing membrane fusion.
- To eradicate the favorable environment and cofactor which stimulates virus transmission.
- To reduce number of HIV targets.
- To modify host cells immunity to prevent HIV transmission.

DQX Combi Gel is a combination therapy planned in such a way that while one component destroys the viral envelop with direct contact, another prevents GP-120-CD4 interaction.

They block viral fusion and prevent replication.

Dextran sulphate used in the combination prevents adsorption of virus. As dextran sulphate is poorly absorbed by the cell,

the intracellular and metabolic side effects are nill.

The D component of the gel is microbiocide of plant origin commonly used as a safe pesticide.

The combination can overcome fusion of virus with human cell type that lack CD4 and it is effective against almost all subtype of HIV1 and HIV2. It acts on both free virus and virus on cell surface.

Site of Action & Target

- Env protein of virus
- Virus adsorption
- HIV CD4 binding
- Membrane fusion
- Fusion leading to reverse transcription

এই ওষুধটি পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় এটা যোনিপথে একটি প্রলেপ তৈরি করে। তবে বাস্তবে এ ধরনের ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষা ও সমীক্ষার প্রয়োজন।

যে ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার মাত্র ৬৯ ভাগ ক্ষেত্রে সুরক্ষা দিয়ে থাকে, সেখানে দরিদ্র দেশের যৌনকর্মী যারা গ্রাহককে কনডম ব্যবহারে রাজি করতে পারে না অথবা যে সব ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক সঠিকভাবে কনডম ব্যবহৃত হয় না, সেখানে এ ধরনের একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা সবাইকে আশান্বিত করতে পারে।

১০.২.২. ফিমেল কনডম ও সংশ্লিষ্ট ভাইরিসাইডাল কতটুকু কার্যকর?

ননক্সিনল-৯ (Nonoxynol-9)-সহ ল্যাটেক্স কনডমই সবচেয়ে ভাল যৌনসুরক্ষা দিতে পারে। কনডম তো সাধারণ সুরক্ষা দিয়েই থাকে, এর ওপর ননক্সিল-৯ নামক শুক্রাণু ঘাতকটি এইচআইভি'কে অকার্যকর করতে সক্ষম হয়। তবে চিন্তার বিষয়, এই ননক্সিল-৯, অনেক সময় ত্বকে এবং মিউকোসাতে চুলকানিসহ ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। তাই এর বিকল্প খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।

ডায়াফ্রাম ও সারভাইক্যাল ক্যাপের সাথে ননক্সিনল-৯ ব্যবহার অথবা অন্য কোন ভাইরিসাইডাল ব্যবহার বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে যৌনকর্মীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, বিশেষ করে যাদের যৌনাঙ্গে কোন ক্ষত থাকে না। সুনির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক ও লোকাল এন্টিমাইক্রোবায়ালের প্রয়োগ যোনি অভ্যন্তরের ঘাগুলোকে নিরাময় করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেয়া

হচ্ছে। এইডস প্রতিরোধের জন্য ক্লোরিনযুক্ত পানীয় জলে পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশ্রিত করে যোনিপথ নিয়মিত ধুতে হবে। তবে পিচকারি ব্যবহার করে বা উচ্চামাত্রায় পানি প্রয়োগ করে ধৌতকার্য করলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হবে। এসব কাজ এইডস সংক্রমণ রোধে কেবল সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে ।

ডায়াফ্রাম এবং ক্যাপ ব্যবহার করার একটি অপেক্ষাকৃত নেতিবাচক দিক হল মেয়েদের সার্ভিক্স এবং পুরুষদের লিঙ্গের অগ্রভাগে ক্ষত তৈরি হওয়া। মেয়েদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আইইউডি (IUD) ব্যবহারও এ্যান্ডোমেট্রিয়াল (Endometrial) প্রদাহ তৈরি করে রোগ সংক্রমণে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলে। মেয়েদের সার্ভিক্যাল একটপি যা জরায়ুর এক ধরনের রোগাক্রান্ত অবস্থা, পুরুষ থেকে নারীতে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

যৌনকর্মীদের জন্য কনডমের সাথে ননোক্সিনল-৯ যুক্ত ফোম, জেলি, ক্রিম ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করছেন লেখক।

স্বল্পমাত্রায় হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইনযুক্ত জেল ও ক্রিম ব্যবহারের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি শরীরের মধ্যে ইন্টারলিউকিন-৬ (Interleukin-6) ইনহিবিটর হিসাবে কাজ করে। এই ইন্টারলিউকিন-৬ মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজের মধ্যে এইচআইভি বৃদ্ধিতে গ্রোথ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইন এইচআইভি'র এনভেলাপ প্রোটিন জিপি-১২০ তৈরিতে বাধা তৈরি করে সামগ্রিকভাবে একদিকে এদের সংখ্যা কমিয়ে আনে, অন্যদিকে এইচআইভি টার্গেট কোষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

১০.৩.১. ধৌতকরণঃ

এইচআইভি এমন একটি ভাইরাস যা কি না সহজে বিভিন্ন কেমিক্যাল ও ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ক্লোরিনযুক্ত পানীয় জল দ্বারা সাধারণ প্রক্রিয়ায় যোনিপথ ধৌতকরণও যোনিপথে বিদ্যমান ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা কমিয়ে আনে। সাধারণ পটাশ মিশ্রিত পানি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে এ্যানোরোবিক ব্যাক্টেরিয়াসহ বেশ কিছু ছত্রাকের উপর মৃদুভাবে কাজ করে। এর স্পর্শে এইচআইভি জাতীয় ভাইরাসও নির্মূল হয়। তবে অনেক গবেষক মনে করেন, যৌনসংযোগের পর ধৌতকরণ পদ্ধতি ভাইরাসকে ওপরে ঠেলে দিতে পারে বা ছড়িয়ে দিতে পারে। ডুশ প্রয়োগ করে যোনিপথ ধৌত করতে গেলে পানির চাপে ভাইরাস ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

লেখকের মতে, বহু পুরুষের সংস্পর্শে আসা নারীদের যোনিপথে সিমেন এন্টিবডি স্বাভাবিক ইমিউন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার একটি কারণ। তাছাড়া এ ধরনের

সংযোগের ফলে সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়াসহ ছত্রাক সংক্রমণের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তা কিছুটা প্রতিরোধ করা সম্ভব ধৌতকরণ পদ্ধতিতে। এ সমস্যা সমাধান না হলেও এতে বিদ্যমান জীবাণু ও পরজীবীর সংখ্যা কমে আসবে।
স্বাভাবিক যৌনমেলামেশার পর যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেললে সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে এবং এইডস সংক্রমণে সহায়ক বেশকিছু কো-ফ্যাক্টরের নেতিবাচক প্রভাব কমে আসে।

রোগ সংক্রমণের জন্য ভাইরাল ডোজ ও ব্যাক্টেরিয়াল ডোজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এছাড়া পায়ুপথ থেকে সংক্রমিত অজ্ঞাত ফ্যাক্টর (Unknown factor) এবং খাৎনা করা হয়নি এমন ব্যক্তিদের যৌনাঙ্গের চামড়ার নিচে বিদ্যমান রিস্ক ফ্যাক্টর কমিয়ে আনবার জন্য ধৌতকরণ পদ্ধতিটি কার্যকর হতে পারে।

এ ধরনের পদ্ধতি সিডিসি বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত পদ্ধতির অন্তর্গত না হলেও দরিদ্র দেশে এর প্রয়োগ জনস্বার্থেই জরুরি। তবে ব্লাইন্ড পদ্ধতিতে এসবের প্রয়োগ যৌনরোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার কোন বিকল্প নয়। তবে যৌনাঙ্গকে নীরোগ রেখে ইমিউন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে পভিডন আয়োডিন (Povidone-Iodine) জাতীয় ক্রিম যোনিপথে ব্যবহার করলে নানা ধরনের জীবাণুসহ ভাইরাস ও ছত্রাকের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এটা গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ দু'ধরনের ব্যাকটেরিয়াসহ ছত্রাকের স্পোরগুলোকে ধ্বংস করে। তবে এটি এক নাগারে দু'সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করলে অতিরিক্ত আয়োডিন এভজরপশনের জন্য ক্ষতি সাধন হতে পারে। এতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা হতে পারে। যারা মা হবেন তাদের জন্য এটা ব্যবহার একেবারেই নিষেধ। কেননা গর্ভস্থ শিশুর থাইরয়েড গ্রন্থিতে সমস্যা হবার সম্ভাবনা থাকে।

১০.৪.১. ছেলেদের খাৎনা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়?

ছেলেদের খাৎনা না করার কারণে যৌনাঙ্গের বাড়তি চামড়ার নিচে স্মিগমা (Smigma) নামক যে ময়লা জমে তা এইডস সংক্রমণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। এতে সাধারণ সংক্রমণের কারণেও চামড়ার নিচে এইচআইভি টার্গেট কোষের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেগুলো চামড়ার নিচেই আশ্রয় নেয়। এতে মেয়েদের থেকে পুরুষদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এইডস ভাইরাস টিকে থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। একারণে পুরুষদের খাৎনা করাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। যারা খাৎনা করেনি তাদের বাড়তি চামড়ার নিচে জমে থাকা ময়লা দিনে দু'বার পরিষ্কার করতে হবে। এটা করতে চামড়াটা ভেতরে টেনে হালকা সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে।

তবে এ প্রক্রিয়ায় পুরুষ থেকে নারীতে এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। পুরুষ বা

নারীর যৌনাঙ্গে ঘা, ক্ষত বা কোন রোগ থাকলে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষ উভয় পথেই এইচআইভি সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পায়।

১০.৫.১. ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ গ্রহণ প্রবণতা প্রতিরোধ করা যাবে কীভাবে?

ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদেরকে (IDUs) বিশেষভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এই সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ইনজেকশনের সূঁচ একবার ব্যবহারের পরে ফেলে দিতে হবে এবং অন্যের ব্যবহৃত সূঁচ কখনই ব্যবহার করা যাবে না। এটা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

কেউ নিজে নিজে ইনজেকশন নেবার চেষ্টা করবে না। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসাকর্মীর সহায়তায় ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের দ্বারা ইনজেকশন নিতে হবে। বিশেষ করে ইনসুলিন ব্যবহারকারীরা বা অন্য যারা ঘন ঘন সূঁচ ব্যবহার করেন তাদেরকে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করতে হবে।

১০.৫.২. নিড্‌ল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

ইনজেকশনের সূঁচের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কোন দেশে নিডল এক্সচেঞ্জ নামক একটি পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করে তাদেরকে সহজভাবে জীবাণুমুক্ত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ সরবরাহ করা হয়। '৮০-র দশকে এটা প্রথমে ইউরোপে চালু করা হয়। পরবর্তীতে এটা আমেরিকাতেও প্রচলিত হয়। এ পদ্ধতির নেতিবাচক দিক হল, সিরিঞ্জ ও নিড্‌ল সহজলভ্য হওয়ায় এতে ড্রাগ সেবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর একটি বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে–সিরিঞ্জ ও নিড্‌ল পরিষ্কার করার জন্য ব্লিচ জাতীয় সামগ্রীর ব্যবহার।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, অ্যালকহল প্রয়োগের মাধ্যমে এইচআইভিকে মেরে ফেলা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে ফুটানোসহ অন্যান্য উপায়ে তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি ভাইরাস বিনাশে কার্যকর।

১০.৬.১. এইডস সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে?

- নারী নিয়ন্ত্রিত যৌনরোগ ও এইডস রোগ প্রতিরোধের বিষয়টি প্রচার পেতে হবে।
- নারীর স্বাস্থ্যকে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের কাছে পৌঁছাবার জন্য হেলথ ভিজিটর ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং ওয়ার্কারদের মত নারীদের নির্বাচিত করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যারা এধরনের কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট আছে তাদেরকে

এইডস সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত শিক্ষা দান করে মোটিভেশন প্রোগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সংক্রমিত হচ্ছে বা হতে পারে এমন রিস্ক গ্রুপকে এবং প্রান্তিক সীমার দরিদ্র নারী, ভাসমান নারী, যৌনকর্মীসহ নেশায় অভ্যস্ত নারীদেরকে চিহ্নিত করবে এই স্বাস্থ্যকর্মীরা।

- তারা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রয়োজনগুলো লিপিবদ্ধ করবে।
- ভাসমান নারী ও যৌনকর্মীসহ দুর্দশাগ্রস্ত অসুস্থ প্রসূতিদের পুনর্বাসনে সহায়তা দেবে।

এইচআইভি সম্পর্কে যারা শিক্ষা দেবে তাদের কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত; যেমন–

- সাধারণের যৌন আবেগ, প্রবণতা, প্রেম ভালবাসা, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, মানসিক স্বাস্থ্য, নেশাদ্রব্যের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি। এছাড়া ভয়ভীতি, নানা বিকৃতিসহ ঘৃণা বিদ্বেষ ও অহঙ্কারের বিষয়গুলোও কর্মীদের মাথায় থাকা প্রয়োজন।
- পরিবারের কাছে শিক্ষা দান পর্যায়ে দেশের সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবারের স্বামী স্ত্রীকে যৌথভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী ও পুরুষকে এইডস ছাড়াও অন্যান্য যৌনরোগের চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে এবং সফল চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের যৌনরোগ প্রতিরোধ করতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইডস প্রতিরোধ পরিকল্পনা ব্যাপক অর্থে সফল হবে।
- বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যৌনসংযোগ পরিহার অথবা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ওপর স্থাপিত একক সম্পর্ক এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে একাধিক সম্পর্ক, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, বিবাহপূর্ব সম্পর্ক, ভাসমান পতিতাসহ যৌনকর্মীদের সঙ্গে সংসর্গ সমাজে ব্যাপক।

১০.৬.২. সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা :

এইডস প্রতিরোধে পরিকল্পিত এবং সম্মিলিত কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন। এ জন্য বহুমুখি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যথা–

- যারা এইডসে আক্রান্ত এবং যাদের আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ তথা রিস্ক গ্রুপ নির্ধারণ।
- ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা ও তথ্যের সরবরাহ। রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ, বিপদ ইত্যাদি সংক্রান্ত শিক্ষা এবং রোগের লক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।

- তথ্য ও রোগ প্রতিরোধের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ (গুরুত্ব অনুযায়ী) এবং রোগের লক্ষণ অনুযায়ী সম্ভাব্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা। এইচআইভি পজিটিভদের পরিবার, সঙ্গী ও আত্মীয়স্বজনদের পরীক্ষা নিরীক্ষা, সতর্কীকরণ এবং নিবন্ধিকরণ একটি জরুরি ব্যাপার।

- নিখরচায় সকল যৌনরোগের স্ক্রিনিং ও ব্যবস্থাপত্র দানের পদ্ধতি প্রচলন।

এইডস প্রতিরোধে প্রথমে যে বিষয়টি বলা প্রয়োজন তা হল ব্যক্তিগত যৌন আচরণের সংশোধন ও আচরণগত পরিবর্তন আনতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিরাপদ মেলামেশা এবং যৌন আচরণে শুদ্ধতা আনা।

- কোন কোন যৌন আচরণে বিপদ আছে তার ব্যাখ্যা করে একক সঙ্গী বা মনোগেমাস সম্পর্কের ওপর জোর দিতে হবে। তবে এই উপদেশ দেবার সময় মানবমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে এবং বিচারকের মত আচরণ পরিহার করতে হবে।

- এইডস প্রতিরোধ করতে যেয়ে রোগীকে এইচআইভিসহ সকল যৌনবাহিত রোগের বিপদ সম্পর্কে জানাতে হবে।

১০.৬.৩. শনাক্তকরণ কর্মসূচি :

- প্রথমেই শনাক্ত করতে হবে যাদের রোগের লক্ষণ দেখা দেয়নি অথচ আক্রান্ত হয়েছে, বিশেষ করে যারা রোগ শনাক্তকরণের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছে না এবং চিকিৎসা নিচ্ছে না।

- ট্রাক চালক, রিক্সা চালকসহ বিভিন্ন ধরনের মজুর, বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় বিভিন্ন কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত লোকজন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কর্মরত সদস্য ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ যারা এই সমস্ত যৌনকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিংবা যারা হরহামেশা বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশে গিয়ে কাজ করছে, সেখানে যৌনকর্মীসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ নারী-পুরুষের (Potentially infected persons) সাথে মেলামেশা করছে এবং দেশে ফিরে এক বা একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে থাকছে। তারা সবাই এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমে টার্গেট গ্রুপের অর্ন্তভূক্ত। সকল টার্গেটি গ্রুপের কাছে যৌনবাহিত রোগ ও এইচআইভি সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্যগুলো পৌঁছে দিতে হবে।

- গার্মেন্টস কর্মী, বাস ও ট্রাকের ড্রাইভারসহ বিভিন্ন শ্রমিক, ভালনারেবল গ্রুপ, রিস্ক গ্রুপ, হাসপাতালের কর্মী, প্যাথলজি বিভাগের কর্মী, রক্তসঞ্চালন বিভাগের কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত এইচআইভি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

●বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলো, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত সকল শ্রমিক, কর্মচারী, গৃহভৃত্যসহ সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে এইচআইভি স্ক্রিনিং করাতে হবে অথবা তারা এইডস, হেপাটাইটিস, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগমুক্ত সংক্রান্ত হেলথ্ সার্টিফিকেটসহ দেশে আগমন ও নির্গমন করবে। এটা বিদেশে যাবার সময় এবং ফেরার সময়– দু'বারই করা যেতে পারে। ভ্রমণকারী নিজেই পরীক্ষার খরচ বহন করবে। এইচআইভি পজিটিভ হলে তাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিদেশে যাবার ব্যাপারে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। এইডসকে নোটিফাইয়েবল ডিজিজ হিসাবে গণ্য করতে হবে। প্রতিটি বিদেশগামীর নিকট এইডস রোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি পৌঁছে দিতে হবে।

●বিদেশী জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তার নাবিক বা ক্রুরা যদি দেশে ঢুকতে চায় তাহলে বন্দরেই তাদের এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে অথবা তাদেরকে একই পদ্ধতিতে হেলথ্ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। আমাদের দেশে যে সমস্ত বিদেশী কাজ করছে বা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য তো এটা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন– বিশেষ করে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশের জন্য।

●নারী পাচার বন্ধ করতে হবে। পাচারকৃতদেরকে বিদেশ থেকে ফেরত এনে অবশ্যই এইচআইভি স্ক্রিনিং করাতে হবে।

●বাধ্যতামূলকভাবে সকল যৌনকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন এবং তাদের বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

●এইডস রোগের সাথে অ্যালকহল এবং তামাক গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এসবের প্রতি যাদের আসক্তি রয়েছে তাদেরকে এগুলো পরিহার করতে হবে।

●খোলামেলাভাবে যৌনরোগ ও ওষুধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

●সব কথার শেষ কথা এইডস সংক্রান্ত জরুরি তথ্যগুলো স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধ্যায় এগারো

এইডস রোগে শিশু ও গর্ভবতী মা

১১.১.১. এইচআইভি আক্রান্তদের গর্ভধারণে কী ধরনের জটিলতা দেখা দেয়?

রোগী এসময়ে মা হলে শারীরিক জটিলতার কথাটি ভাবতে হবে। এছাড়া যারা ওষুধ গ্রহণ করবে না তাদের ক্ষেত্রে মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণের হার অনেক বেশি এটাও মনে রাখতে হবে। 'ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশন অব এইচআইভি' বিষয়ে নানা গবেষণায় দেখা যায় যে সর্বনিম্ন ৩৫ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে এই হার কম হলেও আফ্রিকানদের মধ্যে এটা বেশি।

১১.২.১. মা থেকে শিশুর মধ্যে কীভাবে আইচআইভি সংক্রমণ ঘটে?

হেটেরোসেক্সুয়াল সম্পর্কের মাধ্যমে যত দ্রুত গতিতে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে, তারচেয়ে অধিক দ্রুততায় মা থেকে গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এইচআইভি আক্রমণের শুরুতে ও শেষ পর্যায়ে যখন ভাইরাল লোড বেশি থাকে তখনই মা থেকে শিশুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে থাকে।

সরাসরি মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ বা ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করে তা হল–

- আক্রান্তের প্রথম বা পূর্ববর্তী শিশুর এইচআইভি সংক্রমণ সংক্রান্ত অবস্থান। প্রথম শিশুটি এইচআইভি আক্রান্ত হলে পরবর্তীদের মধ্যেও এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- যাদের সিডি-৪ কোষের সংখ্যা চারশ'র নিচে তাদের শিশুদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া গুরুতর পর্যায়ের এইচআইভি আক্রান্ত যে সমস্ত রোগীর (Advanced class-4 HIV) মধ্যে পি-২৪ এন্টিজেনিমিয়া রয়েছে অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ে ভাইরেমিয়া বা ভাইরাল লোড রয়েছে তাদের মধ্যে অধিক হারে ভাইরাল ট্রান্সমিশন ঘটে থাকে।
- এছাড়া প্রিম্যাচিউরড্ সন্তান অর্থাৎ যারা ৩৮ সপ্তাহের আগে জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যেও এইচআইভি সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। অবশ্য

এমনও হতে পারে যে, এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা বেশি হওয়াতে প্রিম্যাচিউরড্ শিশুর সংখ্যা বেশি হচ্ছে।

১১.৩.১. এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের জন্মগত অসুবিধাগুলো কী কী?

জন্মের পরপরই আক্রান্ত শিশু ও অনাক্রান্ত শিশুর পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এক বছরের মধ্যে রোগের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিসিপি জাতীয় নিউমোনিয়ার সংক্রমণ এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ। এ রোগগুলো তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদেরকে দ্রুত আক্রমণ করে। এছাড়া ইমিউন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে সমস্ত রোগ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা শিশুদের মধ্যে ঘটে থাকে অতি দ্রুত। এইচআইভি সংক্রমণের কারণে শিশুদের হৃদরোগ ও হার্ট ফেইলর ঘটার বিষয়টি একটি বিশেষ বিপর্যয়কর দিক। এতে শিশুরা তুলনামূলকভাবে দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এরা খুব কম বাঁচে।

এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের সমস্যা অন্যান্য এইচআইভি আক্রান্তদের মতই। এদের মধ্যে শুধু সংক্রমণের হারই বেশি হয়ে থাকে না, সেই সাথে প্রায় সবার হৃদপিণ্ড সুস্থ শিশুর তুলনায় বড় হয়ে থাকে। তাদের হৃদপিণ্ডের সংকোচন বা পাম্প করার ক্ষমতাও কম হয়ে থাকে।

হৃদপিণ্ডের এই বৈকল্য বা প্যাথলজি যারা এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং যারা হচ্ছে না– উভয় ধরনের শিশুদের মধ্যেই সমান। হৃদপিণ্ডের এই পরিবর্তনের সাথে আক্রান্ত মায়েদের জন্য জিডোভুডিন বা অন্য কোন ওষুধ প্রয়োগের সম্পর্ক আবিষ্কার না হওয়ায় গবেষক লিপসুজ (Lipshultz) ধারণা করেন যে, মায়ের শরীরে বিদ্যমান রোগ, রোগের কারণে প্রদাহ এবং মায়ের অপুষ্টির কারণেই শিশুর এই অসুবিধা ঘটেছে। তবে লেখকের ধারণা এই যে, এর কার্যকারণটি অস্পষ্ট ও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে।

হৃদপিণ্ডে অসুবিধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা দু'ধরনের শিশুদের (এইচআইভি পজিটিভ ও নেগেটিভ) হৃদপিণ্ডের ওজন বৃদ্ধি এবং সংকোচন ক্ষমতা হ্রাস প্রথমে সমান থাকলেও ৪ থেকে ৩০ মাসের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের বাম ভেনট্রিক্যালের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং প্রথম ক'বছরের মধ্যেই হার্ট ফেইলরের দিকে এগিয়ে যায়; বিশেষ করে যাদের মধ্যে ফুসফুসের বিবিধ সংক্রমণ হয়, তাদের মধ্যেই হৃদপিণ্ডের এই জটিলতা দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

আমেরিকার ন্যাশনাল হার্ট লাং ব্লাড ইনিস্টিটিউটের (NHLBI) গবেষক ড. জর্জ সপকো এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এইচআইভি মুক্ত শিশুদের হৃদপিণ্ডের অসুবিধাগুলো তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং বয়স

বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যেসকল শিশু এইডস আক্রান্ত নয়, তাদের মধ্যে এটা পরবর্তীতে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এনএইচএলবিআই-এর পরিচালক ড. ক্লড (Dr. Claude Lenfant) বলেন, 'These results reinforce the importance of careful follow-up and the need to be alert to the possibility of cardiac complications when caring for children born to HIV infected mothers.'

এ প্রেক্ষাপটে এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের শিশুদের প্রতিপালনের জটিলতা এবং ক্যার্ডিয়াক মনিটরিং-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে এবং আক্রান্ত গর্ভবতী মাকে A.Z.T বা জিডোভুডিন প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে। এতে শতকরা ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে শিশুর দেহে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জিডোভুডিন-এর সাথে অন্যান্য রেট্রোভাইরাল ড্রাগের কম্বিনেশনও দেয়া হয়ে থাকে।

১১.৪.১. নবজাতক ও শিশুদের এইচআইভি সংক্রমণ :

বড়দের মত একই প্রক্রিয়ায় এইচআইভি ভাইরাস নবজাতকদের টি-হেলপার লিম্ফোসাইট কোষকে আক্রমণ করে ইমিউন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। পরিপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় আক্রান্ত নবজাতকদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণত এইচআইভি আক্রান্ত মা'দের নিকট থেকেই নবজাতকরা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।

এইচআইভি আক্রান্ত মা'দের শিশুরা সর্বনিম্ন ৩৫ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি পজিটিভ হয়। মা থেকে শিশুর মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ বা ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন তখনই বেশি ঘটে যখন মায়ের রক্তে ভাইরাল লোড সবচেয়ে বেশি থাকে। রোগের প্রথম পর্যায়ে এবং শেষ পর্যায়েই ভাইরাল লোড সবচেয়ে বেশি হয়। তবে রোগ সংক্রমণের অব্যবহিত পরে অ্যাকিউট (acute) ইনফেকশনের সময় রক্তে যে ভাইরাসের সংখ্যা বেড়ে যায় তা আবার কমেও যায়।

এইচআইভি আক্রান্ত শিশুরা বড়দের চেয়ে অনেক কম বাঁচে। সাধারণত জন্মের পর পরই এইচআইভি আক্রান্ত শিশুকে দেখে রোগ শনাক্ত করা কঠিন হয়। জন্মের পর এইচআইভি আক্রান্ত মা'দের যে সমস্ত শিশু ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং যারা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না– উভয়ের রক্তই সেরোপজিটিভ হয়ে থাকে। ছ'মাসের মধ্যে শিশুর ইমিউন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সাথে সাথে শরীরে যখন যথেষ্ট পরিমাণ এন্টিবডি তৈরি হয়, তখন সুস্থ শিশুর রক্ত সেরোনেগেটিভ হয়ে আসে। এর

আগে পর্যন্ত শিশুর রক্তে বিদ্যমান এন্টিবডি পরীক্ষাতে ভুল সংকেত দেয়।

মায়ের রক্তের এন্টিবডিগুলো জরায়ুর ফুল দিয়ে শিশুর রক্তপ্রবাহে পৌঁছে যায়। এই এন্টিবডি জন্মের তিন থেকে ছয় মাস পর শরীর থেকে দূর হয়ে যায়। এরপর যারা সত্যি সত্যিই আক্রান্ত তারা নতুন করে এন্টিবডি তৈরি করে। তাই ছ'মাসের মধ্যে পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে এইচআইভি শনাক্ত করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় পলিমারেস চেইন রিয়্যাকশন (Polymerase chain reaction বা PCR) পদ্ধতি।

পিসিআর পদ্ধতি শুধু জন্মের পর পরই ব্যবহার করা হয় না, এটা রোগের শেষ পর্যায়েও ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এইচআইভি প্রোটিন পি-২৪ শনাক্ত করেও নির্ধারণ করা যায় নবজাতকটি এইচআইভি আক্রান্ত কি না। এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের শিশু যদি আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত টেস্টে নেগেটিভ হয় তাহলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে যে শিশুটি এইচআইভি নেগেটিভ।

এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভে জন্ম নেবার কারণে যে সমস্ত শিশু সত্যিকার অর্থে এইচআইভি দ্বারা সংক্রমিত হয়, তারা এইচআইভি সংক্রান্ত নানা অসুখে আক্রান্ত হয় একবছর বয়স সীমার মধ্যেই। এ সময় তারা পিসিপি'সহ নানা ধরনের নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়। শিশুরা এইচআইভিতে আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া ছাড়াও ঘন ঘন নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এতে এরা প্রথম থেকেই জীবন সংকট বা failure to thrive-এ ভোগে। ইমিউন প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি অকার্যকর থাকার কারণে বড়দের তুলনায় শিশুরা অতিদ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এইচআইভি সংক্রমণের কারণে নবজাতক ও শিশুদের মস্তিষ্কে ও স্নায়ুতন্ত্রে রোগ সংক্রমণ হয়। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের ইমিউনাইজেশন বিষয়টি নিয়ে মা ও চিকিৎসক দোদুল্যমানতায় ভোগেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের ইমিউনাইজেশন করতে হবে অন্যান্য সাধারণ শিশুদের মতনই। এতে তারা অনেক রোগ থেকে বেঁচে যেতে পারে। তবে বিশেষ ধরনের ভ্যাকসিনগুলো নির্বাচনের ব্যাপারে শিশু বিশেষজ্ঞদের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

১১.৪.২. নিরাপদ শিশুর জন্মদান কি সম্ভব?

দেখা যাচ্ছে, এইডস আক্রান্ত মায়ের শিশুরা এইচআইভি পজিটিভ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে গর্ভাবস্থায় মা চিকিৎসা গ্রহণ করলে এইচআইভি নেগেটিভ শিশু জন্মদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ভার্টিক্যালি ট্রান্সমিটেড এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জিডোভুডিন (এজেডটি)। অবশ্য কম্বিনেশন থেরাপি মনোথেরাপির চেয়ে অধিক কার্যকর। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (NICHD)-এর প্রধান ডন আলেক্সান্ডার মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে কম্বিনেশন থেরোপির ভূমিকাটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে উল্লেখ করেন ২০০২ সনে প্রকাশিত তার এক গবেষণাপত্রে। পূর্বে সুইজারল্যান্ডের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে, কম্বিনেশন থেরাপির মধ্যে যারা প্রোটিয়াস ইনহিবিটর গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে প্রি-ম্যাচিউরড্ গর্ভপাত ঘটেছে বেশি।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত আমেরিকার ১৫৯০ জন এইচআইভি পজিটিভ মায়ের ওপর সাতটি গবেষণা চালানো হয়। এদের মধ্যে ৩৯৬ জনকে দেয়া হয় কম্বিনেশন ড্রাগ, যাদের মধ্যে প্রোটিয়াস ইনহিবিটর ছিল না। ১৩৭ জনের মধ্যে প্রোটিয়াস ইনহিবিটর অন্ত র্ভুক্ত করা হল। অবশিষ্ট ১১৪৩ জনকে কোন ওষুধই দেয়া হল না।

গবেষণা ফলাফলে দেখা গেল, যারা ওষুধ গ্রহণ করেছে তাদের প্রি-ম্যাচিউরড্ শিশু (Premature birth), অল্প ওজন, স্টিল বার্থ, নিচু আবগার স্কোরের হার (যা কি না একটি শিশুর জন্মকালীন সুস্থতার সূচক) যারা ওষুধ গ্রহণ করেনি তাদের থেকে কম নয়। তবে যারা ওষুধ পেল তাদের বেশিরভাগ শিশুই এইচআইভি নেগেটিভ অবস্থায় জন্ম নিল। দু'দলের মধ্যেই প্রিম্যাচিউরড্ ডেলিভারি প্রায় সমান সমান; যারা ওষুধ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ১৬ ভাগ এবং যারা করেনি তাদের মধ্যে ১৭ ভাগ। তবে যারা প্রোটিয়াস ইনহিবিটর গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ৫ ভাগ খুব কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়, এইডস আক্রান্ত মায়েদের এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি দিলে যে উপকার হয় তা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে অনেক মূল্যবান। এ ব্যাপারে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত হল, এইচআইভি পজিটিভ মায়েদের চিকিৎসায় প্রোটিয়াস ইনহিবিটর প্রয়োগ বর্জন করাই উত্তম।

এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদেরকে থেরাপি দেয়ার আগে ওষুধের ভালমন্দ দিকগুলো বলে দেয়া প্রয়োজন। এজেডটি থেরাপি দেয়ার পর যেমন ইমিউনোলজিক মনিটরিং করা প্রয়োজন, তেমনি নিউমোনিয়া (পিসিপি) প্রতিরোধ ও বিবিধ ওষুধ প্রয়োগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটিও বিবেচনায় আনা উচিত। এইচআইভি আক্রান্ত

নারীদেরকে মা হবার পূর্বেই জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে আক্রান্ত ১০০ জন মায়ের মধ্যে ৩৩জন এইচআইভি আক্রান্ত শিশু জন্ম দিতে পারে।

এরপর রয়েছে আক্রান্ত মায়ের প্রসবোত্তর উচ্চ স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সাপোর্টের প্রয়োজনীয়তা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কঠোরভাবে তাদের ইমিউনোলজিক মনিটরিং করা প্রয়োজন। নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন সিডি-৪ ও সিডি-৮ কোষের সংখ্যা। পিসিপি প্রতিরোধ দেয়ার আগে জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, সিডি-৪ সংখ্যা দুশ'র নিচে রয়েছে কি না। পিসিপি আক্রান্তদের সিডি-৪ কোষ দুশ'র নিচে হলে পিসিপি প্রোফাইলেক্সিস হিসাবে ট্রাইমেথোপ্রিম সালফামেথোক্সজল দেয়া প্রয়োজন।

১১.৪.৩. মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে?

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্তদের মা না হওয়াটাই ভাল। তবে নানা বাস্তব কারণে বিষয়টি মেনে নিতে হয় চিকিৎসকদেরকে। একারণে যারা এইচআইভি সংক্রমণের গুরুতর পর্যায়ে থাকবে এবং যাদের পূর্ববর্তী সন্তান এইচআইভি আক্রান্ত, তাদেরকে সংক্রমণ সংক্রান্ত জটিলতার কথা বোঝানো প্রয়োজন। তবু এরা মা হয়ে গেলে অনাগত শিশুর নিরাপত্তার জন্য এমন সব ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে শিশু কোন ক্ষত না নিয়ে জন্মায়। পিভি বা যোনিপথে জরায়ুর প্রসবকালীন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য চিকিৎসক যখন বারবার আঙ্গুল দিয়ে শিশুর মাথার নেমে আসাটা অনুভব করার চেষ্টা করেন, সে সময় অসর্তকতার কারণে শিশুর মাথার চামড়া আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, যা কি না এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক হতে পারে।

এরপর রয়েছে শিশুর সংক্রমণ রোধে এন্টি-রেট্রোভাইরাল ওষুধ ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রয়োগ। এতে ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অ্যাকটিভ ইমিউনাইজেশন আরেকটি সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করতে পারে।

এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের ভাইরাল লোড যখন নিম্ন পর্যায়ে থাকে তখন তাদের দেহে এইচআইভি এন্টিবডি যুক্ত ফিল্টারড্ সেরাম পর্যায়ক্রমে অতি নিম্ন মাত্রা থেকে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে এন্টিবডি তৈরির একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। এটি আক্রান্ত মায়েদের শরীরে এন্টি রেট্রোভাইরাল প্রয়োগের বিকল্প নয়। এ গবেষণার সম্ভাব্য সকল দিক ব্যাপক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১১.৫.১. বুকের দুধে এইচআইভি নিঃসৃত হয় কি না :

অনেকে প্রশ্ন করেন বুকের দুধে এইচআইভি নিঃসৃত হয় কি না। এর জবাব হল–হ্যাঁ, এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের স্তন নিঃসৃত রসে এবং বুকের দুধে এইচআইভি নিঃসৃত হয়। টি-হেলপার মনোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজ–এগুলো বুকের দুধে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান থাকায় ভাইরাস সংক্রমণ হয়ে থাকে। যে সমস্ত

শিশু এইচআইভি আক্রান্ত হয়নি তারাও এ ধরনের দূষিত স্তন চুষে বা দুধ পান করে এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধে এতটা পরিমাণ ভাইরাস থাকে যে সহজেই তা শিশুকে রোগাক্রান্ত করতে পারে।

১১.৫.২. এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ কি শিশুর জন্য নিরাপদ?

আক্রান্ত মা শিশুদের বুকের দুধ দিতে পারবে না। তবে শিশুর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই এইডস রোগের চিকিৎসা নিতে হবে। দেখা গেছে এইচআইভি আক্রান্ত মা ও শিশু যারা জিডোভুডিন পেয়েছে তাদের ৬৬ ভাগের মধ্যে এইডস সংক্রমণ প্রবণতা কমে এসেছে।

১১.৬.১. স্তনের বোঁটা থেকে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে?

এইচআইভি আক্রান্ত নারীর স্তনের বোঁটায় কোন ঘা বা কাটা না থাকলে এবং স্তন থেকে দুধ বা এ জাতীয় কোন তরল পদার্থ নিঃসৃত না হলে এ পথে ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

১১.৭.১. গর্ভবতী মা কি এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে?

শুধু এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েরাই অনাগত শিশুর দেহে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় না, অনেকক্ষেত্রে গর্ভধারণের পর যৌনসংযোগের মাধ্যমে তারাও ভাইরাসপ্রাপ্ত হয় এবং তা তাদের গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

অধ্যায় বারো

ব্যক্তিত্বের সাথে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা এবং আক্রান্তের মনোরোগ ও বিকার

১২.১. ব্যক্তিত্বের সাথে এইচআইভি'র সম্পর্ক :

১২.১.১. এইচআইভি আক্রান্তের মানসিক প্রবণতা কেমন?

সাধারণভাবে যারা এইডস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, চিকিৎসা নিচ্ছে এবং শনাক্ত হবার পর নিজেদেরকে আড়ালে রাখবার চেষ্টা করছে অথবা আক্রান্ত হয়েছে জেনে চিকিৎসককে এড়িয়ে চলছে তাদের মনের অবস্থা, আবেগ, উৎকণ্ঠা ও ভয়কে অনুভব করা এবং ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করা চিকিৎসকের নিকট একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বেপোরোয়া বেহিসেবী জীবন যাপনের জন্য যারা বিভিন্ন যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের মনোবিশ্লেষণও অতি প্রয়োজনীয়।

মানুষের যে নেতিবাচক স্বভাব অবৈধ, নীতিবহির্ভূত, অপরিচ্ছন্ন, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিপজ্জনক যৌন আচরণে উদ্বুদ্ধ করে তাকে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ (high risk behavior) বলে অভিহিত করা যায়। এটাকে তাদের ব্যর্থতা না বলে 'প্রবণতা' বলাটাই অধিকতর সঙ্গত হবে। এই প্রবণতা তাদের চরিত্রে এমনভাবে বিদ্যমান থাকে যে, অনেক সময় যৌনরোগ সংক্রমণ সংক্রান্ত শিক্ষা দিয়ে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেও তাদেরকে বিপজ্জনক যৌনসংযোগ থেকে নিবৃত করা যায় না।

ব্যক্তি ও সমাজকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য এদেরকে কনডম ব্যবহারসহ যেসমস্ত সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের পরামর্শ দেয়া হয় তা অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এদের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা প্রয়োজন।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের নানাবিধ প্রকাশ ঘটে অবৈধ বেপোরোয়া যৌনজীবন যাপনকারী এবং মাদকসেবীদের মধ্যে। এদের অনেকে সমকামী হবার কারণে এইডসসহ অন্যান্য যৌনরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমকামিতা একটি প্রবণতা, এটা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অহঙ্কার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত একটি বিচ্যুতি। অনেক ক্ষেত্রে এটাকে একটি জেনেটিক ট্রেইট বলে স্বীকার করেছে বিজ্ঞানীরা।

১২.২.১. এইচআইভি সংক্রমণে ব্যক্তিত্ব কী ধরনের প্রভাব রাখে?

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এইডস সার্ভিসের একটি গবেষণায় (Understanding the Role of Personality in HIV Risk Behavior) এইচআইভি সংক্রমণের সাথে ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় Personality characteristic & personality disorder in HIV risk behavior ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যক্তি চরিত্রের extroversion/ introversion এবং stability/ instability কে বক্তিত্বের ড্রাইভিং ফোর্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এই গবেষণায় ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা এভাবে প্রকাশ করা হয়–***'Personality is defined by emotional and behavioral characteristics or traits that constitute stable and predictable ways that an individual relates to, perceives and thinks about the environment & the self.'***

ব্যক্তির এক এক ধরনের প্রবণতা এক এক মাত্রায় থাকে এবং এর প্রভাবও থাকে এক এক রকম। কোন প্রবণতাকেই আক্ষরিক অর্থে ইতিবাচক বা নেতিকবাচক না বলে পরিবেশ ও সমাজের আকাঙ্ক্ষার সাথে তা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা বলাই ভাল। *যখন কারও প্রবণতা সমাজের ব্যাপক অংশের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং আচরণগত অনমনীয়তার কারণে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে ব্যক্তির কাজ ও প্রকাশের মধ্যে বৈকল্য ঘটায় তখন তাকে পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার বলে অভিহিত করা হয়।*

ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলোর ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি চরিত্রকে বহির্মুখি ও অন্তর্মুখি এবং সুস্থিরমতি ও অস্থিরমতি–এই চার ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। [সূত্রঃ Costa PT & Windiger TA (EDs). Personality Disorders & the Five-factor Model of Personality, Washington, APA, 1994, Eysenck HJ. J Pers 1990. 50 : 245; Lucas RE, et al. J Pers & Soc Psych 2000; 79 : 452]

ব্যক্তি চরিত্রে বিদ্যমান বহির্মুখিতা ও অন্তর্মুখিতার মাত্রাই ব্যক্তির উত্তেজনা ও ইনহিবিশন-জনিত সংকেত ও আচরণগত প্রকাশটি নিয়ন্ত্রণ করে।

১২.২.২. বহির্মুখীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে?

বহির্মুখীদের মধ্যে যেসমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

- বর্তমান ভিত্তিক চিন্তাভাবনা, সরাসরি অনুভব ভিত্তিক প্রকাশ ও কাজ, চটজলদি প্রতিদান ও পুরস্কার প্রত্যাশা ইত্যাদি।
- এদের চিন্তা চেতনা থাকে তাৎক্ষণিক আবেগ ও অনুভবের বাস্তবায়ন।
- এদের চেপে বসা চিন্তা এবং অন্যতম প্রেষণা থাকে তাৎক্ষণিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং শরীর ও মনের নানাবিধ চাপ থেকে দ্রুত পরিত্রাণ লাভ।
- এরা সামাজিক হয়, উত্তেজনা ভালবাসে।
- তাৎক্ষণিক ও হঠকারী আবেগ নির্ভর কাজ করতে এবং ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে।
- অনেক ক্ষেত্রে এরা বেপোরোয়া, আশাবাদী ও অস্থির হয়ে থাকে।

১২.২.৩. অন্তর্মুখীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে?

অন্যপক্ষে অন্তর্মুখীদের (introvert) মধ্যে যেসমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হল –

- এরা হয় অতীত ও বর্তমানমুখী।

- চেতনা নির্ভর ও পরিণামদর্শী।
- কাজ ও যুক্তি এদের তাৎক্ষণিক অনুভবকে অবদমিত করে।
- অন্তর্মুখী চরিত্রের ব্যক্তিরা অতীত অভিজ্ঞতার বিচার করে ভবিষ্যত অসুবিধাগুলো পরিহার করার চেষ্টা করে।
- এরা সতর্ক।
- যেসব কাজ ভবিষ্যত জীবনে অসুবিধা ঘটাতে পারে তা এরা এড়িয়ে যায়।
- এ শ্রেণীর ব্যক্তিরা উত্তেজনা বিমুখ ও শান্ত হয়ে থাকে।
- তাৎক্ষণিক আবেগকে এরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- এরা গোছানো ও বিশ্বস্ত হলেও নেতিবাচক বিষাদগ্রস্ত চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে।

১২.৩.১. স্থিরমতি ও অস্থিরমতি ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য কেমন হয়ে থাকে?

ব্যক্তিত্বের আরেকটি বড় মাত্রা হল স্থিরতা ও অস্থিরতা যা কি না চারিত্রিক বিভিন্ন মাত্রায় আবেগপ্রবণতা ও নিষ্ক্রিয়তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানসিকভাবে যারা স্থির তাদের আবেগের উত্থান হয় ধীরে ও মাত্রার মধ্যে এবং তারা দ্রুত ফিরে আসে নিজেদের অবস্থানে।

অপরদিকে, অস্থিরমতি ব্যক্তিদের আবেগ এমন তীব্র ও দ্রুত পরিবর্তনশীল হয় যা কি না তাদেরকে তাৎক্ষণিক আবেগ ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে অযৌক্তিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এদের মেজাজ অনেকটা পারদের মত ওঠানামা করে।

বহির্মুখী (Extroversion) ও অন্তর্মুখী (Introversion) এবং সুস্থিরমতি (Stability) ও অস্থিরমতি (Instability)– চার ধরনের চরিত্র তৈরি হয় বিভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যারা এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে বা হতে পারে তাদের বিপজ্জনক চারিত্রিক প্রবণতার সাথে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যারা অস্থির এবং বহির্মুখী তাদের মধ্যেই সর্বোচ্চ মাত্রায় এইচআইভি রিস্ক বিহ্যাভিয়র-এর প্রকাশ ঘটে।

১২.৩.২. অস্থিরমতি বহির্মুখী (Instable Extrovert) গ্রুপঃ

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্রিয়াটিক সার্ভিসের গবেষণা ও বিশ্লেষণে দেখা যায়, এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৬০ ভাগই বহির্মুখী ও অস্থির আবেগসম্পন্ন।

- এ ধরনের ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও আবেগ অনুভবের ওপর কাজ করে। এরা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

- এরা এতটা পরিবর্তনশীল যে এদের কাজ ও চিন্তাকে অনুমান করা সম্ভব হয় না।
- নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এদের চিন্তাভাবনা ও কাজের মধ্যে গভীর অসঙ্গতি।
- উচ্চ বুদ্ধিস্তর এবং এইডস সম্পর্কিত জ্ঞান এদেরকে বিপজ্জনক সংযোগ এড়াতে তেমন কোন সাহায্য করে না। মুহূর্তের আবেগ যাদের কাছে মুখ্য তাদের কাছে অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা গৌণ বলেই বিবেচিত হয়। বাস্তবতাকে ভুলে এরা তাৎক্ষণিক আনন্দ উপভোগ ও সাময়িকভাবে ব্যথা বেদনা ভুলে যাওয়াটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানসিক অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার কারণে এদের ফ্ল্যাকচুয়েটিং মুড (Fluctuating mood)-এ পরিবর্তন এমনভাবে ঘটে যে, এদের আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিও দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে।
- এ ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্নরা পরিকল্পনা করে কিছু করতে নারাজ থাকে এবং কনডম ব্যবহারে অমনোযোগী হয়ে থাকে। এরা সুরক্ষা ছাড়া বেপরোয়াভাবে পায়ুপথে ও যোনিপথে যৌনসংযোগ করে থাকে। এরা যৌন আনন্দের ওপর এতটা বেশি গুরুত্ব দেয় যে, যৌনবাহিত রোগের ভীতিটি এদের কাছে গৌণ হয়ে ওঠে।
- এরা কনডমের নানাবিধ সুবিধাগুলো মানতে নারাজ থাকে এবং উত্তেজনার মুহূর্তে কোন কিছুর দিকেই ফিরে তাকায় না।
- একই সাথে এ ধরনের অস্থির বহির্মুখীরা মাদক দ্রব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। মাদকের তাৎক্ষণিক আনন্দ এদেরকে ভুলিয়ে দেয় এসবের বিপজ্জনক পরিণাম। এরা নানাধরনের নেশাদ্রব্য চেখে দেখতে চায় এবং অনেক সময় অধিক পরিমাণে নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে।
- ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা মাদকগুলোর তীব্র উন্মাদনা থাকায় এরা এগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়টি এদের আবেগের নিকট গৌণ হয়ে ওঠে।

১২.৩.৩. সুস্থিরমতি বহির্মুখী (Stable extrovert) গ্রুপ:

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্রিয়াটিক সার্ভিস দলটি এইডস রোগীদের ওপর গবেষণা করে দ্বিতীয় যে গ্রুপটিকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছে তারা হল সুস্থিরমতি বহির্মুখী (Stable extrovert) গ্রুপ। এরা এইডস আক্রান্তদের মধ্যে ২৫ ভাগ।

- স্থিরমতি বহির্মুখীরা বর্তমানভিত্তিক আনন্দ-চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে।
- এদের আবেগ তেমন সুতীব্র ও সহজ উদ্দীপক না হলেও এরা বিপদে পড়ে ভিন্ন কারণে।
- মাঝে মাঝে এরা এমন নির্বিকার হয়ে ওঠে যে, এইডস সংক্রমণের বিপদ এদের কাছে মারাত্মক কিছু বলে গ্রাহ্য হয় না।
- এরা অতিরিক্ত আশাবাদী, নিজেদের প্রতি আস্থাবান এবং নিজেদের ধারণায় নিশ্চিত হবার কারণেই বিপজ্জনক আনন্দে নিপতিত হয়।

১২.৩.৪. অস্থিরমতি অন্তর্মুখী (Instable Introvert) গ্রুপঃ

হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মতে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে অন্তর্মুখীরা সবচেয়ে কম। কেননা, এরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। নেতিবাচক পরিণতির কথা চিন্তা করে এরা স্বাভাবিক বোধ ও বিবেচনার ওপর জোর দিয়ে থাকে। এরা নিজেদের জন্য নানাবিধ সুরক্ষা নিয়ে থাকে। এদের মধ্যে ইনস্ট্যাবিলিটি এবং স্ট্যাবিলিটি-ই বিপজ্জনক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাধীন রোগীদের ১৪ ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্তদের চরিত্রের মধ্যে ইন্ট্রোভারশন ও ইনস্ট্যাবিলিটি-এর সংমিশ্রণ খুঁজে পেয়েছে।

অস্থিরমতি অন্তর্মুখীরা দুঃশ্চিন্তাপ্রবণ, মুডি এবং পেসিমিসটিক। এরা ওষুধ ও যৌন সংসর্গ খোঁজে আনন্দের জন্য নয়, মনোবেদনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। এরা ভবিষ্যতের কথা ভাবে এবং বিপজ্জনক পরিণতির কথাও চিন্তা করে। তবে এটাও মনে করে যে, ভাগ্যের ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ নেই।

১২.৩.৫. সুস্থিরমতি অন্তর্মুখী (Stable Introvert) গ্রুপঃ

সুস্থিরমতি অন্তর্মুখী রোগীর সংখ্যা মাত্র ১ ভাগ। এদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে। এরা সুশীল। এরা বিপজ্জনক ও মাথা গরম কাজ পরিহার করে চলে। এদের অধিকাংশ রক্ত সঞ্চালন ও পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে এইডসে আক্রান্ত হয়েছে।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশ্লেষণটি তাদের দেশের নাগরিক ভিত্তিক হওয়ায় এর বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে। পাশ্চাত্যের এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে একটি ব্যাপক সংখ্যক আফ্রিকান বংশোদ্ভুত কালোরা এবং দরিদ্র শ্রেণীর হিস্পানিরা। স্বাভাবিকভাবেই এদের ব্যাপক অংশ বহির্মুখী (Extrovert) এবং অস্থিরমতি (Instable) চরিত্রের হয়ে থাকে।

তাই ব্যক্তিত্বের সাথে এইচআইভি রিস্ক প্রবণতার বিশ্লেষণে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জেনেটিক ট্রেইটের সম্পর্ক বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের যৌনরোগীদের মধ্যে একটি বড় অংশ অস্থিরমতি ও অন্তর্মুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সুবিবেচক, বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী ও বিদ্বানদের মধ্যে যৌনরোগের বিস্তারের বিষয়টিকে মানব চরিত্রের Unpredictable অংশ বা গবেষকদের চিন্তার অতীত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই শ্রেণীর মধ্যে জেনে শুনে যৌনরোগাক্রান্তদের সাথে মেলামেশার সম্ভাবনা কম।

১২.৪. এইডস রোগাক্রান্তদের মানসিক স্বাস্থ্য, মনোরোগ ও বিকারঃ

এইচআইভি আক্রান্তরা যে সমস্ত মানসিক জটিলতা ও রোগে আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে প্রধান হল মুড ও উদ্বেগজনিত সমস্যা। এছাড়া তারা আক্রান্ত হয় অর্গানিক মেন্টাল ডিজঅর্ডারে। অর্গানিক মুড ডিজঅর্ডারের মধ্যে ডেলিরিয়াম ও ডিমেনশিয়া অন্যতম সমস্যা। এছাড়া রয়েছে অর্গানিক সাইকোসিস।

এইচআইভি রোগের কারণে বোধ (Cognity) এবং মটর (Motor) ফাংশন উচ্চ পর্যায়ে ব্যহত হওয়ায় ডিমেনশিয়ার উৎপত্তি হয়ে থাকে। রোগ শনাক্ত করার পর রোগীর নিকটতম ব্যক্তিই রোগীর মধ্যে মানসিক পরিবর্তনগুলো সর্বপ্রথম লক্ষ করতে পারে। এদের সহায়তা ছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা কিছুটা কঠিন বটে। অনেক সময় অর্গানিক মুড ডিজঅর্ডার ও অর্গানিক সাইকোসিসে আক্রান্তদের মধ্যেই অধিক হারে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে থাকে।

এ সমস্ত অর্গানিক মানসিক ব্যাধিগুলো হতে পারে রোগীর ওষুধ, মেটাবলিক সমস্যা, মস্তিষ্কে রোগের সংক্রমণ, সুবিধাবাদী নানা জটিল রোগের সংক্রমণ এবং নতুনভাবে দেখা দেয়া ক্যান্সারের জন্য। এছাড়া নেশাদ্রব্য ব্যবহারের কারণেও ডেলিরিয়াম, অর্গানিক মুড ডিজঅর্ডার, সাইকোসিস, ডিমেনশিয়ার শুরু হতে পারে। রোগের সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে রোগীর ব্যক্তিত্ব, মুড, বোধ, ধারণা, চেতনা ইত্যাদির পরিবর্তনগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

রোগের কারণ নির্ণয়ের পূর্বে ওষুধ প্রয়োগে রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলেও মূল সমস্যাটি অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তবে সার্বিকভাবে এইচআইভি আক্রান্তের মানসিক চিকিৎসা করা কঠিন ব্যাপার। কেননা অনেক সময় অর্গানিক ও ফাংশনাল সমস্যাগুলোর লক্ষণ একইরকম হয়ে থাকে। যেমন, এইচআইভি এনকেফ্যালোপ্যাথি (মস্তিকের এইচআইভি সংক্রমণ)

এবং উচ্চ মানসিক চাপ উভয়ই গভীর বিষাদগ্রস্ততা বা ডিপ্রেসিভ সিনড্রম নিয়ে প্রকাশ হতে পারে।

অ্যালকহল ও কোকেনের মত নেশাদ্রব্য গ্রহণের পরেও বিষাদগ্রস্ততা একটি স্বাভাবিক পরিণতি। তবে যাদের সিডি-৪ কোষের সংখ্যা তিনশ'র ওপরে তারা সাধারণত ফাংশনাল মানসিক রোগ বা নেশা দ্রব্যের কারণে অসুস্থ হয়ে থাকে। যাদের সিডি-৪ কোষের সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিমিটারে দুশ'র নিচে, অথবা যাদের মধ্যে সুবিধাবাদী রোগের সংক্রমণ প্রকট হয়ে থাকে তারাই অধিক হারে অর্গানিক মনোব্যধিতে আক্রান্ত হয়।

১২.৪.১. ডেলিরিয়াম কী?

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মেটাবোলিক অসুস্থতার নামই ডেলিরিয়াম এবং এর প্রথম প্রকাশ ঘটে খিটখিটে মেজাজসহ নিদ্রা ও জাগরণে ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে। এর সাথে যে লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে তা হল চেতনার স্তরের দ্রুত পরিবর্তন, প্রাত্যহিক জীবনে মনোযোগের অভাব, অসংলগ্ন কথা বার্তা ও চিন্তা ইত্যাদি।

এতে স্থান, কাল ও পরিবেশ সংক্রান্ত বোধ এবং স্মৃতির মধ্যে ব্যঘাত ঘটে থাকে। সেই সাথে বিদ্যমান থাকে ইলিউশন বা ভ্রান্তিমূলক নানাবিধ অনুভব– যেমন অদৃশ্য কিছু দেখা কিংবা শ্রবণযোগ্য নয় এমন কিছু শোনা ইত্যাদি।

১২.৪.২. ডিমেনশিয়া কী?

বোধের বিপত্তি ও ডিমেনশিয়া সাধারণত লক্ষণবিহীন এইচআইভি পজিটিভ রোগীদের মধ্যে দেখা যায় না। তাদের মধ্যে যা দেখা যায় তা হল উৎকণ্ঠা ও নেতিবাচক মানসিক অবসাদ। সত্যিকার অর্থে স্নায়ু রোগের কারণে অনুভব ও বোধের বৈকল্য দেখা দেয় মারাত্মক পর্যায়ের এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে।

রোগের লক্ষণগুলো শুরু হয় মনোযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধীর গতি, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত কর্মকান্ডের মধ্যে সঙ্গতির অভাব (Complex sequential motor activity)-এর মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের রোগীদেরকে মনে হয় নির্জীব, বোধহীন এবং পারিপার্শ্বিক পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এদেরকে শনাক্ত করা কঠিন। রোগাক্রান্তদের পরিণতি নানারকম। উচ্চ পর্যায়ের ডিমেনশিয়ায় পার্থিব বোধ লুপ্ত হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রোগীর হাত পা শক্ত হয়ে আসে, প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ন্ত্রণও লোপ পায়।

১২.৪.৩. ম্যানিয়াক সিনড্রম কী?

অর্গানিক ম্যানিয়াক সিনড্রমের প্রকাশ গুরুতর এইডস আক্রান্তদের মধ্যে ঘটে থাকে। এইডস আক্রান্তদের আচরণ ও রোগের অবস্থা বুঝবার জন্য এবং তাদেরকে

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবস্থাভেদে রোগীর মানসিক ব্যধির প্রকাশগুলো বোঝা অত্যন্ত জরুরি। রোগের গভীরতা যখন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন ম্যানিয়াক সিনড্রমের প্রকাশ ঘটে খিটখিটে মেজাজ, নিদ্রাহীনতা, দ্রুতকথন বা উচ্চারণে অসুবিধা, অস্বাভাবিক বিরাটত্ববোধ (megalomania), লাগামহীন চিন্তা, ভয়ঙ্কর অস্থিরতা, নিয়ন্ত্রণহীন অসংযত ব্যবহার এবং অবদমনহীন নানা ব্যবহারের নগ্ন প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে এমআরআই জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য সম্ভাব্য রোগের কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এছাড়া যাদের পূর্ব থেকে বাইপোলার ডিজঅর্ডার রয়েছে তা শনাক্ত করা গেলে রোগের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পিসিপি জাতীয় নিউমোনিয়াতে উচ্চ মাত্রায় স্টেরয়েডও গুরুতর ম্যানিয়া তৈরি করে থাকে। এ্যামফেটামাইন, কোকেন ও এন্টি-ডিপ্রেস্যান্ট থেরাপি, এমনকি এইডসের ওষুধ জিডোভুডিন প্রয়োগেও ম্যানিয়ার প্রকাশ ঘটতে পারে।

মেজাজ ও উৎকণ্ঠাজনিত ডিজঅর্ডারগুলোর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে তা হল বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশনের লক্ষণগুলো যেভাবে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে প্রকাশ হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘুম ও ক্ষুধার দৃশ্যমান পরিবর্তন। এছাড়া দৈনন্দিন কাজ ও জীবনের আনন্দ থেকে সরে যাওয়া, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তৎপরতা নির্জীব হয়ে আসা, অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা, কখনও অপরাধবোধ ও মূল্যহীনতা বোধে ডুবে যাওয়া, নতুন করে সিদ্ধান্ত হীনতায় আচ্ছন্ন হওয়া, মনোযোগের অভাব অনুভব করা, আত্মহত্যার প্রবণতা, মৃত্যুচিন্তা ইত্যাদি ডিপ্রেশনের অন্যতম লক্ষণ। এ পর্যায়ে এদের ওজন হ্রাস হতে পারে, আবার ওজন বৃদ্ধিও হতে পারে।

মানসিক রোগের সাথে এইডস রোগের শারীরিক লক্ষণগুলোর সাজুয্য চিকিৎসক ও রোগীর নিকটজনের নিকট দুরূহ সমস্যা তৈরি করে। নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রকাশিত অর্গানিক মুড সিনড্রমের সাথে এইচআইভি এনকেফ্যালোপ্যাথি ও অন্যান্য স্নায়ুরোগে আক্রান্তদের লক্ষণ পার্থক্য করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটায়। যাদের মধ্যে কোকেন, অ্যালকহল, এ্যামফেটামাইন ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে মুড ডিজঅর্ডার ঘটছে, চিকিৎসা শুরুর পূর্বে সেগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। যাদের রোগ সংক্রমণের আগে থেকেই মুড ডিজঅর্ডার বিদ্যমান ছিল এবং যারা নেশাগ্রস্ত নয়, অথবা যাদের পরিবারের মধ্যে ডিপ্রেশন

প্রবণতা নেই তাদেরকে এন্টি-ডিপ্রেস্যান্ট থেরাপি প্রয়োগ করে দ্রুত সুচিকিৎসা দেয়া সম্ভব।

১২.৪.৪. বিয়োগ ব্যথা :

এইচআইভি আক্রান্তরা একদিকে নিকটজনদের হারিয়ে ব্যথাকাতর থাকে, অন্যদিকে চাকরি-বাকরি, বাসস্থান, সম্মান সব হারিয়ে গভীর বেদনার মধ্যে ডুবে যায়। নতুন করে যে আঘাত আসে তা কখনও তাদেরকে নির্বোধ ও জড় করে তোলে অথবা উদ্বেগ ও গভীর ব্যথার ঢেউয়ে নতুন করে নিমজ্জিত করে। এতে তারা হারিয়ে ফেলে ব্যথা মুছে ফেলার শক্তি। তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা ব্যথার সাথে বসবাসের অভ্যাস রপ্ত করে নেয়। যাদের মধ্যে পূর্ব থেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা কম থাকে এবং সামাজিক সমর্থন অপ্রতুল থাকে তাদের জন্য জীবন কঠিন হয়ে পড়ে।

মানসিক অসুবিধা প্রকট হলে সাইকোথেরাপির সঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য বেনজোডায়াজেপিন দিয়ে এ্যাংজাইটি, নিদ্রাহীনতা এবং দুঃখবোধের চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। আর যেখানে অপরাধবোধ এবং মূল্যহীনতা বোধ ভারী হয়ে দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটায় সেক্ষেত্রে এন্টি-ডিপ্রেস্যান্ট থেরাপি দেয়া যেতে পারে।

১২.৪.৫. আত্মহত্যার প্রবণতা :

আত্মহত্যার প্রবণতার সাথে রোগের গভীরতার তেমন সম্পর্ক না থাকলেও সম্পর্ক রয়েছে রোগের কষ্ট ও ক্ষতজনিত কারণে হতাশার সাথে। সেই সাথে নানাবিধ ব্যথাবোধ, গভীর হতাশা রোগীকে আত্মহননে উদ্বুদ্ধ করে। রোগী মনে করে এর মধ্যে দিয়েই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রোগজনিত নানা জটিলতাকে।

১২.৪.৬. এ্যাংজাইটি ইনসোমনিয়া :

আত্মহনন প্রবণতা রোধসহ রোগীর জীবনকে সহজ ও স্বাভাবিক করবার জন্য এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এইচআইভি আক্রান্তদের উৎকণ্ঠা ও নিদ্রাহীনতার সুচিকিৎসা প্রয়োজন। এ কারণে অসুবিধা যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, রোগীর স্বাভাবিক জীবন ও সামাজিক সম্পর্ক বিপন্ন হয় এবং সেই সাথে পেশাগত কাজে অচল হয়ে পড়ে, তখন ওষুধ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার বা উৎকণ্ঠাজনিত রোগের কারণগুলো অ্যালকহল, নিকোটিন, কোকেন, এ্যামফেটামাইন ব্যবহারসহ বেনজোডায়াজেপিন জাতীয় ঘুমের ওষুধ হঠাৎ করে ছেড়ে

দেবার কারণে বা অতিরিক্ত ক্যাফিন (চা, কফি, কোকো ইত্যাদি) গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া বা অন্য কোন রোগে মাথায় রক্ত সরবরাহ কমে আসলেও এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দেখা গেছে, এইচআইভি চিকিৎসায় ব্যবহৃত এন্টিরেট্রোভাইরাল (হার্ট থেরাপি) ওষুধগুলোর সাথে স্টেরয়েড এবং নাক খোলার জন্য ব্যবহৃত ডি-কনজেসটেন্ট বিপজ্জনক উৎকণ্ঠার কারণ ঘটায়।

১২.৪.৭. নিদ্রাহীনতা :

উৎকণ্ঠাজনিত আবেগ বা এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার অথবা ডিপ্রেসিভ সিনড্রম বা মানসিক অবসাদগ্রস্ততার কারণে নিদ্রাহীনতা ঘটা অতি স্বাভাবিক। এইডসের ওষুধ প্রয়োগেও নিদ্রাহীনতা ঘটে। ক্যাফিন এবং উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগেও নিদ্রাহীনতা ঘটে থাকে।

এছাড়া রোগে আক্রান্ত হবার পর কাজকর্ম ছেড়ে দেয়ায় দুর্বলতার কারণে এবং দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় ঘুমের ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ঘুমের সমস্যা হয়। এসব কারণে রোগীদের অনিদ্রা চিকিৎসায় দিবানিদ্রা পরিহার করে ঘুমের সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সেই সাথে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নিদ্রার পরিবেশ তৈরি করা। এছাড়া নিদ্রাহীনতার বিভিন্ন উদ্দীপকগুলো নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বিষাদগ্রস্ততা ও অবসাদ যখন নিদ্রাহীনতা ঘটায় তখন নরট্রিপটানিল-এর মত সেডেটিং এন্টিডিপ্রেস্যান্ট প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে এইডসের নানা সম্পর্ক

১৩.১.১. এইচআইভি আক্রান্তদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে?

এইচআইভি আক্রান্তদের নিজেদের জীবন তো বটেই, তাদের আশেপাশে যারা থাকে তাদের জীবনও একটা সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় নানা কারণে। সংকটের কারণ রোগীর শারীরিক অবস্থা, নানা জটিলতা এবং ভয়ভীতি। ভয়ভীতি এড়াবার জন্য এইচআইভি সংক্রমণ সংক্রান্ত কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সেই সাথে প্রয়োজন সাধারণ জ্ঞান বা কমনসেন্স নিঃসৃত একধরনের বিচারবোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা।

এসব ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো উদয় হয় তা হল– এইচআইভি আক্রান্তদের স্পর্শে, ছোঁয়ায় রোগ ছড়ায় কি না কিংবা তারা গৃহস্থালী জিনিসগুলো একত্রে ভোগ করতে পারবে কি না। আক্রান্ত ব্যক্তি সবার সাথে বিছানা, চেয়ার, সোফা, কুশন ইত্যাদিসহ বিনোদনের স্থানগুলো ব্যবহার করতে পারবে কি না। এসব প্রশ্নের উত্তর হল–তোয়ালে ও রুমালের মত বস্তুগুলো শেয়ার না করাই উচিত। টয়লেট পেপারটি আলাদা হওয়াই ভাল। তোয়ালে, বিছানার চাদর ও পরিধেয় কাপড় প্রতিবার ব্যবহারের পরে উষ্ণ সাবানপানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত অথবা তা লন্ড্রিতে ধৌত হওয়া উচিত।

১৩.২.১. আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসলে এইচআইভি ছড়াতে পারে?

যৌনরোগে আক্রান্তদের ছুঁলে, জড়িয়ে ধরলে কিংবা মালিশ করলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই। তবে শরীরে মারাত্মক কোন ক্ষত বা চর্মরোগ থাকলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, এইডস আক্রান্তের দেহ নিঃসৃত বিভিন্ন রস, বর্জ্য ও রক্ত দ্বারাই এইডস সংক্রমিত হয়ে থাকে। কাছাকাছি বসলে, জড়িয়ে ধরলে, হালকা চুমু দিলে এইডস হতে পারে– এটা ঠিক নয়।

১৩.২.২. একই কাপ, গ্লাস শেয়ার করলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু?

পরিবারে প্রত্যেকের গ্লাস-প্লেট সাধারণত আলাদাই থাকে। তবে সুনির্দিষ্ট করে এইডসের কারণে খাবার প্লেট আলাদা করার প্রয়োজন নেই। ব্যবহৃত প্লেটটি প্রতিবার গামলাগুলো কোনভাবেই শেয়ার করা উচিত নয়। আর পরিবারের যে কারও মুখে, ঠোঁটে, দাঁতের গোড়ায়, জিহ্বায় থাকতে পারে যেকোন ক্ষত। সাধারণত ঠোঁটে ও মুখের লালায় বিদ্যমান এইচআইভি'র পরিমাণ কম থাকে। তাই এ প্রক্রিয়ায় এইচআইভি সংক্রমণ একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা মাত্র। তবুও এর থেকে সামান্য মাত্রায় হলেও ভাইরাস নিঃসরণ হতে পারে। যেহেতু এ ধরনের

শেয়ারিং নানা ধরনের রোগ ছড়াতে পারে তাই এটা একেবারেই বর্জনীয় হওয়া উচিত।

১৩.২.৩. ভুলক্রমে আক্রান্তের টুথব্রাশ ব্যবহার করলে কী হতে পারে?

আক্রান্তের টুথব্রাশ ব্যবহার করা মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয় এবং কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। কেননা, এটা বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়াতে পারে। তবে এইডসের ভাইরাস যেহেতু লালায় খুব কম থাকে, এ কারণে শুকিয়ে গেলে সহজেই ভাইরাস মারা যায়। আবার টুথপেস্টের কেমিক্যালেও ভাইরাসগুলো মারা যেতে পারে। তাই এ প্রক্রিয়ায় এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা কম।

ট্রথব্রাশ ও রেজার, মলদ্বারে ও যোনিপথে ব্যবহৃত পিচকারী, এনেমা (enema) ক্যান এবং অন্যান্য যা কিছু রোগীর শ্লেষ্মা, রক্ত বা অন্যকোন তরল নিঃসরণ দ্বারা সিক্ত হতে পারে তা এককভাবে কেবল রোগীই ব্যবহার করবে, অন্য সবার জন্য তা বর্জনীয়।

১৩.৩.১. এইচআইভি আক্রান্তের ব্যবহৃত টয়লেট থেকে রোগ ছড়াতে পারে?

এটা সত্যি যে, এইচআইভি আক্রান্তদের মলমূত্র ও বর্জ্যে কিছু মাত্রায় ভাইরাস বিদ্যমান থাকে। তবে তা আক্রান্তের রক্ত, বীর্য ও যোনিরসের তুলনায় অনেক কম। তাই টয়লেট ব্যবহারের পূর্বে স্বাভাবিকভাবে পরিষ্কার করে তা পুনঃব্যবহার করলে এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। কমোডের উপরিভাগে বা বসার স্থানে (সিটকভার) বা অন্যত্র যে সামান্য পরিমাণ ভাইরাস থাকতে পারে তা একজন সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রান্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। আর দুর্ঘটনাক্রমে যদি টয়লেটটির সিট বা বসার স্থান আক্রান্তের রক্তে সিক্তও থাকে বা বর্জ্যে এমনভাবে নষ্ট থাকে যে একজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে তা লেগে যায়, সেক্ষেত্রেও শরীরের কোন কাটা ছেঁড়া, ঘা, ক্ষত ইত্যাদির উপস্থিতি ছাড়া সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। সরাসরি রক্ত বা বর্জ্য শরীরের বিস্তৃত জায়গায় লেগে গেলে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষীণ সম্ভাবনা (শতকরা ০.১ ভাগ) থাকে।

মলমূত্র ত্যাগের পর টয়লেট পেপার ব্যবহার করলে তা বিশেষ ব্যাগে রাখতে হবে যাতে তা অন্য কারও সংস্পর্শে না আসে। এছাড়া ধৌতকার্যের পর একদিকে যেমন নিজের হাত ধুতে হবে, তেমনি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট অথবা ক্লোরিনের সাহায্যে হাতের সংস্পর্শে আসা ট্যাপটি ধুয়ে ফেলতে হবে। বিদেশে নানা ধরনের সেন্সর যুক্ত নন-টাচ ট্যাপ রয়েছে। কনুই প্রয়োগ করে খোলা বা বন্ধ করা যায় এমন ট্যাপও রয়েছে।

বাথরুমের যেসমস্ত স্থানে রোগীর বর্জ্যের ছোঁয়া আসতে পারে তার সবকিছুই তাৎক্ষণিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। শাওয়ার, সিঙ্ক, পানির টিউব, ট্যাপ, সবকিছু ৫.২৫ ভাগ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। একভাগ হাইপোক্লোরাইট একশ'ভাগ পানিতে মিশিয়ে (অর্থাৎ ২৫ লিটার পানিতে ২৫০ মিলিলিটার

হাইপোক্লোরাইট মিশিয়ে) সব কিছু ধুতে হবে। রোগীর ড্রেসিং, ডায়াপার, প্যাড, টিস্যু ইত্যাদি বর্জ্যগুলো রোগ ছড়াতে পারে ভেবেই সেভাবে বিশেষ ধরনের ব্যাগে রেখে ধ্বংস করা উচিত।

দরজার হাতল, কল, ফ্লোরসহ স্পর্শে আসে এমন জিনিসগুলো খুব সামান্য পরিমাণ ভাইরাস দূষিত হলেও হতে পারে, তবে শুকনো অবস্থায় ভাইরাসগুলো মরে যায়। ট্যাপের গরম পানি কিংবা ক্লোরিনযুক্ত পানি ভাইরাসকে মেরে ফেলতে সক্ষম। ব্লিচিং পাউডার অথবা হাইপোক্লোরাইট দিয়ে ফ্লোর, দরজার নব, কল ইত্যাদি মুছে ফেললে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে।

১৩.৪.১. এইচআইভি আক্রান্তের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে গেলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

এইচআইভি আক্রান্তের তরল নিঃসরণ সুস্থ ব্যক্তির শরীরের রক্তে প্রবেশ করলেই এইডস রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সময় সাধারণ সাবধানতাই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। অবশ্য রক্ত ও বর্জ্য পরিষ্কারের সময় ল্যাটেক্স বা রাবার হ্যান্ডগ্ল্যাভস পরিধানসহ ডিসপোজাল সংক্রান্ত বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৩.৫.১. এইচআইভি আক্রান্তের হাঁচি-কাশি কি সংক্রামক?

হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে। ব্যবহৃত হাত ধুয়ে ফেলা উত্তম। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মানতে হবে। যেমন টিস্যুটি একটি ব্যাগে ফেলতে হবে, ব্যবহৃত রুমালটি ক্লোরিন পানিতে ধুতে হবে অথবা সিদ্ধ করতে হবে। সাবধানে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে ফেললেও তা ভাইরাসমুক্ত হয়।

১৩.৫.২. আক্রান্তের মূত্র গায়ে লাগলে কি এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে?

অক্ষত ত্বকে লাগলে কিছুই হয় না। তবে ঠোঁটে বা মুখগহ্বরে যাতে না যায়, তা খেয়াল রাখতে হবে।

১৩.৫.৩. মলমূত্রে ভাইরাস কতটা থাকে?

মানুষের মলমূত্রে যে পরিমাণ এইচআইভি থাকে তা তুলনামূলকভাবে রক্ত, বীর্য ও যোনিরসের চেয়ে অনেক কম। এ কারণে সাধারণত এইডস আক্রান্তদের লালা, প্রস্রাব ও পায়খানার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না।

১৩.৫.৪. এইচআইভি আক্রান্তের দেহে বিদ্যমান ঘা বা ক্ষত ছুঁলে এইচআইভি হবে কি?

অক্ষত ত্বকের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব। তবে কোন অবস্থাতেই ল্যাটেক্স গ্ল্যাভস ছাড়া আক্রান্তের ক্ষত স্পর্শ করা উচিত নয়– রোগীর শুশ্রূষাকারীসহ স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তার স্বার্থে। সাধারণভাবে এইডস আক্রান্তের রস নিঃসৃত হয় এমন

স্থান স্পর্শ করা বা নিকট যোগাযোগ স্থাপন করা একেবারেই উচিত নয়।

১৩.৬.১. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি কি রান্নাঘরে যেতে পারবে?

হ্যাঁ, কার্যক্ষম ও সুস্থ হলে যেতে পারবে। নিজেদের পরিবারের মধ্যে এ ধরনের ব্যক্তি সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে সতর্কতার সাথে খাবার তৈরি করতে পারবে। তবে ব্যবহৃত হাঁড়িপাতিল, চামচ, প্যান ইত্যাদি পুনঃব্যবহারের পূর্বে ধুয়ে ফেলতে হবে।

রান্নাঘরগুলো প্রতিবার ব্যবহারের পরে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে অর্ধভুক্ত খাবার, খাবারের কণা এগুলো যেন কোথাও পড়ে না থাকে। অন্যান্য ঘর এবং বাথরুম মপ (মোছার জন্য ব্যবহৃত কাপড় বা ফাইবার) বা স্পঞ্জ দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। এগুলো কখনই কিচেনে আনা যাবে না এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো কিচেন বেসিন বা সিঙ্কে ধোয়া যাবে না।

১৩.৭.১. আক্রান্ত রোগীদের জন্য খাবার দাবার সংক্রান্ত কী ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন?

খাবার আগে ও পরে হাত মুখ ধুতে হবে, ব্যবহৃত জিনিসগুলোকেও ধুয়ে ফেলতে হবে। নিজের আলাদা তোয়ালে, বিছানার চাদর ব্যবহার করতে হবে। এগুলো ব্যবহারের পর ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোয়ার আগে অন্য কারও ব্যবহার করা উচিত নয়।

সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে, সিদ্ধ না করে, কাঁচা জিনিসের ছাল না ছিলে এবং ভাল করে না ধুয়ে খাওয়া উচিত নয়। অর্গানিক খাবারগুলো যা কি না পশু এবং মানব মলের তৈরি সার প্রয়োগে উৎপাদিত হয় তা পরিহার করা উচিত। অর্গানিক লেটুস একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। অর্গানিক খাবারগুলোর মধ্যে যেসব জীবাণু থাকতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হল সালমোনেলা এবং হেপাটাইটিস-এ। এ দুটো টাইফয়েড ও জন্ডিস রোগ ছড়িয়ে থাকে।
অনেকে কাঁচা ঝিনুক খেয়ে থাকে। ঝিনুকসহ জলজ অনেক খাবারে কলেরা জীবাণু থাকে। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ইমিউন প্রতিরোধ কম থাকায় কলেরাজনিত মৃত্যুর হার বিরাট হয়ে থাকে। এছাড়া এটি সেপসিস (Sepsis) সিনড্রমও ঘটিয়ে থাকে।

দুধ, দই, পনির ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাবার পাস্তুরিত না হলে এগুলো সালমোনেলা, ব্রুসেলা রোগ ছড়াতে পারে। সালমোনেলার কারণে টাইফয়েড, ব্রুসেলার কারণে ব্রুসেলোসিস রোগ হয়।

১৩.৮.১. এইডস রোগাক্রান্তদের খাদ্য, পানীয়-এর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যমান:

এইডস রোগাক্রান্তদের খাদ্য, পানীয়-এর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যমানের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। পানি ও খাবারে

বিদ্যমান যে সব পরজীবী একজন সুস্থ লোককে রোগাক্রান্ত করতে পারে না, তা এইচআইভি আক্রান্তদের দেহে মারাত্মক রোগ ঘটাতে পারে। একারণে এইচআইভি আক্রান্তদেরকে ট্যাপ ওয়াটার বা সাধারণ পানি ব্যবহারে নিষেধ করা হয়। তাদেরকে ফুটানো পানি ফিল্টার করে ব্যবহার করতে হবে সবসময়।

১৩.৯.১. খাবার হোটেল ও রেস্টুরেন্ট থেকে এইচআইভি ছড়াবার সম্ভাবনা কতটুকু?

খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এইডস ছড়ায় এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তবুও সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বাবুর্চি, ওয়েটার এবং ক্যাটারারদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম নিষেধগুলো হল পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত। যারা প্লেট ও খাবার দাবার নাড়াচাড়া করবে, তাদের সবাইকে খাবার ছোঁয়ার পূর্বে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। কোন কর্মী পেটের পীড়া ও বুকের সমস্যায় আক্রান্ত হলে কাজ বন্ধ রাখতে হবে। খাবার তৈরি এবং পরিবেশন করতে হবে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী। যাদের হাতে ঘা থাকবে অথবা কষ নিঃসৃত হয় এমন ত্বকরোগ থাকবে তারা কাজে নিবৃত থাকবে যতক্ষণ না তারা ভাল হয়ে উঠছে। দুর্ঘটনাক্রমে যারা আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং যাদের কাটা-ছেঁড়া থেকে রক্ত ও কষ ঝরবে তারাও কাজে বিরত থাকবে, ভাল না হওয়া পর্যন্ত। কোন খাবারে শরীরের রস, কষ বা রক্ত লেগে গেলে তা ফেলে দিতে হবে।

১৩.৯.২. হোটেলে ব্যবহৃত বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি কি এইচআইভি ছড়াতে পারে?

বিশ্বব্যাপী প্যানডেমিক আকারে এইচআইভি সংক্রমণের সাথে সাথে হোটেলে বিছানার চাদর, বালিশের কভার, তোয়ালেগুলো ব্যবহারের পূর্বে তা লন্ড্রি ধৌত কি না জেনে নেয়া প্রয়োজন। বাথরুম ব্যবহারের পর তা সাধারণ ডিটারজেন্ট, ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন ইত্যাদির মাধ্যমে ধৌত হয়েছে কি না তা জেনে নেয়া প্রয়োজন। এ জাতীয় জিনিসগুলো যদি ভালভাবে ধোয়া থাকে তবে তা এইচআইভি ভাইরাস বহন করতে পারে না। এ কারণে হোটেলের বিছানা ও অন্যান্য সুবিধাদি এইডস আক্রান্ত কেউ ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে কোন গ্রাহকের জন্য তা এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা জাগায় না। ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ লন্ড্রি প্রক্রিয়ায় এইচআইভি ভাইরাস বাঁচতে পারে না। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে ধোপারা ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ কিংবা সিদ্ধ করে যেভাবে কাপড় ধোয়, তাতেও ভাইরাস কোনভাবেই বাঁচবে না। তবে এইচআইভি আক্রান্তদের রক্তসিক্ত ও বর্জ্য মিশ্রিত কাপড় চোপড় সংগ্রহ এবং জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সবসময় সর্তকতার সাথে পালন করতে হবে।

১৩.১০.১. রেফ্রিজারেটর কি রোগ ছড়াতে পারে?

হ্যাঁ পারে। ঠিকমত পরিষ্কার না করলে এতে নানা ধরনের জীবাণু ও ভাইরাসসহ ছত্রাক বাসা বাঁধে। ফ্রিজের

ভেতরটা নিয়মিত সাবান-পানি বা বাইকার্বোনেট দিয়ে ধোয়া উচিত।

১৩.১১.১. এইচআইভি সংক্রমণে বাসস্থান কোন প্রভাব বিস্তার করে?

স্যাঁতসেঁতে জায়গাগুলো বিশেষ করে পুরানো বাথরুম, স্টোর ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন ধরনের মোল্ড বা ছত্রাক জন্মায়। এগুলো দুর্বল ব্যক্তির দেহে কঠিন কিছু রোগ তৈরি করে। এ ধরনের একটি রোগ অ্যাসপারজিলোসিস। এসব স্থানগুলো সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত।

১৩.১২.১. মশা দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে?

অনেকগুলো ঘাতক ব্যধি মশা দ্বারা বাহিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ম্যালেরিয়া, মেনিনজাইটিস, এনকেফ্যালাইটিস, ডেঙ্গু ইত্যাদি। তবে এসব ক্ষেত্রে মশা রোগের মূল কারণ ভাইরাস বা প্যারাসাইটের জীবনচক্রের অংশবিশেষ হিসাবে কাজ করে। এসব ক্ষেত্রে মশা ছাড়া রোগ বিস্তারটি সম্ভব হবে না।

এক সময় ধারণা করা হত, এইডস রোগাক্রান্তকে মশা কামড়ালে সেই মশার মাধ্যমে সুস্থ লোক রোগাক্রান্ত হতে পারে। পরবর্তীতে গবেষণায় দেখা গেছে, মশার শরীরে ভাইরাস বেড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া রক্তের যে সামান্য অংশ মশার হুলে লেগে থাকে তা যথেষ্ট ভাইরাসও বহন করতে পারে না। মশা কখনই শুষে নেয়া রক্ত অন্যের দেহে ঢুকিয়ে দেয় না।

এসব কারণে মশা দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণের বিষয়টি একটি অবাস্তব কল্পনা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। মশার মত অন্যান্য কীটপতঙ্গও এইচআইভি ভাইরাস ছড়াতে অক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে কারণ Fleas-ও অন্তর্গত।

১৩.১২.২. পোষা প্রাণী ও অন্যান্য জীবজন্তু কর্তৃক এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু?

এইচআইভি আক্রান্তরা নানা রকমের জীবজন্তু পুষে থাকেন। হঠাৎ করে এসব জীবজন্তু পরিত্যাগ করা সম্ভব না হলেও এটা জানতে হবে যে, জীবজন্তু ও পশুপাখিরা এমন সব পরজীবী ও ভাইরাস বহন করে যা সুস্থ লোকের জন্যই ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আর যখন ইমিউনিটি নিম্ন পর্যায়ে থাকে তখন তো এ বিপদের সীমা প্রায় অসীম হয়ে ওঠে।

অনেকেই বিড়াল পুষে থাকেন। টক্সোপ্লাজমোসিস নামক এক প্রকার রোগ বিড়াল বাহিত হয়ে থাকে। এ রোগের প্যারাসাইট টক্সোপ্লাজমা গোনাডি বিড়ালের মলে থাকে। বিড়াল যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে সেখানে এই টক্সোপ্লাজমার সিস্টগুলো (cyst) থাকে। তবে বিড়ালের

শরীর থেকে বেরুবার পর ইনফেকশাস স্টেজে পৌঁছাতে বেশ ক'দিন সময় লাগে।

টক্সোপ্লাজমোসিস কেবল সাধারণ অসুখই তৈরি করে না, এটা মানুষের চোখ ও মস্তিষ্ককেও আক্রান্ত করে। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হলেও মস্তিষ্ক ও চোখে এটা অপরিবর্তনীয় অসুবিধা তৈরি করতে পারে। এছাড়া বিড়ালের লালাযুক্ত লোম অনেকের জন্য মারাত্মক অ্যালার্জি তৈরি করে থাকে। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যারা অ্যালার্জিতে ভোগেন তাদের জন্য এইসব বাড়তি উপদ্রব শ্বাসকষ্ট তৈরি করতে পারে এবং বুকে সুবিধাভোগী সংক্রমণ তৈরির সুযোগ করে দিতে পারে। বিড়ালের সংস্পর্শে আসার ফলে ব্যাসিলারি এ্যানজিয়োম্যাটোসিসও হতে পারে। তাই বিড়ালের আস্তানা ও ব্যবহৃত জিনিসগুলো প্রতিদিন ধুয়ে ফেলা উচিত। তবে লেখক মনে করেন, যে রোগীকে বিড়ালকে সংস্পর্শে না আনাই উত্তম।

হাঁস, মুরগী, পাখি নানাবিধ ভাইরাস বহন করে। এ ধরনের ভাইরাস শূকর, বানর, বেজি ইত্যাদিতেও থাকে। এই সমস্ত পাখি ও জীবজন্তু কয়েক ধরনের নন-হিউম্যান করোনা ভাইরাস বহন করে যা মানুষের মধ্যে মারাত্মক সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়া ঘটাতে পারে।

কোন কোন পাখি ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স ও হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম ছড়িয়ে থাকে। ক্রিপ্টোকক্কাস মারাত্মক ধরনের নিউমোনিয়া তৈরি করে। হিসটোপ্লাজমা যক্ষ্মা সদৃশ ঘাতক রোগ তৈরি করে। এছাড়া ক্ল্যামাইডিয়া সিটসেই (Psittaci) ছড়ায় কোন কোন পাখি। একারণে পাখির খাঁচা, মল সবকিছু রোগীর থেকে অনেক দূরে রাখা উচিত। গরু ছাড়া এক ধরনের মাছও যক্ষ্মার জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। এসব থেকে সাবধানতা প্রয়োজন।

শেয়াল, কুকুর, বিড়াল, বাদুর ইত্যাদি জন্তু এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়দেবার পর সেই রক্ত মুখে নিয়ে সুস্থ লোকের শরীরে ঢুকিয়ে দেবে– এটি একটি কষ্টকল্পিত চিত্র মাত্র। বাস্তবে এ ধরনের সংক্রমণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১৩.১৩.১. এইচআইভি আক্রান্তকে চুমু খেলে রোগ সংক্রমিত হতে পারে?

সাধারণত ত্বকে শুকনোভাবে চুমু খেলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে না। এমনকি মুখের লালার সাথে সংযোগ ঘটে এমনভাবে চুমু খেলেও এইচআইভি সংক্রমণের যে সম্ভাবনা থাকে তাকে তাত্ত্বিক পর্যায়েরই বলা যেতে পারে। তবে মুখের অভ্যন্তরে, জিহ্বায় কিংবা দাঁতের গোড়ায় ঘা বা ক্ষত থাকলে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে। বিভিন্ন রকমের যৌনরোগে মুখে ও ঠোঁটে এ ধরনের ঘা হতে পারে।

১৩.১৩.২. এইডস আক্রান্ত নর্তকীর সান্নিধ্যে এলে অথবা নৃত্যসঙ্গী এইডস আক্রান্ত হলে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

আগেই বলা হয়েছে যে, ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছাড়া এইচআইভি ছড়ায় না। সতুরাং হোটেল ও ক্লাবসহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অজানা কারও সঙ্গে নৃত্যে বা পারফরমিং আর্ট-এ অংশগ্রহণ করলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই। তবে শরীরে কোন ক্ষত থাকলে এবং ক্ষত দিয়ে কষ বের হলে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
শুধু নাচলে নয়, এইডস আক্রান্তদের গা ঘেঁষলে, গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলে, চিমটি কাটলে কিংবা হালকা করে ত্বক, কান ইত্যাদি কামড়ে দিলে এইডস সংক্রমণের সম্ভবনা থাকবে না, যতক্ষণ না আক্রান্তের রক্ত তার সঙ্গীর মিউকাস আবরণকে সিক্ত করবে। যৌনক্রিয়া ছাড়াও যোনিরস ও বীর্য শরীরের মিউকাস আবরণ অথবা শরীরের কোন ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে এলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি করবে।

১৩.১৩.৩. সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলে এইচআইভি ছড়াতে পারে?

সুইমিং পুলে ক্লোরিনযুক্ত পানি এবং উষ্ণ পানির প্রবাহ সহজেই এইচআইভিকে মেরে ফেলে। এ জাতীয় পানিতে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যদের সাথে যৌথভাবে স্নান করলেও তার যৌনাঙ্গে বিদ্যমান ভাইরাস বা অন্য উপায়ে শরীর থেকে নিঃসৃত ভাইরাস দ্বারা অপর ব্যক্তির আক্রান্ত করার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কাছে।

১৩.১৩.৪. জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করতে গিয়ে এইডস সংক্রমণ হতে পারে?

এইচআইভি আক্রান্তের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে ভাইরাস থাকবার সম্ভাবনা কম হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে যন্ত্রপাতি থেকে এইচআইভি সংক্রমণের বিষয়টি কেবল তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব। কাটা ছেঁড়া যুক্ত হাত দিয়ে সাধারণভাবে আক্রান্তের ছোঁয়া দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

১৩.১৩.৫. সিনেমা, টিভি ও অ্যাডফার্মের বিভিন্ন হাউসের মেকাপ রুমগুলোতে অথবা পেশাদার মেকাপম্যানদের ব্যবহৃত কীট মারফত এইডস ছড়াবার সম্ভাবনা কতটুকু?

একই ব্রাশ, চিরুনি ইত্যাদি বহুজন ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ ছড়াতে পারে। ঘটতে পারে ত্বক ও চোখে বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ। তবে এ প্রক্রিয়ায় এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় শূন্য-এর কাছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, চোখের পানিতে সামান্য পরিমাণ এইচআইভি থেকে থাকে। এ কারণে আক্রান্তের চোখের জল কারও হাতে লেগে রোগের সংক্রমণ না ঘটলেও অসুস্থ ব্যক্তির চোখ থেকে সুস্থ ব্যক্তির চোখে ভাইরাস সংক্রমণের একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা থেকেই যায়।

১৩.১৪.১. সিগারেট শেয়ারিং-এর মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে?

সিগারেট শেয়ার করার মাধ্যমে সাধারণত এইচআইভি সংক্রমণ না হলেও অন্যান্য রোগ সংক্রমিত হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল ধূমপান এইচআইভি সংক্রমণের একটি কো-ফ্যাক্টর। এছাড়া ধূমপান ক্যান্সার উদ্দীপকও বটে। শেয়ারিং-এর কারণে ইমিউন কম্প্রোমাইজড্ এইচআইভি আক্রান্ত রোগী নতুন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং আক্রান্তের মুখে ও গলায় আশ্রয় নেয়া কিছু কিছু সুবিধাভোগী সংক্রমণ অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফেটে যাওয়া ঠোঁটের সংযোগে এসে লালাসিক্ত সিগারেট যে অল্পমাত্রার ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে, সে সম্ভাবনাটিও একেবারে অবাস্তব নয়।

১৩.১৫.১. হস্তমৈথুনে কি এইডস ছড়ায়?

হাতে কোন কাঁটা-ছেঁড়া এবং যৌনাঙ্গে কোন ঘা বা ক্ষত না থাকলে হস্তমৈথুনের দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই।

১৩.১৫.২. এইচআইভি আক্রান্তদের বীর্য সরাসরি গায়ে লাগলে কী হতে পারে?

বীর্যের মধ্যে অসংখ্য ভাইরাস থাকায় তা বিপজ্জনক। অক্ষত ত্বক ভেদ করে এইচআইভি সংক্রমণ হবে না– এটা সত্য জেনেও লক্ষ করা যায় না এমন ক্ষতের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি নেয়া একেবারেই উচিত নয়।

১৩.১৬. এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষা জীবন :

১৩.১৬.১. এইচআইভি আক্রান্তরা স্কুল-কলেজে গেলে কোন সমস্যা হবে কি?

এইচআইভি আক্রান্ত শিশু, কিশোর ও তরুণরা কীভাবে পড়াশুনা চালাবে এবং তারা নিয়মিত স্কুল-কলেজে যাবে কি না এটা সবার জন্যই একটি প্রশ্ন। পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকা বা শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হওয়া কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে নানা নিয়ম শৃঙ্খলা ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়াশুনার কাজ চালাতে তাদের শারীরিক অবস্থা ও সামর্থ্য বিঘ্ন ঘটাবে কি না সেটা অভিভাবক, শিক্ষক এবং চিকিৎসক সবাইকে ভাবতে হবে। চিকিৎসককে দেখতে হবে যে, রোগী তার ইমিউনোলজিক অবস্থার কারণে নানাবিধ রোগ আক্রান্ত হবে কি না।

১৩.১৬.২. এইচআইভি আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের জন্য কতটা ঝুঁকি তৈরি করবে?

সাধারণ মেলামেশায় এবং স্কুল কলেজের প্রাত্যহিক কাজের মাধ্যমে এইডস ছড়িয়েছে এমন কোন প্রমাণ কোথাও নেই। তবে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিটা বিবেচনায় আনতে হবে নানা কিছু বিচার করে। শিক্ষার্থীর বয়স, যৌন আচরণ, সহপাঠীদের আচরণ, রোগের অবস্থা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌনসংযোগের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ভাবতে হবে।

একেবারে ছোট শিশু যারা নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেনে যাবে তাদের টয়লেট ট্রেনিং এবং বয়সানুপাতিক বুদ্ধিবিকাশের বিষয়টি ভাবতে হবে। সার্বিকভাবে ভাবতে হবে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠাবার ঝুঁকি ও লাভের

বিষয়টি। সেই সাথে চিন্তা করতে হবে আইনগত ও নৈতিক দায়-দায়িত্বের কথা। স্কুল-কলেজে এমন কোন কার্যক্রম নেই যাতে সাধারণভাবে একজনের থেকে আরেকজনের এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে। শ্রেণীকক্ষ, জিমনেশিয়াম বা খেলার মাঠে স্বাভাবিক মেলামেশার মাধ্যমে এইডস ছড়িয়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। আর যেহেতু আক্রান্ত ছাত্র অন্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে না, তাই স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষকে তার এইচআইভি স্ট্যাটাস সংক্রান্ত তথ্য দেয়াটা বাধ্যতামূলক কিছু নয়। তবে তার শারীরিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য এবং বিধিনিষেধ জেনে নেবার জন্য তাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে নিজস্ব চিকিৎসকের সাথে। কোন কারণে স্কুল কলেজের তরফ থেকে মেডিক্যাল কেয়ার নিতে গেলে তাকে অবশ্যই সঙ্গোপনে তার অবস্থার কথা জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। আর কর্তৃপক্ষ তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

শিক্ষার্থী নিম্ন শ্রেণী বা উচ্চ শ্রেণী যেখানেই অধ্যয়ন করুক না কেন সবার নিরাপত্তার জন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষক, কর্মচারি এবং অভিভাবক সকলকেই এইডস সংক্রমণ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে হবে।

এসব কারণেই স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে এইডসসহ বিভিন্ন রোগ সংক্রান্ত পাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যৌনরোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান দেয়া প্রয়োজন। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিরাপদ যৌনজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞানদান করা প্রয়োজন।

এইচআইভি আক্রান্তরা সহজেই বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হতে পারে, এ সচেতনতাও প্রয়োজন সবার মধ্যে।

১৩.১৬.৩. আক্রান্তের রোগের বিষয়টি গোপন করার প্রয়োজন আছে কি?

শিক্ষার্থীর এইচআইভি স্ট্যাটাস এবং তার পারিবারিক পরিস্থিতির গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত। কেননা এই গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে সতীর্থরা তাকে এড়িয়ে চলবে; ভয় পাবে, এমনকি ঘৃণাও করতে পারে। এতে আক্রান্ত শিক্ষার্থী নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বাতিল মনে করে গভীর মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হবে। শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার জন্য, বিশেষ করে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষের দু'একজনকে তার অবস্থার কথা জানাতে হবে। তবে এই জানাজানির বিষয়টি যেন কিছুতেই অন্যান্য ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে না পৌঁছে।

১৩.১৬.৪. কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্রগুলোতে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

এসব কেন্দ্রে কেউ যদি এইচআইভি আক্রান্ত হয় তাহলে বিশেষ সচেতনতা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। কেননা এদের মধ্যে নানা বিপজ্জনক আচার আচরণ লক্ষ করা যেতে পারে স্বাভাবিকভাবেই। এদের অনেকেই অকালপক্ব এবং সময়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়। ইনজেকশনের মাধ্যেমে নেশাগ্রহণ, শরীরে

উল্কি আঁকাসহ এমন সব কাজে তারা ব্যাপৃত হতে পারে যা এইচআইভি সংক্রমণকে সহজ করে দেয়। এসব কারণে আক্রান্ত ও অনাক্রান্তের মধ্যে এইচআইভি সংক্রান্ত জ্ঞানদান এবং বিপজ্জনক প্রবণতা সম্পন্নদের এইচআইভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় পরীক্ষা করাতে সম্মত হবে তাদেরও স্ক্রিনিং করিয়ে নেয়া প্রয়োজন। এইচআইভি'তে আক্রান্ত হয়েছে অথচ লক্ষণ দেখা দেয়নি এমন অনেকের চিকিৎসা শুরু করে দেয়াও প্রয়োজন।

এসব কেন্দ্রে যাতে যৌনসংযোগ না ঘটে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বাভাবিক যৌনবোধ, যৌনচরিত্র এবং যৌনরোগ সংক্রান্ত জ্ঞান দান করাও প্রয়োজন। এই শিক্ষাদান কর্মসূচি কেন্দ্রের কর্মী এবং আশ্রয় গ্রহণকারী কিশোর কিশোরীসহ সবার জন্যই প্রয়োজন।

এসব কেন্দ্রেও আক্রান্তের রোগের অবস্থা সংক্রান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে দু'একজন স্বাস্থ্যকর্মীর গোপনভাবে জানা থাকা প্রয়োজন আক্রান্তকে কী ধরনের সুরক্ষা দিতে হবে। যেমন চিকেনপক্স ও হারপেসের মত সাধারণ রোগগুলোর সংক্রমণ ঘটলে এইচআইভি পজিটিভকে বিশেষ প্রতিরক্ষামূলক চিকিৎসা দিতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে রোগ থেকে বাঁচাবার জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। তবে সবকিছুই করতে হবে এমন কৌশলে যাতে আক্রান্তের এইচআইভি স্ট্যাটাস অন্যরা জানতে না পারে।

অধ্যায় চৌদ্দ

এইডসের চিকিৎসা

১৪.১.১. এইচআইভি ভাইরাস বিনাশী এন্টি-ভাইরাল থেরাপি তৈরির কৌশল :

এইচআইভি ভাইরাসের আকৃতিগত কাঠামো অনুধাবন করে, ভাইরাস কর্তৃক জিন ও প্রতিচ্ছবি ভাইরাস তৈরির প্রক্রিয়াটি বুঝে অর্থাৎ ভাইরাসের গঠন ও সার্বিক জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায় পর্যবেক্ষণ করে এইডস প্রতিরোধ করতে পারে এমন ওষুধ তৈরি সম্ভব। এর জন্য যেমন ভাইরাল কমপ্লেক্সের প্রোটিনগুলো সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন, তেমনি ভাইরাস টার্গেটের গঠন ও ক্রিয়াটিও জানা প্রয়োজন। এইডসের ওষুধ তৈরির জন্য এ কারণেই গবেষকদেরকে মনযোগ দিতে হয়েছে কোষের মধ্যে ভাইরাসের প্রবেশের বিষয়টির ওপর।

ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে নিজস্ব এনভেলাপ গ্লাইকোপ্রোটিন জিপি-১২০-এর সাথে আক্রান্তের দেহের কোষস্থ সিডি-৪ রিসিপ্টরের জটিল সংযোগের মাধ্যমে। তাই জিপি-১২০- ও সিডি-৪ বন্ধন প্রক্রিয়াটি ব্যহত করা

গবেষকদের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে তাই তৈরি করা হয় নির্গত একধরনের তরল সিডি-৪ আইজি মলিকুল যা কি না ভাইরাসের বন্ধন এবং বর্ধন দুই-ই রোধ করতে পারে। ল্যাবে তৈরি এই ওষুধটি কাঁচের মধ্যে সুন্দর কাজ করলেও ভাইরাস বিকাশ প্রতিরোধে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এর কারণ ল্যাব কনসেনট্রেশন থেকে কয়েকশ' গুণ (দুশ' থেকে সাতাশ শ') বেশি ওষুধ প্রয়োজন হয় মানব শরীরের জন্য। তবুও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ চলছে এবং জিপি-১২০ ও সিডি-৪-এর জটিল বন্ধনটি আরও বুঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সাথে চেষ্টা করা হচ্ছে এই বন্ধন ভাঙবার মত ক্ষুদ্র ও কার্যকর মলিকুল তৈরি করবার ব্যাপারে।

এরপরের কৌশলটি বিবেচনা করা হয় সিডি-৪ রিসিপ্টর বিহীন কোষের সাথে জিপি-১২০ -এর বন্ধন তৈরির চেষ্টা করে। এটাও সার্থক না হলে কোষ আবরণ বা সেল মেমব্রেনের সাথে ভাইরাসের ফিউশন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। মেমব্রেন ফিউশন প্রতিরোধের জন্য প্রথমে যে পলিএ্যানআয়োনিক (polyanionic) কম্পাউন্ডটিকে চিহ্নিত করা হয় তার একটি হল ডেক্সট্রানসালফেট। এটি ল্যাবে ভাইরাস ও কোষের বন্ধন বা syncytia তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করলেও মানবদেহে আপেক্ষিকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে খাদ্যথলি থেকে নগণ্যমাত্রায় শোষিত হবার কারণে।

আরেকটি ওষুধ ভাইরাস বৃদ্ধি প্রতিরোধে বিবেচনায় আনা হয়। এর নাম **এনথ্রাকুইনন** (Anthraquinones)। এই গোত্রভুক্ত হাইপেরিসিন (Hypericin) একটি আলোক সংবেদনশীল যৌগ (ফটোঅ্যাকটিভ কম্পাউন্ড) যা ফটোঅক্সিডেশনের মাধ্যমে ইএমভি ভাইরাসগুলোকে মেরে ফেলতে পারে। এটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

১৪.২.১. রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন-এর প্রতিবন্ধকতা :

রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন নামক যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়োপ্রোটিন কমপ্লেক্সের আরএনএ থেকে ভাইরাল ডিএনএ তৈরি হয় সে স্থানে সফল আঘাত এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমের একটি লক্ষ্য। রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন সফল না হওয়ার কারণে ভাইরাসের বিকাশ এমন মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে যা কি না মানবদেহের কোষ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই রিভার্স ট্রাসক্রিপশন প্রক্রিয়ায় সফল আঘাত করেই অনেকগুলো চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি হল–

নিউক্লিয়োসাইড সমতুল্য,
নন-নিউক্লিয়োসাইড আরটিআই,
অন্যান্য

১৪.২.২. নিউক্লিয়োসাইড এনালগ :

জিডোভুডিন বা এজেডটি হল নিউক্লিয়োসাইড এনালগগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি এইচআইভি ইনফেকশন চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর কার্যকারিতা দু'ভাবে সম্পন্ন হয়। একটি হল কোষ এনজাইমের সাহায্যে ২, ৩ – ডাইডিয়োক্সিনিউক্লিয়োসাইড (2, 3-Dideoxynucleoside) জাতীয় এনালগগুলোর ফসফরাইজেশন। এতে তৈরি হয় ট্রাই-ফসফেট। এটি ভাইরাল ডিএনএ'র সাথে সংযুক্ত হয়ে ভাইরাল চেইনটিকে ভেঙে দেয়। কারণ, এটি ফসফোডাইস্টার (Phosphodiester) বন্ধন তৈরিতে বিঘ্ন ঘটায়।

এছাড়া নিউক্লিয়োসাইড এনালগ কোষ অভ্যন্তরে ২, ৩–ডাইডিয়োক্সিনিউক্লিয়োসাইডের সাথে প্রতিযোগিতা করে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেসের সাথে বন্ধন তৈরি করে। জিডোভুডিন প্রয়োগের কিছুদিন পর এটা প্রতিরোধে সক্ষম ভাইরাস তৈরি হতে পারে। এ কারণে আরও কার্যকর ও নিরাপদ নিউক্লিয়োসাইড এনালগ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ প্রেক্ষাপটে ডিডিটি বা ২, ৩–ডাইডিয়োক্সিনিউক্লিয়োসাইড থাইমিডিন (Thymidine) এবং ডি-৪-টি (2-Dideoxydro-3-Deoxythymidine) ওষুধগুলো তৈরি করা হয়। এজেডটি এর চাইতে ডি-৪-টি অধিকতর নিরাপদ এবং হাড়ের মজ্জার ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবও অনেক কম।

এজেডটি প্রয়োগের পর এইচআইভি ভাইরাস রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস জিনে মিউটেশন ঘটিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে। তবে এটি রোগের বিপজ্জনক অবস্থায় ছ'মাস থেকে এক বছর চিকিৎসার পরেই ঘটে থাকে। ওষুধ প্রতিরোধে ক্ষমতা রাখে এমন ভাইরাস এমনিতেও দেখা যেতে পারে। A.Z.T-এর ব্যর্থতা প্রতিরোধে অথবা ক্রস রেজিসট্যান্স জনিত (Cross resistance) প্রতিরোধে ডিডিআই (ddi) ও ডিডিসি (ddC) নামক আরটিআই উদ্ভাবন করা হয়েছে। A.Z.T কার্যকর না হলে এটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এতে রোগের ক্রমাবনতি বিলম্বিত হয়।

১৪.২.৩. এনএনআরটিআই (NNRTI) :

এ জাতীয় ওষুধগুলো রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ক্যাটালাইটিক (catalytic) অবস্থানে বন্ধন তৈরি করে এর কার্যকারিতা নষ্ট করে। এ ধরনের ওষুধগুলো ডিএনএ পলিমারেসকে আক্রমণ না করে সুনির্দিষ্টভাবে এইচআইভি-১ এর রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেসের সাথে বন্ধন তৈরি করে। এ জাতীয় ওষুধগুলোর মধ্যে টিবো (tibo), নেভিরাপিন

(nevirapine), পাইরিডোনস (pyridones) এবং এটিভারডিন (atevirdine) উল্লেখযোগ্য।

এনএনআরটিআই-এর প্রধান দুর্বলতা হল দ্রুত ভাইরাসের প্রতিরোধ সৃষ্টি। এ প্রেক্ষাপটে দুটো এনএনআরটিআই এক সঙ্গে প্রয়োগ করেও তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় না। এ কারণে ভাইরাসের মিউটেশন প্রতিরোধে এবং এর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে আনতে এজেডটি এবং ডিডিআই-এর সাথে পাইরিডোন ব্যবহার করা হয়। এজেডটি এবং ডিডিআই-এর সাথে একটি এনএনআরটিআই প্রয়োগকে কনভারজেন থেরাপি বলা হয় এবং এটি একটি আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্গত। কেননা এতে ভাইরাল রেসিসটেন্স তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১৪.৩.১. অন্যান্য : রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটরস :

একসময় পাইরোফসফেট (pyrophosphate) জাতীয় ওষুধগুলো ব্যবহার করা হত হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস সংক্রমণ দমনের জন্য। ল্যাবে দেখা যাচ্ছে এটি এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধেও কার্যকর। এটি আরএনএ এবং ডিএনএ পলিমারেসকে অবদমন করতে পারে।

এইচআইভি আক্রান্তরা সিএমভি ভাইরাসে (রেটিনাইটিস) আক্রান্ত হলে এটি অন্য এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপির সাথে প্রয়োগ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বৃক্ক সংক্রান্ত টক্সিসিটির কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

১৪.৩.২. RNASE H Inhibitor :

RNASE H Inhibitor নিয়ে কাজ চলছে এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে।

১৪.৩.৩. ভাইরাল ডিএনএ'র ইন্টিগ্রেশন প্রতিবন্ধক :

এইচআইভি ইন্টিগ্রেস প্রোটিনের সহায়তা নিয়ে ভাইরাল ডিএনএ-এর কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হবার পরেই ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভাইরাসের জীবনচক্রের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। তাই ইন্টিগ্রেস প্রোটিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ভাইরিয়নের বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। ইন্টিগ্রেস প্রোটিন অকার্যকর করার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে কাজ হচ্ছে।

১৪.৩.৪. ভাইরাল জিন এক্সপ্রেশনে প্রতিবন্ধকতা :

ভাইরাল জিন এক্সপ্রেশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যেতে পারে কাপপা বিটা (NF-KB) ইনহিবিটর প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টরসহ বিবিধ সাইটোকাইনস অবদমনের মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়ায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে অথবা কিছু এন্টি-অক্সিড্যান্ট প্রয়োগের মাধ্যমেও সীমিত ক্ষেত্রে এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সেলিনিয়াম একটি বহুল আলোচিত কাপপা বিটা ইনহিবিটর।

ভাইরাল জিনের সাথে সম্পৃক্ত ট্যাট (tat) নামক প্রোটিন এইচআইভি-১-এর অন্তর্গত আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্টেস-এর কার্যকারিতা সূচনাকারী বস্তু ট্যার (tar বা transactivation responsive element)-এর সাথে যুক্ত হবার পরেই সুদীর্ঘ ভাইরাল ট্রান্সক্রিপশনটি বাস্তব রূপ পায়। এটা অবলম্বন করেই প্রোভাইরাস থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ভাইরাস তৈরি হয়।

এই ট্যার-এর কার্যকারিতা শুরুর জন্য ট্যাট ছাড়া প্রয়োজন হয় আক্রান্ত কোষের বিশেষ ধরনের প্রোটিনের। আর এইসব মিলিয়ে অনুকূল পরিবেশে ট্যাট পরিচালিত ট্রান্সঅ্যাক্টিভিশন (transactivation) কর্মটি বিপজ্জনক হারে ভাইরাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। এসব কথা বিবেচনা করে ট্যাট পরিচালিত এই ট্রান্সঅ্যাক্টিভিশন কাজটি রুদ্ধ করবার জন্য ট্যাট-ট্যার বন্ধন রোধে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে Ro5-3335 এবং Ro24-7429 জাতীয় বেঞ্জোডায়াজেপিন কম্পাউন্ড ট্যাট-এর কার্যকারিতা বন্ধ করে এইচআইভি বৃদ্ধি রোধ করতে পারে। মানবদেহে এটা বেশ টক্সিক হওয়াতে কেটো/এনোল এপোক্সি (Keto/Enol Epoxy) স্টেরয়েডকে ব্যবহার করা হয়েছে ট্যাট অবদমনের জন্য। আরজিনাইন (Arginine)-এর ক্ষুদ্র মলিকুল সম্পন্ন প্রোটিন যা কি না ট্যার আরএনএ-এর সাথে বন্ধন তৈরি করতে পারে, সেগুলো প্রয়োগ করার চিন্তা করা হচ্ছে ট্যাট-ট্যার বিক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য।

ক্ষুদ্র মলিকুল প্রোটিনগুলো ব্যবহার করে ট্যাট-ট্যার-এর কার্যক্ষমতা অবদমন অথবা এদের বন্ধনে সার্থক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এইচআইভি নিয়ন্ত্রণকল্পে চলমান গবেষণারই অংশ।

ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের এলটিআর সেগমেন্ট (LTR segment)-এর সাথে হোস্ট সেল ফ্যাক্টর-এর সহায়তায় ভাইরাল আরএনএ ট্রান্সক্রিপটেস তৈরি হয়ে থাকে। এই হোস্ট সেল ট্রান্সক্রিপটেস ফ্যাক্টরের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফ্যাক্টর কাপপা বিটা (এনএফ-কেবি), টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা (TNF-α) -এর মত কিছু সাইটোকাইনস ভাইরাসের আরএনএ ট্রান্সক্রিপশন ঘটিয়ে থাকে। এই সাইটোকাইনসগুলো উৎপত্তিতে এবং কার্যকারিতায় প্রতিন্ধকতা সৃষ্টি করে ভাইরাল জিন তৈরি বন্ধ করা যেতে পারে। এভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এইচআইভি ভাইরাস বৃদ্ধি।

১৪.৩.৫. টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর অবদমন :

দু'ধরনের অণু শনাক্ত করা গেছে যেগুলো একাজ করতে পারে। থ্যালিডোমাইড (Thalidomide) এবং পেনটোক্সিফাইলিন টিএনএফ-আলফা (Pentoxifylline TNF-α) সিনথেসিস রোধ করতে

পারে। পেনটোক্সিফাইলিন এনএফ-কেবি উজ্জীবনে বাধা তৈরি করে। এটি ব্যবহার নিরাপদও। এটা প্রয়োগে প্রান্তিক রক্তাভ্যন্তরে মনোনিউক্লিয়ার কোষগুলোর মধ্যে TNF-α আরএনএ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনে।

১৪.৩.৬. ইমিউনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট :

যেসমস্ত সাইটোকাইন এবং কোষের ট্রান্সকিপটেস ফ্যাক্টর এইচআইভি জিন তৈরিতে সহায়তা করে সেগুলো স্বাভাবিকভাবে মানবদেহে ইমিউনিটিও তৈরি করে।

একারণে অনেক গবেষক মনে করেন রোগের শুরুতে থেরাপি দিলে ভাইরাস বৃদ্ধি কমে আসবে এবং তা পরবর্তীতে ইমিউন ব্যবস্থায় কম ক্ষতিসাধন করতে পারবে।

১৪.৩.৭. এন্টি-অক্সিড্যান্ট (Anti-oxidants) :

এন্টি অক্সিড্যান্ট মলিকুলগুলো এইচআইভি ট্রান্সক্রিপশন সীমিত করতে পারে নানাভাবে। এটি এসেটাইলস্টেইন (acetylcysteine) জাতীয় এনএফ-কেবি-এর কার্যকারিতা কমিয়ে আনে এবং ভাইরাল জিন এক্সপ্রেশনও নিয়ন্ত্রণ করে। এটি কোষের অ্যাপোপটোসিস (apoptosis) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

The expression of viral gene during the process of replication require collaborative activities of RNA polymerase, transcription factor SPI and NFKB and viral regulatory protein (Tat and rev).

Selenium inhibits NFKB and prevents HIV expression

১৪.৩.৮. আরইভি (REV) :

আরেকটি ভাইরাস রেগুলেটরি প্রোটিন যা কি না এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি কার্যক্রমের লক্ষ্য হতে পারে তা হল এইচআইভি আরইভি জিন। ভাইরাস পার্টিকেল তৈরি জন্য আরইভি জিনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৪.৩.৯. ভাইরাল রাইবোসোমাল ফ্রেমশিফটিং (Viral Ribosomal Frameshifting) :

ভাইরাসের গ্যাগ এবং পোল জিনের সাথে **রাইবোসোমাল ফ্রেমশিফটিং** এন্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধগুলোর লক্ষ্য হতে পারে।

১৪.৩.১০. এইচআইভি ভাইরিয়নগুলোর সমবেত হওয়া ও পরিণত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি :

গ্যাগ পলিপ্রোটিনই নতুন ভাইরাস তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অস্ত্র ও খেয়াগুলো তৈরি করে। ভাইরাল ক্যাপসিড এবং

ভাইরিয়ন ক্যাপসিড তৈরি হয় এরই সহায়তায়। অঙ্কুরের মত ভাইরিয়ন উদ্গমনের সময় এবং পূর্ণ ভাইরাস প্রকাশের সময় গ্যাগ প্রোটিনগুলো ভাইরাস প্রোটিয়াসের সহায়তায় ভাইরাসের জন্য অত্যাবশ্যক ম্যাট্রিক্স ক্যাপসিড, পি-২৪, পি-৯, পি-৬ নামক কাঠামোগত প্রোটিন বস্তু ও প্রোটিয়াস রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এবং ইন্টিগ্রেস জাতীয় এনজাইমগুলো তৈরি করে। এ কারণে এইচআইভি নাশক ওষুধ তৈরির কার্যক্রমে গ্যাগ পলিপ্রোটিনের সচল কার্যক্রম এবং কোষের সাথে এর সংযুক্তি প্রতিরোধকে বিশেষ লক্ষ্যে আনা হয়েছে।

কোষের আবরণটি লক্ষ্যভেদ করবার জন্য গ্যাগ প্রোটিনগুলো মাইরিস্টোয়লেশন (myristoylation) নামক এমাইনো অ্যাসিডের এক জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হয়। এটি ঘটে রাইবোসোমাল কমপ্লেক্স-এর মধ্যে। এ পদ্ধতিটি অনেকটা মিথাইলেশন বিক্রিয়ার মত।

মাইরিসটিক অ্যাসিড গোত্রীয় দ্রব্যে মিথাইল গ্রুপের স্থানে সালফার অথবা অক্সিজেন অণু প্রতিস্থাপন করে পরিবর্তিত মাইরিসটোয়েল গ্রুপগুলো গ্যাগ পলিপ্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়। এতে ভাইরাসের সিগন্যালটি অকার্যকর হয়ে ওঠে। মাইরিস্টোয়লেশন সিগন্যালকে অত্যাবশ্যক নোঙ্গর গ্লাইসিনের বিকৃতি ঘটিয়ে অথবা গ্যাগ পলিপ্রোটিনের এন-টার্মিনাল প্রান্তে উপরোল্লেখিত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভাইরাল ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে আঘাত করে এইচআইভি ভাইরাস বিকাশ রুদ্ধ করা যায়। কোষগাত্রে যেসমস্ত প্রোটিন এই পরিবর্তিত মাইরিসটোয়েল-গ্রুপগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় সেগুলো সুস্থ কোষগুলোকে নিরাপদ রেখে সরে যায়।

মাইরিস্টোয়লেশন ব্লকেট (blocket) পদ্ধতি ভাইরাস অন্তর্গত আরেকটি মাইরিস্টোয়লেটেড প্রোটিন নেট (myristoylated Protein Net)-এরও কার্যকারিতা কমিয়ে ফেলে। ভাইরাল প্রোটিনের বিকাশ রোধ সম্ভব প্রোটিয়েস নামক এনজাইম দ্বারাও।

এইচআইভি ভাইরাসের বিকাশে এনভেলাপ প্রোটিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এনভেলাপ প্রোটিন বাস্তব প্রয়োজনে নিজের কাজগুলো ধারালো করবার জন্য এবং কোষের ভেতর চলাচলের পথ সুগম করবার জন্য নানাবিধ অলিগোস্যাকারাইড (oligosaccharide)-এর সাথে বন্ধন তৈরি করে। চিনি জাতীয় অণুর সাথে এনভেলাপ প্রোটিনের বন্ধনকে গ্লুকোসাইডেস কার্যকারিতা বলে।

এ ক্ষেত্রে গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর প্রয়োগ করে এনভেলাপ প্রোটিনের পরিবর্তনশীলতা এবং কার্যকারিতা এমনভাবে বন্ধ করা সম্ভব যাতে ভাইরাস এই প্রোটিনের সহায়তায় নতুন কোষকে আক্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়।

গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটরগুলো বেশ বিষাক্ত। তবে এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বা কম বিষাক্ত গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর হল এন-বিউটাইল

ডিঅক্সিনোজাইরিমাইসিন (N-Butyl deoxynojirimycin বা N-BuDNJ)।

১৪.৩.১১. সাইক্লোসপোরিন (cyclosporin) অবদমন এবং সাইক্লোফাইলিন (Cyclophilin) আন্তঃবিক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

সাইক্লোফাইলিন নামক কোষের ভেতরের এক ধরনের প্রোটিন এইচআইভি গ্যাগ প্রোটিনের সাথে বন্ধন তৈরি করে এবং এটার প্রক্রিয়াকরণে (Processing) সাহায্য করে। একই সাথে এটা ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট সাইক্লোসপোরিনের রিসেপ্টর হিসাবেও কাজ করে। এটা সাইক্লোসপোরিন গ্যাগ ও সাইক্লোফাইলিন আন্ত ঃবিক্রিয়ার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে ভাইরাসবিনাশী ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৪.৪.১. টক্সিক পদার্থ প্রয়োগ করে অসুস্থ কোষগুলো মেরে ফেলার কৌশল :

আপেক্ষিকভাবে নিরাপদ কিছু টক্সিক পদার্থ ব্যবহার করে যেসমস্ত কোষ ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করবে তা বিনাশ করার চেষ্টা চালানো হয় নানা গবেষণায়। এসসিডি-৪ (sCD_4) মলিকুলগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে শরীরাভ্যন্তরের কিছু টক্সিনকে শনাক্ত করবার জন্য যা কি না সেই সমস্ত কোষকে আক্রান্ত করবে যা ক্রমবর্ধমান হারে ভাইরাল এনভেলাপ প্রোটিন তৈরি করেছে।

এ পদ্ধতিতে দেখা গেছে সিউডোমোনাস অ্যারুজিনোসা এক্সোটক্সিন-এ (pseudomonas aeruginosa exotoxin-A) অথবা রাইসিন-এ (ricin-A) শৃঙ্খলগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সেই সমস্ত কোষকে মেরে ফেলে যা জিপি-১২০ তৈরি করছে। এটা এইচআইভি আক্রান্ত কোষগুলোকেও ল্যাব কালচার মাধ্যমের ভেতর মেরে ফেলতে সক্ষম।

এসসিডি-৪ ও পিএ এক্সোটক্সিন জাতীয় হাইব্রিড কম্পাউন্ডগুলো সেই সমস্ত কোষকেই মেরে ফেলে যা ভাইরাল এনভেলাপ প্রোটিনগুলো বের করে দিচ্ছে। কিন্তু আক্রান্ত অবস্থায় যেসমস্ত কোষ ভাইরাল প্রোটিন ছড়িয়ে দিচ্ছে না সেগুলোর ওপর এটা আঘাত করতে পারে না। এ জাতীয় ওষুধগুলো ডোজ ভিত্তিক টক্সিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৪.৪.২. ক্যাপসিড প্রোটিনের সাথে ভাইরিয়ন আরএনএ-এর প্রতিবন্ধকতা :

এইচআইভি আরএনএ এবং এইচআইভি নিউক্লিয়োক্যাপসিড প্রোটিনের বন্ধনের স্থানটি ভবিষ্যত ওষুধের লক্ষ্যস্থলের একটি। নিউক্লিয়োক্যাপসিড প্রোটিনগুলো ভাইরাস পার্টিকেলের আরএনএ-এর সাথে এমনভাবে বন্ধন তৈরি করে যা সুনির্দিষ্ট আরএনএ ডোমেন-এ জিঙ্ক ফিংগারস (zinc fingers) নামক নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বাইন্ডিং প্রোটিনের আঁচড়া সদৃশ একটি জিনিস তৈরি করে। জিঙ্ক ফিঙ্গারের মিউটেশন ঘটিয়ে অথবা এ স্থানটিকে অ্যারোমেটিক সি-নাইট্রোসো (aromatic C-nitroso) যৌগ দ্বারা অস্থিতিশীল করবার মাধ্যমে ভাইরাস বৃদ্ধি রোধ করা যাবে।

১৪.৪.৩. প্রোটিয়াস ইনহিবিটরঃ

এইচআইভি প্রোটিয়াস নামক এনজাইমই গ্যাগ ও গ্যাগ পলিপ্রোটিনকে এইচআইভি'র কাঠামোগত প্রোটিনের অন্তর্গত করে এবং এগুলোকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ও ইন্টিগ্রেসের সাথে সংযুক্ত করে। এই এইচআইভি প্রোটিয়াস-এর কাঠামোগত দিকটি অন্যান্য অ্যাসপারটাইল প্রোটিয়াস (aspartyl protease)-এর মতই এবং এনজাইম পরিবারের অনেকগুলো দ্বারা এর বিনাশ বা অবদমন সম্ভব।

এইচআইভি প্রোটিয়াস-এর অবদমনের মাধ্যমে ভাইরাস বৃদ্ধি এবং নতুন করে কোষের আক্রান্ত হওয়া রোধ করা সম্ভব। প্রোটিয়াস ইনহিবিটরগুলো শুধু এইচআইভি চক্রের প্রারম্ভিক অবস্থাতেই কার্যকর নয়, এটি দীর্ঘ সময় অসুস্থ কোষে লুকিয়ে থাকা এইচআইভি'র ওপরেও চড়াও হতে পারে।

এছাড়া যেহেতু প্রোটিয়াস সুস্থ কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং নিউক্লিয়ার কাপপা-বিটা ইনহিবিটরকে উজ্জীবিত করে কোষ ঘাতক হিসাবে কাজ করে, তাই এইচআইভি সংক্রমণের কারণে শরীরের বিপর্যয় রোধে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পেপটিডোমাইমেটিক ইনহিবিটর (peptidomimetic inhibitor) নামক একধরনের প্রোটিয়াস ইনহিবিটর ব্যবহার করা হচ্ছে যা এইচআইভি ভাইরাসের অন্তর্গত প্রোটিয়াস খাদক পদ্ধতি দ্বারা বিনাশ হবে না। প্রোটিয়াস ইনহিবিটরগুলো যখন অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রয়োগ করা হয় তখন তা রোগ নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি কার্যকর হয়।

প্রোটিয়াস ইনহিবিটর প্রয়োগের মুখে বেঁচে থাকতে পারে এরকম কিছু ভাইরাস দেখা দেয়ায় অধিকতর স্থিতিশীল দ্বিতীয় প্রজন্মের ইনহিবিটর (second generation inhibitor)-এর অনুসন্ধান করছেন গবেষকরা। এইসব গবেষণার প্রেক্ষাপটে বর্তমান শতক এবং ভবিষ্যতের চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে উঠছে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ভিত্তিক জিন থেরাপি বিকাশের মাধ্যমে। যেসমস্ত নিউক্লিয়িক অ্যাসিড এইচআইভি'র বিরুদ্ধে গবেষণাগারে ব্যবহার হচ্ছে তা হল এন্টিসেন্স অলিগোনিউক্লিটিডস (antisense oligonucleotids), রিবোজাইমস (ribozymes) এবং আরএনএ ডিকয়েস (RNA decoys)। রিবোজাইমগুলো ক্যাটালাইটিক আরএনএ মলিকুল।

১৪.৪.৪. জিন থেরাপির সমস্যা :

ভবিষ্যতে জিন থেরাপির প্রয়োগে যে সমস্যাগুলো হতে পারে তা হল, এটি সুস্থ কোষকে আক্রমণ করতে পারে এবং এইচআইভি'র কারণে ইমিউনিটি জনিত সমস্যা আক্রান্তদের মধ্যে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

আরেকটি সমস্যা হতে পারে ডেলিভারি সিস্টেম বা প্রয়োগ ব্যবস্থা নির্বাচনে। এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে পৌঁছাতে হবে আক্রান্ত কোষে এবং যথাস্থানে ভাইরাস বিনাশী ভূমিকা রাখবার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
আপেক্ষিকভাবে কিছুটা অকার্যকার এইচআইভি-১ প্রোভাইরাসকে জিন ট্রান্সফার ভেক্টর হিসাবে নির্বাচন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

১৪.৫.১. এন্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

এন্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধগুলোর নানাবিধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান যে মেটাবলিক অসুবিধাগুলো এইচআইভি আক্রান্তদের চিকিৎসাকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা হল– শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থের বিপাকীয় বিপর্যয়,

বিভিন্ন স্থানে চর্বি জমে যাওয়া,
গ্লুকোজ বিপাকে বিপর্যয়,
ল্যাকটিক অ্যাসিডেমিয়া এবং হাড়ের ক্ষয়।

এসব কারণে, বিশেষ করে রক্তশিরায় চর্বি জমে যাওয়ায় হৃদপিণ্ডের শিরা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ইনসুলিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়না এমন ধরনের গ্লুকোজ বৃদ্ধি হৃদপিণ্ডের অসুবিধার একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর মধ্যে নিউক্লিয়োসাইড গোত্রীয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর, নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর এবং প্রোটিয়োস ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১৪.৫.২. নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটরের কারণে ল্যাকটিক এ্যাসিডোসিস ঘটার সাথে সাথে যকৃতের বৃদ্ধি ঘটে এবং হেপাটিক স্ট্যাটোসিস (statosis) নামক বিপত্তি ঘটে।

নিউক্লিয়োসাইড এনালগের কারণে প্রায় ৫ থেকে ১০ ভাগ ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এ্যাসিডোসিস ঘটে থাকে। সেরাম ল্যাকটেট লেভেল দেখে এটা নির্ণয় করা সম্ভব। একারণে রোগী প্রচন্ড দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, ওজন হ্রাস এবং শ্বাসকষ্টে ভোগে। এই জাতীয় ওষুধের কারণে সেরাম বাইকার্বনেটও কমে যায়।

ল্যাব পরীক্ষায় CPK, LDH- এগুলো বৃদ্ধি পায়। একারণে জীবনের ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়। ওষুধ বন্ধ করে দিলে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কমে আসে। সব ধরনের নিউক্লিয়োসাইড এনালগেই এ ধরনের বিপত্তি ঘটলেও ডি-৪-টি, ডিডটি ও ডিডিআই-তে এ জাতীয় বিপত্তি বেশি ঘটে।

এসব ছাড়া নিউক্লিয়োসাইড গোত্রীয় আরটিআই-এর কারণে যেসমস্ত মাইট্রোকন্ড্রিয়াল টক্সিসিটি ঘটে তা হল

মায়োপ্যাথি, কার্ডিয়োমায়োপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি, প্যানক্রিয়াটাইটিস ও এসথেনিয়া লাইপোএট্রপি ইত্যাদি। এছাড়া এজাতীয় ওষুধের কারণে রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া, নিট্রোপ্যানিয়া ঘটে থাকে।

এ জাতীয় কোন কোন ওষুধে পেটে ব্যথা, হাত-পায়ের ওপরের দিকটা শুকিয়ে যাওয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে সুতীব্র ব্যথা, ত্বক অবশ হয়ে যাওয়া, স্নায়ু সংবেদনশীলতা সংশ্লিষ্ট জার্ক কমে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। কোন কোন ওষুধে মুখে, পায়ে, পেছনের চর্বি মারাত্মকভাবে সরে যায়।

১৪.৫.৩. নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটরগুলোতে অন্যান্য অসুবিধার সাথে গায়ে লাল লাল মারাত্মক চাকা, কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়া উঠে স্টিভেন জনসন সিনড্রমের উদ্ভব ঘটায়।

১৪.৫.৪. প্রোটিয়াস ইনহিবিটরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

প্রোটিয়াস ইনহিবিটরগুলো রক্তে চিনি বৃদ্ধি করে ডায়াবেটিস মেলাইটাস (mellitus) তৈরি করে। এ ধরনের ওষুধ হেমোফাইলেরিয়া আক্রান্তদের মধ্যে রক্তপাত ঘটায় এবং শরীরের চর্বিগুলো অস্থানে সরিয়ে বিপত্তি তৈরি করে। এতে রক্তেও চর্বির পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়।

প্রোটিয়াস ইনহিবিটরের কারণে যে হাইপারগ্লাইসেমিয়া (hyperglycemia) হয় তা ইনসুলিন যারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এছাড়া এর কারণে গ্লুকোজ সহনশীলতা কমে যায়। এসব কারণে নতুন করে ডায়াবেটিক মেলাইটাস রোগের উৎপত্তির সাথে সাথে এ রোগের বিপর্যকর দিক ডায়াবেটিক কেটোএ্যাসিডোসিসও (ketoacidosis) দেখা দেয়।

১৪.৬.১. এইচআইভি আক্রান্তরা কী প্রক্রিয়ায় সুস্থ থাকবে এবং কী করলে রোগটি খারাপ পর্যায়ে যাবে না?

দেখা গেছে এইচআইভি আক্রান্ত হবার পর সুপ্ত সময়টি অনেকের ক্ষেত্রেই দীর্ঘ হয়। এর পেছনে ভাইরাসের দুর্বলতা এবং শরীরের ইমিউনিটি দুটোরই ভূমিকা রয়েছে।

এইচআইভি পজিটিভ হবার পর ঘাবড়ে না যেয়ে প্রাত্যহিক জীবনের রুটিনকে সাজিয়ে নিতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার, নিয়মানুবর্তীতা, পরিমিত আনন্দদায়ক কাজ এবং পরিপূর্ণ বিশ্রামকে বেছে নিতে হবে। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। ইতিবাচক চিন্তা ও অটো-সাজেশন শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এসব নিয়ে গবেষণাগারে নানা উচ্চ পর্যায়ের কাজ হচ্ছে।

আনন্দদায়ক জীবনের সাথে সাথে পরিমিত আহার এবং যথাযথ পুষ্টির প্রতি মনোযোগ দান, সেই সাথে হালকা ব্যায়াম শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি

ঘটাতে পারে। চড়াও হওয়া এইচআইভি'র ধ্বংসাত্মক কাজগুলো এ ধরনের জীবনযাত্রা গ্রহণের মাধ্যমে একেবারে ঠেকিয়ে দেবার প্রমাণ না থাকলেও এ প্রক্রিয়ায় রোগের আগ্রাসনকে মন্থর করে দেয়া সম্ভব বলে মনে করেন অনেক গবেষকই।

লেখক রোগ প্রতিরোধে আক্রান্ত রোগীর মনোভাবের পরিবর্তন, ইতিবাচক ভাবনা এবং মন ও শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেন। একারণে রোগীদেরকে মেডিটেশনের অভ্যাস করে প্রকৃতির সাথে সিনক্রোনাইজড জীবন যাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নানা ধরনের ইমিউনিটি-উদ্দীপক খাদ্য গ্রহণের ওপর লেখক জোর দিচ্ছেন। জীবাণুমুক্ত স্পিরুলিনা ও ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম শরীরের ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এগুলোতে বিদ্যমান প্রোটিন, এনজাইম ও ট্রেস এলিমেন্টগুলো রোগীকে নানাভাবে সাহায্য করে।

দেশজ নিমপাতা, থানকুনি পাতা, পুদিনা পাতা, তুলসি পাতা, হলুদ ইত্যাদি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে মুখ, খাদ্যনালী ও অন্ত্রকে সুস্থ রাখে। এইডস নিরাময়ে নিম এক্সট্রাক্ট নিয়ে ভারতে কাজ হচ্ছে। পেটের হেলিকোব্যাক্টার পাইলরিসহ অন্ত্রের বিভিন্ন পরজীবী ও মাইক্রোঅর্গানিজম দ্বারা সৃষ্ট আলসার ও ডায়রিয়া প্রতিরোধে হলুদ অথবা কারকিউমেনের ভূমিকা লেখকের গবেষণায় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, এইচআইভি আক্রান্তদেরকে জীবাণুমুক্ত খাবার ও পানীয় পানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে এবং ইমিউন ব্যবস্থা উন্নয়নে সুশৃঙ্খল জীবনের সাথে সাথে দুঃশ্চিন্তা ও স্ট্রেস প্রতিক্রিয়া বা নানাবিধ মানসিক চাপ কমিয়ে আনতে হবে।

১৪.৭. এইডস সাপোর্ট গ্রুপ :

এইচআইভি আক্রান্ত, সমকামী, গে, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সাপোর্ট বিভিন্ন রকমের হতে পারে; যেমন–ইমোশনাল সাপোর্ট, ইনফরমেশনাল সাপোর্ট, লিভিং সাপোর্ট ইত্যাদি।

১৪.৭.১. ইনফরমেশনাল সাপোর্ট :

- আক্রান্তদের বিভিন্ন তথ্য ও প্রশ্নের জবাব দেয়া,
- আত্মসম্মান বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা,
- অভ্যাস গড়ে তোলা, সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা,
- ঘৃণা থেকে বাঁচবার ধারণা, আত্মঘৃণা থেকে মুক্তি,
- সামাজিক ঘৃণা, নির্যাতন (persecution) ও বৈষম্য প্রতিরোধ,
- হতাশা, বিষাদ ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি,

- মানসিক জটিলতা থেকে মুক্তি, আত্মহনন প্রবণতা দূর করা ইত্যাদি।

১৪.৭.২. ইমোশনাল সাপোর্ট :

- আক্রান্ত রোগীকে স্নেহ ভালবাসা দান,
- সমবেদনা জানানো, বিনোদনের ব্যবস্থা করা,
- আশার আলো দেখানো ইত্যাদি।

১৪.৭.৩. লিভিং সাপোর্ট :

- আক্রান্তদেরকে হাসপাতালে নেয়া, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া, প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় সহায়তা,
- এনজিওদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া,
- খাদ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ দান ও সরবরাহ নিশ্চিত করা,
- প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ ইত্যাদি।

১৪.৮.১. এইডস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?

বাংলাদেশে যারা এইডস ও যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দারিদ্র, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, সুস্থ আনন্দের অভাব এদেরকে যৌন নির্ভর আনন্দের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চারিত্রিক গঠন ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে এরা অধিকাংশই অস্থিরমতিদের (unstable personality) অন্তর্গত। এদের অনেকেই বর্তমানর্মুখী এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নির্বিকার। বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা জন হপকিন্স গ্রুপের তুলনায় এদেশে অনেক কম। এদের অধিকাংশই চারিত্রিকভাবে খোলামেলা নয় এবং অন্তর্গতভাবে নার্ভাস প্রকৃতির। এছাড়া এদের ওপর সমাজ ও ধর্মের চাপ থাকায় অধিকাংশ সময় এরা চিকিৎসকের নিকট রোগের কথাগুলো লুকিয়ে রাখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে চিকিৎসককে বিভ্রান্ত করে।

রোগ শনাক্তের পর এই সব রোগীরা চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে, রোগের ফলোআপ কাজে বিঘ্ন ঘটায় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক উন্নতির পর হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যায়। অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণেও সম্পূর্ণ চিকিৎসা গ্রহণ করেনা। এসবের প্রেক্ষাপটে এইচআইভি আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থান গোপন করা, প্রকৃত চিকিৎসা গ্রহণ না করা এবং বিধি নিষেধ মেনে না চলা একটা বাস্তব চিত্র হিসাবে ধরে নিতে হবে। রোগীদের গোপনীয়তাপ্রিয় স্বভাব এবং এ জাতীয় বিপজ্জনক প্রবণতা বাংলাদেশে এইডস পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটাতে পারে। এসবের আলোকেই দেশে এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এইডস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা হয় তাদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে। কারও চিকিৎসা হতে পারে বাসায়

রেখে আউটডোরে, কারও কারও চিকিৎসা বাধ্যতামূলকভাবে হাসপাতালে হওয়া উচিত। এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে যারা গুরুতর অসুস্থ এবং জটিলতায় আক্রান্ত হয় তাদের চিকিৎসা হাসপাতালের ইনটেনসিভ ক্লিনিক্যাল কেয়ার ইউনিটে হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত কারণে রোগীকে আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হল পিসিপি। এছাড়া অন্যান্য সুবিধাভোগী সংক্রমণের কারণে রেসপিরেটরি ফেইলর হতে পারে। এই সমস্ত সংক্রমণে এ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে রেসপিরেটরি ফেইলরের কারণে দুই-তৃতীয়াংশ রোগীকে আইসিইউ কেয়ারে ভর্তি রাখতে হয়।

এসব ক্ষেত্র ছাড়া যে সমস্ত পরিস্থিতিতে রোগীকে আইসিইউ-তে রাখতে হয় তা হল–

- পিসিপি, যক্ষ্মা এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির কারণে জটিলতা,
- রক্তচাপ নেমে যাওয়া ও শক পরিস্থিতিতে,
- খিঁচুনি ও বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার কারণে,
- হৃৎপিন্ডের গতির ছন্দপতন বা অ্যারিদমিয়ার কারণে,
- ওষুধের টক্সিসিটি,
- মানসিক কারণে আত্মহননের প্রচেষ্টা ও অন্যান্য জটিলতা এসবের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও থেরাপি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত জটিল ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সংক্রান্ত সমস্যা মোচন।

যারা পিসিপি জনিত কারণে রেসপিরেটরি ফেইলর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে পঞ্চান্ন ভাগ সাম্প্রতিককালের উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে বেঁচে যেতে পারে। আশির দশকে এই নিরাময়ের হার ছিল শতকরা পনেরো ভাগ।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শেষ পর্যায়ের এইচআইভি সংক্রান্ত শারীরিক জটিলতা সৃষ্টিকারী উপসর্গের মধ্যে রেসপিরেটরি ফেইলর অন্যতম। হাসপাতালে যারা আইসিইউতে ভর্তি হয় তাদের ত্রিশ ভাগই এ ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত। এ ধরনের জটিলতা নিয়ে যারা হাসপাতালে আসে তাদের আরও নানারকম অসুবিধা থাকে। যেমন হৃৎপিন্ডের অসুবিধা, হার্ট ফেইলর, গুরুতর হাইপো এ্যালবুমেনিমিয়া ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি থাকে হতাশাজনক। পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ও শ্রম ছাড়া এদেরকে বাঁচানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগী নিউমোসিসটিস ক্যারিনি দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয় এবং ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স বা লবণের ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হয়। গুরুতর মেটাবলিক জটিলতারও সৃষ্টি হয়।

এইচআইভি আক্রান্ত রোগীকে যখন আইসিইউ-তে রাখা হয়, তখন স্বাস্থ্যকর্মীদের এই রোগ সংক্রমণের ভয়

থাকে। যদিও সচেতন থাকলে প্রকৃত অর্থে সংক্রমণের হার খুব কম হয় তবুও সংশ্লিষ্ট সবার ওপরে একটা চাপ থাকে। এ সমস্ত রোগীদের রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থও ভাইরাসসহ বিপজ্জনক জীবাণু ছড়াতে পারে। একারণে এই সব রোগীর নিকটে আসার পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (universal infection control procedure) এবং বায়োসেইফটি ম্যানুয়াল অনুসরণ করা উচিত। গ্লাভস, গাউন, মাস্ক, জুতোর কভার এবং চোখে প্রতিরোধক চশমা ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজগুলো এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী হওয়া উচিত।

রোগীর জন্য ব্যবহৃত ভেন্টিলেটারের প্রশ্বাস নালীতে ফিল্টার (exhalation ports) ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ করে বাতাসবাহী জীবাণু ও রোগীর শারীরিক নিঃসরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। সূঁচ এবং সার্জিক্যাল ছুরি খুব সাবধানে ব্যবহার করা দরকার। যেহেতু মেডিক্যাল ইমারজেন্সি সুরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে তাই রোগীর শরীরের তরল পদার্থ এবং অ্যারোলাইজড শ্লেষ্মার স্পর্শ থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা করলেই হবে না, সেই সাথে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যাতে রোগ না ছড়ায় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অনাবশ্যক যন্ত্রপাতি সরিয়ে যথাযথভাবে স্টেরিলাইজেশন করা প্রয়োজন এবং সেইসাথে রোগীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একশ'ভাগ বায়োসেইফটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এই অবস্থায় এইচআইভি রোগীদের পরিচর্যা করা চিকিৎসাকর্মীদের নিকট একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

সাধারণভাবে রোগীর সেবার মধ্যে যে সব জিনিস বিবেচনায় রাখা উচিত তা হল, রোগীর মধ্যে বহুবিধ জীবাণু ও পরজীবীর সংক্রমণ, গ্যাস ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতাসহ অন্যান্য জটিলতা। পুষ্টি ও পানির অভাব পূরণ, পরিচ্ছন্নতাসহ শরীরের নানাবিধ যত্ন, রোগীর মানসিক জটিলতার নিরাময়, শরীরের নানা স্থানের ব্যথা নিরাময়, শরীর ও শিরার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন নলের যত্ন, ত্বকের পরিচর্যা এবং তার সাথে মৃতপ্রায় রোগীর আবশ্যক সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এরপরও রয়েছে রোগীর পড়ে যাওয়া, ক্ষত বিক্ষত হওয়া ও হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার সমস্যা। প্রেসার সোর বা নিজ শরীরের চাপে সৃষ্ট ঘা'সহ, বিভিন্ন ক্ষতের যত্ন ও ড্রেনেজের যত্ন নেওয়াও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এগুলো রোগীর জীবনের জন্য এবং রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য খুবই জরুরি। রোগীর নানাবিধ যত্ন এবং করণীয় সংক্রান্ত শিক্ষাটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এসব রোগীর যথাযথ পরিচর্যার জন্য ভাল রেসপিরেটরি সাকশনসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিইউ প্রয়োজন। খুব চৌকস নার্সিং সুবিধাসহ আধুনিক অক্সিজেন ডেলিভারি মেথড এবং দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা থাকাও দরকার। শুধু অক্সিজেন ডেলিভারির জন্যই নেজাল ক্যানুলা (এক

জাতীয় নাকের নল), মাস্ক, পার্শিয়াল রিব্রিদিং মাস্ক, ননব্রিদিং মাস্ক, হাই হিউমিডিটি মাস্ক, অক্সিমিট্রিসহ ব্লাড গ্যাস এ্যানালাইসিসের সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

এইচআইভি আক্রান্ত নারী গর্ভধারণ করলে নানাবিধ মানসিক জটিলতায় ভুগতে থাকে। আক্রান্ত মায়েরা যখন ব্যাপক সংখ্যক সমকামী এবং নানারকম নেশাগ্রহণকারীসহ সংখ্যাগুরু পুরুষদের দেখে, তখন এমনিতেই তারা ভয় ও লজ্জায় কুঁকড়িয়ে যায়। তারপর রোগের সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জেনে পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ ও অন্যান্যদের নিরাপত্তার কথা ভেবে গভীর উদ্বেগে আক্রান্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজেকে সে অচ্ছুত ও বোঝা বলেই মনে করে। এরপর যখন তার মাতৃত্বের ভূমিকাটি কেড়ে নেয়ার প্রসঙ্গটি ওঠে তখন সে নিজেকে ভয়ঙ্কর অপ্রয়োজনীয় ও ব্যর্থ মনে করে গুরুতর মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়।

এইডস রোগীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। তাদের সেরোস্ট্যাটাস পজিটিভ অথবা নেগেটিভ যাই হোক, জনস্বাস্থ্যের সাথে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ধারণা একীভূত করা প্রয়োজন। সেই সাথে তাদেরকে সামাজিকভাবে সুরক্ষা দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যাতে তারা ভীত হয়ে জনসমক্ষের আড়ালে পালিয়ে না বেড়ায়।

১৪.৯ এইচআইভি রোগ প্রতিষেধঃ

১৪.৯.১. ভাইরাস প্রবেশ প্রতিবন্ধক প্রয়োগ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (preventive therapy)

যাদের এইচআইভি-তে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই ক্যাটাগরির ব্যক্তিদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তা হল–

- ব্যারিয়ার প্রোফাইল্যাক্সিস এর সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাইরিসাইডাল প্রয়োগ,
- যৌনরোগ ও অন্যান্য কো-ফ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ,
- ইমিউন রেসপন্স মডিফায়ার প্রয়োগ।
- সেলিনিয়ামের মত এন্টি-অক্সিড্যান্ট ও ভিটামিন প্রয়োগ (কাপপা-বিটা ইনহিবিটর প্রয়োগ)।

১৪.৯.২ **প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসা** (Conventional Treatment)

হার্ট (HAART) থেরাপি প্রয়োগ। (Highly active anti-retroviral treatment)

১৪.৯.৩ **বিকল্প চিকিৎসা** (Non-conventional treatment)

এইডসে আক্রান্তদের মধ্যে যারা কোন ভাবে থেরাপি নিতে সক্ষম হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা দেয়া যায়।

- এন্টি-অক্সিড্যান্ট তথা কাপপা-বিটা ইনইবিটর প্রয়োগ
- মুখে স্বল্পমাত্রায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন প্রয়োগ
- এইডসের সহযোগী অসুখগুলোর যথাযথ চিকিৎসা।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, যেসমস্ত রোগীর দেহে এইডসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে তাদেরকে এন্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি দিতে হবে। তবে এ বিষয়ে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া প্রয়োজন তা হল–

- এ ধরনের থেরাপি কখন শুরু করতে হবে বা কাদের জন্য শুরু করতে হবে,
- শুরুতে কী ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে,
- কী প্রেক্ষাপটে চিকিৎসার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং
- চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতায় কী করতে হবে।

অনেকেই মনে করেন যে, রোগ সংক্রমণের তীব্রতা দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ আবার এটাও মনে করেন যে, এইচআইভি সংক্রমণের একেবারে শুরুতেই চিকিৎসা দেয়া ভাল।

শুরুতেই চিকিৎসা (early therapy) প্রয়োগের ব্যাপারে নানা বিতর্ক রয়েছে। কেননা, রোগের শুরুতে এন্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি দেয়ার প্রেক্ষাপটে রোগীর দেহে স্বাভাবিক ইমিউন রেসপন্স তৈরি বাধাগ্রস্ত হয় এবং শরীরে দ্রুত রেসিস্টেন্ট ভাইরাস বা ওষুধ প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ হয় না এমন ভাইরাস তৈরি হয়।

অনেকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে চিকিৎসা শুরু করার বিপক্ষে। তবে ভবিষ্যতে যদি কখনও অধিকতর কার্যকর কোন ওষুধ তৈরি হয়, যা কি না সম্পূর্ণভাবে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে, সেক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা যাবে।

লক্ষণবিহীন এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে কীভাবে ওষুধ প্রয়াগ করতে হবে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে CD_4 কোষের সংখ্যা পরিমাপের মাধ্যমে রোগের অবস্থা যাচাই করার পরই চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে।

কী পরিমাণ CD_4 কোষ থাকলে চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন–এ প্রশ্নের জবাব হল, CD_4 কোষের সংখ্যা দুশ'র কাছাকাছি এলেই চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বেশ ক'টি গাইডলাইন রয়েছে। এর একটি হল DHHS গাইডলাইন। অপরটি IAS-USA গাইডলাইন। এই গাইডলাইনের সুপারিশগুলো নিচে হুবহু উল্লেখ করা হল:

Indications to Initiate Anti-retroviral Therapy - DHHS Guidelines (July 1, 2001)

Clinical Category	CD_4 Cell Count	Plasma IV RNA	Recommendation
Symptomatic (AIDS or severe symptoms)	Any value	Any value	Treat
Asymptomatic AIDS	Any value	Any value	Treat
Asymptomatic	CD_4 200 to 350 cells/ mm^3	Any value	Treatment should usually be offered; controversy exists for patients with viral load 20,000 c/mL due to low probability of AIDS-defining diagnosis within 3 years.
Asymptomatic	CD4. 350/ mm^3	>30,000 (bDNA) or >55,000) Rt-PCR	Some experts would treat, since viral load at this threshold predicts a 3-year risk of AIDS of 30% despite high baseline CD_4 cell count. Some would defer therapy and monitor CD_4 cell count.

Indications for the Initiation of Anti-retroviral Therapy-IAS-USA Recommendations (JAMA 2000; 283:381)

CD_4 Count (Cells/ mm^3	Viral Loda (c/mL)		
	<5,000	5,000 to 30,000	>30,000
<350	Treat	Treat	Treat
350 to 500	Consider	Treat	Treat
>500	Defer	Consider	Treat

চিকিৎসা শুরুর আগে যেমন CD_4 সংখ্যাটি দেখে নেয়া প্রয়োজন, তেমনি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভাইরাল লোডটিও দেখে নেয়া দরকার। অনেকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভাইরাল লোডটির উপরই বেশি জোর দেয়া প্রয়োজন। ভাইরাল লোড প্রতি ঘন মিলিলিটারে ৩০ হাজারের উপরে হলে অবশ্যই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে CD_4 সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

হার্ট (HAART) থেরাপি দেয়ার পর রোগের উন্নতি বুঝবার জন্য CD_4 কোষের সংখ্যা পরিমাপের সাথে সাথে ভাইরাল লোডটিও দেখা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে CD_4 সংখ্যাটি চিকিৎসার প্রথম সপ্তাহে বেড়ে গেলেও পরবর্তীতে কমে আসে।

যা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে তা হল–

- দুটো নিউক্লিয়োসাইড ও একটি প্রোটিয়েস ইনহিবিটর (PI),
- দুটো নিউক্লিয়োসাইড এবং দুটি প্রোটিয়েস ইনহিবিটর,
- দুটো নিউক্লোয়োসাইড এবং একটি নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর (NNRTI)।

নতুন ধরনের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে তা হল–

ক) এক সাথে তিনটি নিউক্লিয়োসাইড,

খ) দুটো রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর (NRTIs), একটি প্রোটিয়েস ইনহিবিটর এবং একটি নন-রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর (NNRTI)।

চিকিৎসার পর CD_4 সংখ্যা দুশ'র উপরে উঠলে রোগীর অবস্থা ভাল মনে হলেও সব সময় এটি সত্যি নাও হতে পারে। তবে এই সংখ্যাটি পঞ্চাশের নিচে নেমে আসলে

ওষুধের কার্যকারিতা খুব ভাল হচ্ছে বলে মনে করা যাবে না।

১৪.১০.১ যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিবর্তন করতে হবেঃ

Recommendations for Changing Therapeutic Regimen (Modified from IAS-USA Recommendations. JAMA 2000; 283:381, JAMA 2000; 283:2417)

Clinical Presentation	**Recommendations**
Toxicity	
Virologic success	
Viral load above target before 8 to 16 weeks	Change offending drug
Viral load above target after 8 to 16 weeks	Change entire regimen or use resistance testing to guide drug selection
Virologic failure	
Viral load above target at 8 to 16 weeks	Continue regimen, check adherence and consider intensification
Viral load above target after 24 to 36 weeks	Change entire regimen, use resistance testing, or intensify
Viral “escape” after good suppression	Change entire regimen, use resistance testing, or intensify

১৪.১১.১ যে ধরনের পরিবর্তন কাম্য তা নিম্ন ছকে বর্ণিত হলঃ

Suggested Empiric Regimens for Patients who Failed Antiretroviral Therapy:

Prior Regimen	**New Regimen**
2 NRTIs + PI	2 new NRTLs plus NNRTI or Dual PLs (RTV+SQV, RTV+NFV+SQV, RTV+APV, LPV/RTV) or Triple-class regimen with 1 or 2 NRTLs

	plus NVP or EFV plus 1 or 2 Pls
1 NRTLs+N NRTI	2 new NRTIs+ 1 or 2 PLs
ABC + AZT + 3 TC	2 new NRTIs (ddi+d4T)+either PL or NNRTI
2 NRTLs	2 new NRTLs+PL or NNRTI

গর্ভকালীন অবস্থায় এইডস আক্রান্ত মাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভাইরাল লোডের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা, মায়ের শরীরে ভাইরাল লোড কম থাকলেই অনাগত শিশুকে নিরাপদ রাখা যাবে। এক্ষেত্রে গর্ভকালীন মায়ের রক্তে CD_4 সংখ্যা যাই হোক না কেন কিংবা ভাইরাল লোডের সংখ্যা যাই থাকুক না কেন, তা কমিয়ে নেয়াই হবে চিকিৎসার লক্ষ্য।

এইডস আক্রান্ত গর্ভবর্তী মাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে ওষুধটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে তা হল AZT। AZT এবং NVP জাতীয় এন্টি-রেট্রোভাইরাল ওষুধগুলো মায়ের শরীর থেকে অনাগত শিশুর দেহে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। মায়ের ভাইরাল লোড প্রতি ঘন মিলিলিটারে ১০০০-এর বেশি হলে পেট কেটে বা সিজারিয়ান সেকশানের মাধ্যমে ডেলিভারি করানো উচিত।

গর্ভাবস্থায় যে এন্টি রেটোভাইরাল ড্রাগগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি থাকে সেগুলো হল–

- ddI+d_4T, EFV এবং
- হাইড্রক্সিইউরিয়া

ddI+d_4T একেবারেই পরিহার করা উচিত। কেননা এতে করে ল্যাক্টিক অ্যাসিডোসিস এবং যকৃতের টক্সিসিটির কারণে মাদের মৃত্যু হতে পারে। প্রথম তিনমাসের মধ্যে EFV প্রয়োগের ক্ষেত্রে টেরাটোজনিক প্রতিক্রিয়া দেয়া দেয়। হাইড্রক্সিইউরিয়াও সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা উচিত।

উল্লেখপঞ্জি

অ

অর্গানিক মেন্টাল ডিজঅর্ডার ১২.৪
অর্গানিক মুড ডিজঅর্ডার ১২.৪
অর্গানিক সাইকোসিস ১২.৪
অর্গানিক মুড সিনড্রম ১২.৪.৩
অর্গানিক ম্যানিয়াক সিনড্রম ১২.৪.৩
অটাইটিস মিডিয়া ৫.২.১
অলিগোস্যাকারাইড ১৪.৩.১০
অকুপেশনাল এক্সপোজার ৯.৪.১
অটো-সাজেশন ১৪.৬.১

অগ্রদূত (gag-pol precursor) প্রোটিন ১.৪.২
অস্টিওমাইলাইটিস, ৫.৮.১
অক্সিডাইজিং এজেন্ট ১০.৩.১
অক্সিমিট্রিসহ ব্লাড গ্যাস এ্যানালাইসিস ১৪.৮.১
অন্তর্মুখী (Introversion) ১২.৩.১
অস্থিরমতি (Instability) ১২.৩.১

আ

আইসোলেশন ১.১২.১, ৬.২.১
আইসিএল ২.৮.১
আইসোসপোরিয়াসিস ৪.১০.১, ৫.২.১
আইসোসপোরা (isospora) ৪.৫.২
আইইউডি (IUD) ১০.২.২
আইসিইউ ১৪.৮.১
আনস্প্লাইসড আরএনএ ১.৪.২
আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্টেস ১৪.৩.৪
আরএনএ ডিকয়েস ১৪.৪.৩
আরজিনাইন ১৪.৩.৪
আরএনএ ডোমেন১৪.৪.২
আলসারো-নেক্রোটাইজিং জিনজিভাইটিস ৪.৭.১
আয়োডিন ৯.২.৩, ১০.২.২
অ্যাকটিভ ইমিউনাইজেশন ১১.৪.৩
অ্যানোজেনাইটাল কন্ডাইলোমাটা ৫.১১.২
অ্যাপথাস আলসার ৫.১.১
অ্যামপ্লিফিকেশন ৬.৪.১
অ্যালকহল ৮.১০.২, ১০.৫.২, ১২.৪.৩, ১২.৪.৬, ১২.৪
অ্যারিদমিয়া ১৪.৮.১
অ্যাসপারজিলোসিস ৫.৮.১, ৫.২.১, ১৩.১১.১
অ্যাস্পারজিলাস নাইজার (A. Niger), ৫.৮.১
অ্যাসপারজিলাস ফ্ল্যাভাস (A. Flavus) ৫.৮.১
অ্যাস্পারজিলাস ফিউমিগেটাস ৫.৮.১
অ্যাসপারটাইল প্রোটিয়াস ১৪.৪.৩
অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই (AFB) ৬.৬.৩
অ্যাসেম্বলি (Assembly) ১.৪.২
অ্যাপোপটোসিস (apoptosis) ১৪.৩.৭
অ্যারোমেটিক সি-নাইট্রোসো যৌগ ১৪.৪.২

ই

ইকোলাই ২.৮.১, ৮.১৫.১
ইডিয়োপ্যাথিক সিডি-৪, ১.৬.৩
ইথামবুটল (Ethambutol) ৫.৭.১
ইথামবুটল ও রিফামপিসিন ৫.৭.১
ইনফেকশাস মনোনিউক্লিয়োসিস ৪.২.২, ৪.৪.১
ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিস ৫.৮.১
ইনফ্লুয়েঞ্জাতে এমপিসিলিন ৫.৪.১
ইনকিউবিশন পিরিয়ড ১.৭.২
ইনভেসিভ সারভাইকাল ক্যান্সার ৫.১১.২
ইনসুলিন ১০.৫.১, ১৪.৫.৪, ১৪.৫.১
ইন্টারলিউকিন-৬, ১০.২.২
ইনহিবিটর ১০.২.২, ৯.৬.৩, ১৪.৩.১০

ইনফরমেশনাল সাপোর্ট, ১৪.৭
ইনটেনসিভ ক্লিনিক্যাল কেয়ার ট্রিটমেন্ট ১৪.৮.১
ইএমভি ১৪.১.১
ইমিউন রেসপন্স মডিফায়ার ১৪.৯.১, ১০.১.৩
ইমিউনিটি ১৪.৬.১, ১৪.৩.৬, ১.১৩.১, ১.১৫.৫, ৫.৮.১, ৭.১.১, ৯.৬.১,১৩.১২.২
ইমিউন রেসপন্স ১৪.৯.৩, ১০.২.১
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ১.১.২, ২.৮.১,১৪.৮.১
ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট সাইক্লোসপোরিনের রিসেপ্টর ১৪.৩.১১
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম ৪.১০.১, ২.৬.১, ৫.৩.১
ইমিউন সিস্টেম ১.১.২, ১.১৫.৩, ১.১৪.১
ইমিউনোলজিক্যালি ক্রস রিয়্যাকটিভ ১.৬.৩
ইমিউনোসাপ্রেসিভ ১.১৪.১
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ২.৬.১
ইমিউনোফ্লুরেসেন্স এ্যাসে ৬.২.১
ইমিউনোসাপ্রেশন ৬.৬.১, ৮.৮.১
ইমিউনোগ্লোবিউলিন ৯.৬.১, ৯.৬.৫, ১১.৪.৩
ইমিউনাইজেশন ১১.৪.১
ইমিউনোলজিক মনিটরিং ১১.৪.২
ইমিউন কম্প্রোমাইজড্ ১৩.১৪.১
ইমোশনাল সাপোর্ট, ১৪.৭
ইরিথ্রোমাইসিন ৫.৪.১
ইবিভি ইনফেকশন, ৮.৪.১
ইলিউশন ১২.৪.১
ইলেক্ট্রোলাইট ১৪.৮.১
ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স ১৪.৮.১
ইসোফ্যাজিয়াইল ক্যান্ডিডিয়াসিস ২.৭.১, ৪.১.১
ইসোফ্যাজাইটিস, ৫.৮.১
ইট্রাকোনাজল (Itraconazole) ৫.৮.১
ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট ২.৮.১
ইন্টিগ্রেশন ১.৪.২
ইন্টিগ্রেস প্রোটিন ১.৪.৩, ১৪.৪.৩
ইন্টিগ্রেটেড প্রোভাইরাস ১.৪.২
ইন্ট্রোভারশন ১২.৩.৪
ইন্ডিনাভির (Indinavir) ৯.৬.৩, ৯.৬.৫

উ

উইন্ডো পিরিয়ড ৪.১.১

এ

এইচআইভি'র মিউটেশন ১.৪.১
এইচআইভি এনভেলপ-সিডি-৪ বাইন্ডিং ১.৪.২
এইচআইভি চক্র ১.৪.২
এইচআইভি ল্যাটেন্সি ১.১১.১
এইচআইভি সেরোপজিটিভ ৪.৫.২
এইচআইভি সেরোনেগেটিভ ৪.১.১
এইচআইভি ডিমেনশিয়া ৫.৯.১
এইচটিএলভি-১ ২.৮.১, ২.৮.১
এইচআইভি এন্টিবডি টেস্ট ৬.১.১, ৬.৫.১
এইচআইভি এন্টিজেন টেস্ট ৬.১.১

এইচআইভি স্ক্রিনিং ৬.২.১, ৬.৭.১, ১৩.১৬.৪, ১০.১.১, ৩.২.১, ১.১২.১
এইচআইভি এন্টিবডি ৬.২.১, ৬.৭.১
এইচআইভি ব্লট টেস্ট ৬.২.১
এইচআইভি এন্টিজেন ৬.৩.১
এইচআইভি মিউটেট ৮.১০.১
এইচআইভি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ৯.৬.৩
এইচআইভি ইনফেকশন ১০.১.২
এইচআইভি এনক্যাফালোপ্যাথি ১২.৪.৩,১২.৪
এইচআইভি স্ট্যাটাস ১৩.১৬.৩, ১৩.১৬.৪
এইচআইভি ইন্টিগ্রেস প্রোটিন ১৪.৩.৩
এইচআইভি ট্রান্সক্রিপশন ১৪.৩.৭
এইচআইভি নিউক্লিয়োক্যাপসিড প্রোটিন ১৪.৪.২
এইচআইভি প্রোটিয়াস ১৪.৪.৩
এইডস এপিডেমিক ১০.১.৪
এমআইপি-১ আলফা ১.১৪.১
এমআইপি বিটা ১.১৪.১
এমপিসিলিন, ৫.৬.১
এমফেটামাইন ৮.৮.১
এমালনাইট্রেট ৮.৩.১, ৮.৮.১
এমাইনো অ্যাসিড ১৪.৩.১০
এনজাইম ১.৬.২,৫.৩.১, ১৪.৪.৩, ১৪.৬.১
এনকেফালোপ্যাথি ২.৭.১, ৪.১০.১, ৬.১.১,
এনভেলপ প্রোটিন ১.৪.৩
এনকেফালাইটিস, ২.৬.১, ১৩.১২.১
এনডেমিক ৫.১০.১
এনক্যাপসুলেটেড ব্যাক্টেরিয়া ৫.২.১
এনক্যাপসুলেটেড ব্যাক্টেরিয়াজনিত নিউমোনিয়া ৫.৪.১
এনভেলাপ গ্লাইকোপ্রোটিন ১৪.১.১
এনথ্রাকুইনন ১৪.১.১
এন-টার্মিনাল ১৪.৩.১০
এনভেলাপ প্রোটিন ১৪.৩.১০
এন-বিউটাইল ডিঅক্সিনোজাইরিমাইসিন ১৪.৩.১০
এনালফিশার ৭.১.১
এনিমিয়া, ১৪.৫.২
এনোল এপোক্সি ১৪.৩.৪
এলডিএইচ (LDH) ৫.৩.১, ৫.৪.১
এলভিয়োলাই (alveoli) ৫.৩.১, ৫.৮.১
এলাইজা ৬.২.১, ৫.৩.১, ২.২.১
এলাইজা নেগেটিভ ৬.৩.১
এলাইজা টেস্ট ৬.৫.১
এলাইজা ও স্ক্রিনিং ৬.৩.১
এলাইজা ফর এইচআইভি ৬.৬.১
এসপারটাইল প্রোটিয়েস ১.৪.৫
এসটিএলভি-১, ১.৮.৩
এসসিডি-৪ (sCD_4) ১৪.৪.১
এসসিডি-৪ ও পিএ এক্সোটক্সিন ১৪.৪.১
এসেটাইলস্টেইন (acetylcysteine) ১৪.৩.৭
এ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫.৭.১
এজেডটি ১৪.২.২

এটিভারডাইন (atevirdine) ১৪.২.৩
এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া ১৪.৮.১
এন্টিজেন ১.১৪.১, ৬.৬.১, ৪.১০.১
এন্টিবডি ৪.১.১, ৬.৩.১
এন্টি-এইচআইভি ড্রাগ ৯.৩.১
এন্টিজেনিমিয়া ১১.২.১
এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি ১১.৪.২, ১৪.৩.১, ১৪.৯.৩, ১৪.৩.৮
এন্টি-ডিপ্রেস্যান্ট থেরাপি ১২.৪.৪
এন্টিরেট্রোভাইরাল ১২.৪.৬, ১১.৪.৩, ১৪.১১.১, ১৪.৩.৯, ১৪.৫.১
এন্টি-অক্সিড্যান্ট ১৪.৩.৪, ১৪.৩.৭, ১৪.৯.৩, ১৪.৯.১
এন্টিসেন্স অলিগোনিউক্লিটিডস, ১৪.৪.৩
এন্টেরিক পরজীবী (Enteric parasite) ৭.৪.১
এন্টেরাইটিস (enteritis)- ৪.৫.১
এপিডেমিক ২.৭.১, ২.১.১
এপিস্টেইন বার ভাইরাস ৪.২.২, ৬.৬.২, ৭.১ ৭.১.১
এভিয়াম কমপ্লেক্স ৪.৩.১
এভিয়ান সারকোমা ২.৬.১
এক্সট্রা-পালমোনারি সংক্রমণ ৫.৩.১
এন্ডোসকপি ৪.১০.১
এন্ডোকারডাইটিস, ৫.৮.১
এ্যারেফ্লেক্সিয়া (Areflexia) ৫.৯.১
এ্যামোক্সোসিলিন ৫.৪.১
এ্যানোজেনাইটাল নিয়োপ্লাসিয়া ৫.১১.২
এ্যানাল ওয়ার্টস ৭.৩.১
এ্যানোরোবিক ১০.৩.১
এন্টিবায়োটিক ১০.২.২
এ্যন্ডোমেট্রিয়াল (Endometrial) ১০.২.২
এ্যামফেটামাইন, ১২.৪.৩, ১২.৪.৬
এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার ১২.৪.৬, ১২.৪.৭
এ্যাংজাইটি ১২.৪.৪
এম্ফোটেরিসিন-বি ৫.৮.১
ও

ওয়েস্টার্ণ ব্লট টেস্ট ১.১২.১, ৬.৬.১, ৬.৩.১
ওয়েস্টিং সিনড্রম ২.৭.১, ৪.১০.১, ৪.৫.১
ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ৪.১.১
ওরাল সেক্স, ৮.৩.২
ওয়ার্টস ৫.১১.২
ওয়াটার বেজড লুব্রিকেন্ট ১০.১.৩

ক

করোনা ভাইরাস ১.৬.১
কক্কিডিয়ান ইনফেকশন ৪.৫.২
কক্কিডিয়ইডোমাইকোসিস ৪.১০.১, ৫.২.১
কমিউনিটি বেজড্ নিউমোনিয়া ৫.৩.১
কনসেন্ট্রেটেড ৯.৯.১
কম্বিনেশন ১১.৩.১
কম্বিনেশন থেরাপি ও মনোথেরাপি ১১.৪.২

কনভারজেন থেরাপি ১৪.২.৩
কানিলিঙ্গাস ৮.৩.১
কার্বোক্সিমেথ (meth) ৮.১০.২
কাপপা বিটা ইনহিবিটর ১৪.৩.৪, ১৪.৯.১, ১৪.৯.৩
কারকিউমেন ১৪.৬.১
কার্ডিয়োমায়োপ্যাথি, ১৪.৫.২
কিডনি ডায়ালাইসিস ৯.৮.১
কেমোকাইনস (chemokines) ১.১৪.১
কেটো/এনোল এপোক্সি (Keto/Enol Epoxy)
স্টেরয়েড ১৪.৩.৪ **
কো-রিসিপ্টর ১.১৪.১
কো-ফ্যাক্টর ২.৮.১, ৭.১.১, ১৩.১৪.১
কো-ফ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ১৪.৯.১
কোকেন, ১২.৪.৩, ১২.৪.৬, ১২.৪, ৮.৮.১
ক্যান্ডিডিয়াসিস ৭.৩.১, ৫.১১.২, ৫.১.১, ৫.২.১, ৪.১০.১
ক্যান্ডিডা ৬.৬.২, ৫.১১.২
ক্যার্ডিয়াক মনিটরিং ১১.৩.১
ক্যাপসিড গ্যাগ প্রোটিন ১.১.৩, ১.৪.২
ক্যাফিন ১২.৪.৭
ক্যাফোসিস সারকোমা ৪.১.১, ৪.৩.১, ৪.৭.১, ৪.১০.১, ২.২.১, ২.৪.১, ২.৭.১, ৫.১১.১, ৫.১০.১, ৬.৬.১, ৬.৬.১, ৬.৬.৩, ৭.৩.১, ৭.৪.১, ৮.৪.১
ক্যারিয়ার স্টেট (carrier state) ১.৬.৩
ক্যারিয়ার ১.৮.৩, ১.৬.৩
ক্যারিবিয়ান ৮.২.১
ক্যালসিয়াম ১.৬.৩
ক্যান্সার, ৪.৫.১, ১.১৫.৪
ক্রস রেসিসট্যান্স ১৪.২.২
ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রম ৪.৪.১
ক্রনিক ডায়রিয়া ৪.১.১
ক্রিপ্টোকক্কোসিস ৪.১.১, ৪.১০.১, ৫.২.১, ৫.১.১, ৬.৬.১, ২.৭.১, ২.২.১,
ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস ৪.১০.১, ৬.৬.১, ৪.৫.১, ৫.২.১
ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস ৪.১.১
ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম ৪.৫.২, ৫.১.১, ৬.৬.২
ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস ৬.৬.১
ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স ৫.৯.১, ১৩.১২.২
ক্রিপ্টোকক্কাস ১৩.১২.২
ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ১.৪.২
ক্ল্যামাইডিয়া ৪.১.১, ৩.৩.১, ৭.১, ৭.১.১, ৭.২.১, ৮.৪.১, ১০.৩.১, ২.৩.১
ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫.৭.১
ক্লষ্ট্রিডিয়াম ৯.৯.১
ক্ল্যামাইডিয়া সিটসেই (Psittaci) ১৩.১২.২
ক্লিনিক্যাল কেস ডেফিনিশন ৪.১.১
ক্লিনডামাইসিন (Clindamycin) ৫.৩.১
ক্লিনিশিয়ান ৯.৬.৩
ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ১০.১.১

ক্লোরামফেনিকল ৫.৬.১

গ

গনোরিয়া ৩.৩.১, ২.৩.১,৭.১, ৭.১.১, ৮.৩.২, ৮.৪.১, ১০.৩.১
গর্ভফুল ৬.৭.১
গিনিপিগ ৫.৩.১
গ্যাগ প্রোটিন (gag protein) ১.১.৩
গ্যাগ-পোল ভাইরাল পলিপ্রোটিন ১.৪.২
গ্যাগ পোল প্রিকারস ১.৪.২
গ্রাম (Gram) ৫.৩.১
গ্যাসট্রো এন্টারাইটিস ৫.৬.১
গ্যাগ পলিপ্রোটিন ১৪.৪.৩, ১৪.৩.১০
গ্লুকোসাইডেস ১৪.৩.১০
গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর ১৪.৩.১০
গ্লুকোজ ১৪.৫.১
গ্লাইকোপ্রোটিন ১.৪.২

জ

জিন এক্সপ্রেশন (Gene expression) ১.৪.২
জিমসা (Giemsa), ৫.৩.১
জিডোভুডিন ৫.১১.২, ৬.৫.১, ৯.৩.১, ৯.৬.৩, ৯.৬.৫, ১১.৩.১, ১১.৫.২, ১১.৪.২, ১২.৪.৩, ১৪.২.২
জিঙ্ক ফিংগারস (zinc fingers) ১৪.৪.২
জিঙ্ক ফিঙ্গারের মিউটেশন ১৪.৪.২
জুনোসিস (Zoonosis) ২.৬.১
জেনেটিক ৮.৬.১
জেনোটাইপ ৫.১১.২
জেনোমিক ভাইরাল ডিএনএ
জেনোম ১.৪.২
জেনিটাল আলসার ৩.৩.১
জেনোটাইপিক এ্যাসে ৬.৬.১
জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ৬.৪.১
জেনাইটাল আলসার ৭.১
জেনেটিক ট্রেইট ১২.৩.৫

ট

টক্সিন ১.১৪.১
টক্সোপ্লাজমোসিস ৪.১০.১, ৪.৯.১, ৪.৮.১, ৫.১.১, ৫.২.১, ৬.৬.১, ১৩.১২.২, ২.৭.১
টক্সোপ্লাজমা গোনাডি ৫.৩.১
টক্সোপ্লাজমোসিস টাইটার ৫.৯.১
টক্সোপ্লজমোসিস এন্টিবডি ৬.৬.৩
টক্সোপ্লাজমা সিস্ট ১৩.১২.২
টক্সিসিটি ১৪.৩.১, ১৪.৮.১, ১৪.১১.১
টক্সিন ১৪.৪.১
টাইফয়েড, ১৩.৭.১
হার্ট (HAART) থেরাপি ৬.৬.১
টি-হেলপার লিম্ফোসাইট ৬.৬.২, ৬.২.১, ১.২.১, ১.১.২, ১.২.৩, ১.১৪.১, ১১.৪.১

টি-সেল ৬.৫.১
টি-কোষ ৫.৩.১
টিএমপি-এসএমএক্স ৫.৬.১
ট্রিপানোসোম (Trypanosome) ৫.৩.১
টিউবারকিউলোসিস ৪.৩.১, ৪.১০.১
টিটেনাস, ৪.৬.১
টি-হেলপার মনোসাইট ১.২.২, ১.১.২, ১.২.৩, ১১.৫.১
টি-কোষ রিসিপ্টর ১.১৪.১
টি-হেলপার ১.১৪.১
টি-সাপ্রেসর ১.১৫.৩, ১.১৫.৫, ১.১৫.২
টি-লিম্ফোসাইটোপেনিয়া ১.৬.৩
টিবো (tibo), ১৪.২.৩
টিউমার নেক্রোসিস ১৪.৩.৪
টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা ১৪.৩.৪
টিএনএফ-আলফা ১৪.৩.৫
টেরাটোজনিক ১৪.১১.১
ট্রান্সমেমব্রেন এনভেলপ ১.১.৩
ট্রান্সফার আরএনএ ১.১.৩
ট্রাইকোমোনিয়াসিস ৩.৩.১, ৪.১.১
ট্রাইমেট্রেক্সেট (Trimetrexate ৫.৩.১
ট্রাইমেথোপ্রিম সালফামেথোক্সাজল ৫.৩.১, ৫.৪.১
ট্রেমার (Tremor) ৫.৯.১
ট্রাইমেথোপ্রিম ১১.৪.২
ট্যাট (tat) ১৪.৩.৪
ট্রাই-ফসফেট ১৪.২.২
ট্রান্সকিপটেস ফ্যাক্টর ১৪.৩.৬
ট্রান্সঅ্যাক্টিভিশন (transactivation) ১৪.৩.৪
ট্রেস এলিমেন্ট ১৪.৬.১

ড

ডাই-হাইড্রোফলেট রিডাক্টেস ইনহিবিটর ৫.৩.১
ডাইডিয়োক্সিনিউক্লিয়োসাইড থাইমিডিন ১৪.২.২
ডাইডিয়োক্সিনিউক্লিয়োসাইড ১৪.২.২
ডায়ালাইসিস ৯.৮.১
ডায়রিয়া ১৩.১২.২
ডায়াফ্রাম ১০.১.৩, ১০.২.২
ডায়াবেটিক মেলাইটাস (mellitus) ১৪.৫.৪
ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস ১৪.৫.৪
ডিডিআই (ddi) ১৪.২.২
ডিডিসি (ddC) ১৪.২.২
ডিএনএ পলিমারেস ১৪.২.৩, ১৪.৩.১
ডিএনএ কমপ্লেক্স ১.৪.২
ডিপথেরিয়া, ৪.৬.১
ডিমেনশিয়া কমপ্লেক্স ৪.৯.১
ডি-কনজেসটেন্ট ১২.৪.৬
ডিমেনশিয়া ১২.৪
ডেলিরিয়াম ১২.৪.১, ১২.৪
ডেক্সট্রানসালফেট ১৪.১.১
ডেলিভারি সিস্টেম ১৪.৪.৪
ডিপ্রেশন ১২.৪.৩

ডিপ্রেসিভ সিনড্রম ১২.৪.৭
ডুক্রি (Ducreye) ৭.১.১
ডেন্টাল ড্যাম ৮.৩.২
ড্যাপসোন (Dapsone) ৫.৩.১
ড্রপলেট ইনফেকশন ৪.৩.১
ড্রাই হিট ৯.৯.১
ড্রাগ রিয়্যাকশন ৯.৬.৫
ড্রেনেজ ১৪.৮.১

থ

থাইমাস (Thymus) ১.১৪.১, ১.১৫.৫
থাইরয়েড, ৫.৩.১
থ্যালিডোমাইড (Thalidomide) ১৪.৩.৫

ন

নন-ফাংশনাল রিসিপ্টর ১.১৪.১
নন-হিউম্যান করোনা ভাইরাস ২.৬.১, ১৩.১২.২
নন-টাইফিমিউরিয়াম সালমোনেলা, ৫.৬.১
ননক্সিনল-৯, ১০.২.২
নরট্রিপটানিল ১২.৪.৭
ননব্রিদিং মাস্ক, ১৪.৮.১
নন-রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর ১৪.৯.৩
নন-নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটর ১৪.৫.৩,১৪.৫.১, ১৪.৯.৩, ১৪.৫.২
নন-নিউক্লিয়োসাইড আরটিআই, ১৪.২.১
নন-স্পেসিফিক ভ্যাজাইনাইটিস ৩.৩.১
নিউক্লিয়াস ১.৪.২
নিউক্লিয়োপ্রোটিন ১.১.৩, ১.৪.২
নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ১.১.৩, ১.৪.২
নিউক্লিয়োক্যাপসিড গ্যাগ প্রোটিন ১.১.৩
নিউক্লিয়োপ্রোটিন কমপ্লেক্স ১.৪.৩
নিউমোনিয়া ১২.৪.৬, ১৩.১২.২, ১১.৩.১, ১১.৪.১, ১১.৪.২, ২.৪.১, ৪.৩.১, ৪.৫.২, ৪.১০.১, ৫.৩.১, ৮.১০.২, ৫.৪.১, ৫.২.১, ৫.৩.১
নিকোটিন, ১২.৪.৬
নিউমোসিসটিস ৪.১০.১
নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া ৪.৩.১, ৬.৬.৩, ৪.১০.১, ৫.১.১, ৫.৩.১, ২.২.১
নিউমোসিসটিস ক্যারিনি ৪.৩.১, ৫.২.১, ৫.৩.১, ৫.৪.১, ১৪.৮.১
নিমোকক্কাস নিউমোনিয়া ৫.৪.১
নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ৫.১১.১
নিউক্লিয়োপ্রোটিন কমপ্লেক্সের আরএনএ ১৪.২.১
নিউক্লিয়োসাইড ১৪.২.১, ১৪.২.২, ১৪.৯.৩, ১৪.৫.১, ১৪.৫.২
নিউক্লিয়োসাইড এনালগ ১৪.২.২, ১৪.৫.২
নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বাইন্ডিং প্রোটিন ১৪.৪.২
নিউক্লিয়োক্যাপসিড ১৪.৪.২
নিউক্লিয়ার কাপপা-বিটা ইনহিবিটর ১৪.৪.৩
নিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস

নিট্রোপ্যানিয়া ১৪.৫.২
নিম এক্সট্রাক্ট ১৪.৬.১
নিউরোপ্যাথি, ১৪.৫.২
নিউক্লিয়োসাইড এনালগ ১৪.৫.২
নিউক্লিয়াস ফ্যাক্টর কাপপা বিটা ১৪.৩.৪
নেলফিনাভির ৯.৬.৫, ৯.৬.৩
নেক্রোটিক হারপেস জোস্টার ৪.৭.১
নেভিরাপাইন (nevirapine), ১৪.২.৩
নেগেটিভ ১৪.৮.১
নেজাল ক্যানুলা ১৪.৮.১
নোঙ্গর গ্লাইসিন ১৪.৩.১০
নোটিফাইয়েবল ডিজিজ ১০.৬.৩

প

পলিয়ানিয়োনিক (polyanionic) ১৪.১.১
পলিমারেস চেইন রিয়্যাকশন ২.২.১, ১১.৪.১, ৬.৪.১
পজিটিভ ব্যান্ডস ৬.৩.১
পলিমারেস এনজাইম ৬.৩.১
পটাশিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট ১০.৩.১
পলিইউরেথিন ১০.১.৩
পাইরিট্রেক্সিম (Piritrexim) ৫.৩.১
পাইরোফসফেট (pyrophosphate) ১৪.৩.১
পাইরিডনস (pyridones) ১৪.২.৩
পার্শিয়াল রিব্রিদিং মাস্ক, ১৪.৮.১
পারফিউশন ৮.১০.২
পারফরমিং ১৩.১৩.২
পাস্তরাইজেশন ১.৬.১, ৫.৬.১
পার্টুসিস, ৪.৬.১
পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার ১২.২.১
পিসিপি জাতীয় নিউমোনিয়া ১২.৪.৩
পিরামিডাল ট্র্যাক সাইন ৫.৯.১
পিটুইটারি ৫.৩.১
পি-২৪ এন্টিজেন ৬.৬.১
পিসিপি, ৬.৬.১
পিইপি (Post exposure prophylaxis) ৯.৩.১
পেপটাইড (Peptide) ১.৪.৬
পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, ৩.৩.১, ৫.১১.২, ৮.১৩.১
পেরিকারডাইটিস ৫.১০.১, ৫.২.১
পেনিসিলিন ৫.৪.১
পেন্টামিডিন (Pentamidine) ৫.৩.১
পেরিফেরাল ভিশনও ৪.৮.১
পেথিডিন ৮.১৭.১
পোভিডন-আয়োডিন ৯.২.৩
পোলিও, ৪.৬.১
পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ১৪.৫.২
পেপটিডোমিমেটিক ইনহিবিটর ১৪.৪.৩
পেনটোক্সিফাইলাইন ১৪.৩.৫
পোল জিন ১৪.৩.৯

পোলপ্রোটিন (pol protein) ১.১.৩
পোস্ট এক্সপোজার ট্রিটমেন্ট ৯.৬.৪,৯.৩.২, ৯.৬.৫
প্রাইমাকুইন (Primaquine) ৫.৩.১
প্রাইমারি ব্যাক্টেরেমিয়া৫.২.১
প্রি-ইন্টিগ্রেশন কমপ্লেক্স ১.৪.৬
প্রিম্যাচিউরড্ ডেলিভারি ১১.৪.২
প্রুরাইটিক প্যাপুলার ইরাপশন ৬.৬.১
প্রুরাইটিক ম্যাকুলো প্যাপুলার ৪.৭.১
প্রুরাইটিক ডার্মাটাইটিস, ৪.১.১
প্রুরাইটিক ম্যাকুলো প্যাপুলার র‍্যাশ ৪.৭.১
প্রোটোজোয়া ৫.৩.১, ২.৪.১
প্রোটিন সিনথেসিস ১.১১.১
প্রোভাইরাস ১.৪.২
প্রোভাইরাল ডিএনএ ১.১৪.১
প্রোভাইরাল ট্রান্সক্রিপশন ১.৪.২
প্রোভাইরিয়ন ১.৪.২
প্রোগ্রেসিভ জেনারালাইজড লিম্ফাডেনোপ্যাথি ৪.৪.১
প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনক্যাফালোপ্যাথি ৪.১০.১
প্রোটিয়াস ইনহিবিটর ১১.৪.২, ১৪.৪.৩, ১৪.৫.৪, ১৪.৫.১, ১৪.৯.৩, ৯.৬.৩, ৯.৬.৫
প্রোটিয়াস ১৪.৪.৩
প্রোটিন, ১৪.৬.১
প্যানডেমিক ২.২.১, ১৩.৯.২
প্যাপিলোমা ভাইরাস ৮.৭.৩
প্যাপিলোমা, ৮.৪.১
প্যারাসাইট ১৩.১২.১
প্যারাসাইট টক্সোপ্লাজমা ১৩.১২.২
প্যানক্রিয়াটাইটিস ১৪.৫.২
প্লীহা ১.৬.৩
প্লাসেন্টা ৬.৭.১
প্লাসেবো ট্রিটমেন্ট ৬.৫.১

ফ

ফলস্ পজিটিভ (False positive) ৬.২.১
ফটোঅক্সিডেশন ১০.২.১, ১৪.১.১
ফসফরাইজেশন ১৪.২.২
ফসফোডাইস্টার (Phosphodiester) ১৪.২.২
ফটোঅ্যাকটিভ কম্পাউন্ড ১৪.১.১
ফাংগাল ফিলামেন্ট ৬.৬.৩
ফিউশন ১.৪.৬
ফিডব্যাক মেকানিজম ১.১৫.৩
ফিমেল কনডমের লুব্রিকেন্ট ৮.৫.১
ফিল্টার ১৪.৮.১
ফুসফুসে চাকা (Consolidation) ৫.৮.১
ফেলাইন (Feline) ২.৬.১
ফোকাল অ্যাবনরমালিটি ৬.৬.৩
ফ্যামিলি প্ল্যানিং ১০.৬.১
ফ্লু ভাইরাস ১.৬.১
ফ্ল্যাকচুয়েটিং মুড ১২.৩.২

ভ

ভগাঙ্কুর ৮.৯.১
ভাইরাল আরএনএ ১.৪.২
ভাইরাল জেনোমিক আরএনএ ১.১.৩
ভাইরাল ডিএনএ কমপ্লেক্স ১.৪.২
ভাইরাল প্রোটিয়েস ১.৪.৩, ১.৪.৫, ১৪.৩.১০
ভাইরাল নিউক্লিয়োপ্রোটিন ১.৪.৬
ভাইরাল ডিএনএ সিনথেসিস ১.৪.৬
ভাইরাস পার্টিকেল ১.১১.১, ১৪.৩.৮
ভাইরাস বার্ডেন ১.১১.১
ভাইরেমিয়া ১.১৪.১
ভাইরাস আইসোলেশন (isolation) ৬.১.১
ভাইরাল এন্টিজেন ৬.২.১
ভাইরাল লোড ৬.২.১, ৬.৬.১, ১৪.৯.৩, ১৪.১১.১, ১১.২.১, ১১.৪.১
ভাইরাসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ৬.৪.১
ভাইরিসাইডাল ৮.৫.১, ৯.২.৩, ১০.২.১, ১০.২.২, ১৪.৯.১
ভাইরাল ভিরুলেন্স (Virulence) ৮.১০.১
ভাইরাস ৮.১০.১
ভাইরেমিয়া ১১.২.১
ভাইরাল ট্রান্সমিশন ১১.২.১
ভাইরাস ভ্যাকসিন ৯.৬.৫
ভাইরাস ফিউশন ১৪.১.১
ভাইরাল জিন এক্সপ্রেশন ১৪.৩.৭, ১৪.৩.৪
ভাইরাল আরএনএ ট্রান্সক্রিপট ১৪.৩.৪, ১.৪.২
ভাইরাস রেগুলেটরি প্রোটিন ১৪.৩.৮
ভাইরাল ক্যাপসিড ১৪.৩.১০
ভাইরাল ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার ১৪.৩.১০
ভাইরাল প্রোটিন ১৪.৩.১০
ভাইরাল এনভেলাপ ১৪.৪.১
ভাইরাসের মিউটেশন ১৪.২.৩
ভাইরাল রেসিসটেন্স ১৪.২.৩
ভাইরাল ডিএনএ ১৪.৩.৩
ভাইরাল ট্রান্সক্রিপশনটি প্রোভাইরাস ১৪.৩.৪
ভাইরাল জিন ১৪.৩.৪
ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের এলটিআর সেগমেন্ট ১৪.৩.৪
ভাইরিয়ন উদ্গমন ১৪.৩.১০
ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশন অব এইচআইভি ১১.১.১
ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশন ১১.২.১, ১১.৪.২
ভারটিক্যাল ট্রান্সমিশন এইচআইভি-১ ২.৩.১
ভিসনা (Visna) ২.৬.১
ভিরুলেন্স ৮.১০.১
ভেরিসেলা-জোস্টার ৫.২.১
ভেনট্রিক্যাল ১১.৩.১
ভেন্টিলেটার ১৪.৮.১
ভ্যাজাইনাটিস ৩.৩.১
ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস ৩.৩.১
ভ্যাজাইনাল ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ৩.৩.১

ভ্যাজাইনাল ইস্ট-৭.৩.১
ভ্যাকসিন ৯.৬.২

ম

মরফিন, ৮.১৭.১
মনোনিউক্লিয়ার ১৪.৩.৫
মনোসাইট ১০.২.২, ১.৪.৬, ১.২.৩, ৭.১.১
মনোনিউক্লিয়োসিস ৪.২.২
মস্তিষ্কের টক্সোপ্লাজমোসিস ৬.৬.৩
মাদাগাস্কার, ২.৩.১
মাইলাইটিস ২.৬.১
মাইকোব্যাক্টেরিয়াম ৪.৩.১, ৪.১০.১, ৫.২.১
মাইক্রোসকপি ৪.১০.১
মাইক্রোসপোরিডিয়া ৬.৬.২, ৫.১.১
মাইকোব্যাক্টেরিয়োসিস ৬.৬.৩
মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ৪.১০.১, ৫.২.১
মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স ৫.১০.১, ৫.২.১, ২.৭.১, ৫.৭.১, ৪.১০.১
মাইক্রন ৫.৩.১
মাইক্রো লেভেল ইউভি ৮.১৫.১
মাইরিসটোয়েল ১৪.৩.১০
মাইরিস্টোয়লেশন সিগন্যাল ১৪.৩.১০
মাইরিসটিক ১৪.৩.১০
মাইট্রোকন্ড্রিয়াল টক্সিডিটি ১৪.৫.২
মাইক্রোঅর্গানিজম ১৪.৬.১
মাইরিস্টোয়লেশন ব্লকেট (blocket) ১৪.৩.১০
মাইরিস্টোয়লেটেড প্রোটিন নেট ১৪.৩.১০
মায়োপ্যাথি, ১৪.৫.২
মাম্পস, ৪.৬.১
মাস্ট কোষ (M-cell) ৮.৬.১, ৮.৬.২
মাস্ক, ১৪.৮.১
মার্কারি (Hg) ৬.৬.৩
মিউকোসা ১০.২.২, ৮.৬.২, ৮.৩.১,৭.৩.১, ২.৫১, ৮.৬.১
মিউটিলিশন (mutilation) ৮.৭.৩
মিনিমাম ডোজ ৮.১০.১
মিউকাস ৬.৬.৩
মিউটেশন ১.১৪.১, ২.৮.১, ২.৬.১
মিথাইলেশন ১৪.৩.১০
মিথাইল ১৪.৩.১০
মুড ডিজঅর্ডার ১২.৪.৩
মেডিটেশন ১৪.৬.১
মেডিক্যাল ইমারজেন্সি ১৪.৮.১
মেটাবোলিক ১২.৪.১
মেটাবোলিক এনজাইম ১.১.৫
মেডিক্যাল ডিভাইস ৯.৫.১
মেমব্রেন ফিউশন ১.৪.২
মেডিয়েটর ১.১৪.১
মেট্রিক্স প্রোটিন ১.৪.৬
মেমব্রেন ফিউশন ১.৪.২

মেসেঞ্জার আরএনএ ১.৪.২
মেনিনজাইটিস ৫.৯.১, ৫.৮.১, ৫.২.১, ১০.৬.৩, ১৩.১২.১
মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার ১০.১.৩
মোটিভেশন প্রোগ্রাম ১০.৬.১
মেডিয়েস্টানাইটিস (Mediastinitis) ৫.২.১
মোরাক্সেলা ক্যাটারেলিস ৫.২.১
ম্যাচুরেশন (Maturation) ১.৪.২
ম্যাট্রিক্স গ্যাগ প্রোটিন ১.১.৩, ১.৪.২
ম্যাক্রোফেজ ১.২.২, ১.২.৩, ১.১৪.১, ১১.৫.১, ১০.২.২
ম্যাজিক জনসন ৮.১৪.৪
ম্যানিয়াক ডিজঅর্ডার ১২.৪.৩
ম্যালেরিয়া, ১৩.১২.১
ম্যাট্রিক্স ক্যাপসিড ১৪.৩.১০

র
রবোজাইমগুলো ক্যাটালাইটিক আরএনএ মলিকুল ১৪.৪.৩
রাইসিন-এ (ricin-A) ১৪.৪.১
রাইবোসোমাল ফ্রেমশিফটিং ১৪.৩.৯
রাইবোসোমাল কমপ্লেক্স ১৪.৩.১০
রাইট স্টেইন (Wright Stain) ৫.৩.১
রাইবোজোম ১.১.৫
রিয়ালিটি (Reality) ১০.১.৩
রিস্ক ফ্যাক্টর ১০.৩.১
রিক্যাপিং (recapping) ৯.৫.১
রিসেপ্টিভ ৮.৬.১
রিঅ্যাকটিভ ব্যান্ডস ৬.৩.১
রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন (RT) ১.৪.২, ১৪.২.১
রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এনজাইম ১.৪.২
রিভার্স ট্রান্সক্রিপটর ১.৬.২
রিপ্লিকেটেড (replicated) ১.১৪.১
রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ১.৪.৩, ১৪.৪.৩, ১৪.২.২, ১৪.২.২, ১৪.২.৩, ৬.৩.১, ১.৪.২
রিফামপিসিন (Rifampicin) ৫.৮.১, ৫.৭.১
রিপ্রোডাক্টিভ হরমোন ৫.১১.২
রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস ইনহিবিটর, ১৪.৫.১,১৪.৯.৩
রেটিনোপ্যাথি ৫.৯.১
রেট্রোভাইরাস ৬.৩.১, ২.৬.১, ১.৩.১, ১.১.৩, ১.৬.৩, ১.৪.৫, ১.৬.২
রেটিনা ৬.৬.৩
রেকারেন্ট হারপেস জোস্টার ৮.৪.১
রেডিয়েশন মিউটেশন ৮.১৫.১
রেট্রোভাইরাস মিউটেশন ২.৬.১, ২.৮.১
রেনটিস (RENTES) ১.১৪.১
রেট্রোভাইরাল ডিএনএ ১.৪.২
রেসিস্টেন্ট ভাইরাস ১৪.৯.৩
রেটিনাইটিস ১৪.৩.১
রেসপিরেটরি সেকশন ১৪.৮.১

রোচালিমিয়া (Rochalimaea) ৫.২.১, ৫.৫.১

ল

লসিকা ১.১০.১
লসিকগ্রন্থি ১.১১.১, ৪.১.১, ৪.২.১, ১.৬.৩
লাইপোপ্রোটিন ক্যাপসুল ১.১.৫
লিম্ফোমা ৪.১০.১, ৫.৮.১, ১.৬.৩, ৪.৯.১
লিউকোপ্লাকিয়া ৪.৭.১
লিউকোমিয়া ১.৬.২, ৫.৮.১, ৫.৩.১
লিউকোভোরিন (Leucovorin) ৫.৩.১
লিম্ফনোড ৫.৫.১, ৫.৩.১, ৬.৬.১
লিনিয়ার ডাবল স্ট্রানডেড ডিএনএ ১.৪.২
লিপসুজ (Lipshultz) ১১.৩.১
লিমগ্ল্যান্ড ১.৬.৩, ১.১০.১
লিভার ১.৬.৩
লিম্ফাডেনোপ্যাথি সিনড্রম ৪.৪.১
লিম্ফোসাইট ৭.১.১
লিম্ফএ্যাডোনোপ্যাথি,৭.৩.১
লিভিং সাপোর্ট ১৪.৭
লেসবিয়ান ৮.৩.৩
লোকাল এন্টিমাইক্রোবায়াল ১০.২.২
ল্যাটেন্সি ১.১১.১
ল্যাবিয়া ৫.১১.২
ল্যাঙ্গারহ্যান্স (langerhans) ৮.৬.১
ল্যাটেক্স ব্যারিয়ার ৮.৩.২
ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ ৮.৬.২
ল্যামিভুডিন ৯.৬.৩
ল্যাবে পিপেটিং ৯.১.১
ল্যাটেক্স ১০.১.৩, ১০.২.২, ১৩.৪.১
ল্যাটেক্স গ্ল্যাভস ১৩.৫.৪
ল্যাকটিক এ্যাসিডেমিয়া ১৪.৫.১, ১৪.৫.২
ল্যাব কনসেনট্রেশন ১৪.১.১
ল্যাক্টিক অ্যাসিডোসিস ১৪.১১.১

ব

বহির্মুখী (Extroversion) ১২.৩.১
বাইপোলার ডিজঅর্ডার ১২.৪.৩
বাডিং ১.৪.২
বারংবার ক্যান্ডিডা ইসোফ্যাজাইটিস ৪.১০.১
বায়োসেইফ ১৪.৮.১
বায়োসেইফটি ম্যানুয়াল ১৪.৮.১
বিটাল্যাকটামেস ৫.৪.১
বি ভাইরাস ভ্যাকসিন ৯.৩.২, ৯.৬.১
বুটালনাইট্রেট ৮.৩.১,৮.৮.১
বেনজোডায়াজেপিন ১২.৪.৪
বেঞ্জোডায়াজেপিন কম্পাউন্ড ট্যাট ১৪.৩.৪
ব্রঙ্কোসকপি ৪.১০.১
ব্যাক্টেরিয়া, ৪.৫.২
ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়া ৪.৫.২, ৫.৪.১, ৫.১১.২
ব্যাসিলারি এ্যানজিয়োম্যাটোসিস ৫.৫.১, ১৩.১২.২

ব্রুসেলা ১৩.৭.১
ব্রুসেলোসিস ১৩.৭.১
ব্রেন অ্যাবসেস ৫.৮.১
ব্রেন স্ক্যান ৬.১.১
ব্লট টেস্ট ৬.২.১
ব্যারিয়ার প্রোফাইল্যাক্সিস ১৪.৯.১

শ

শিম্পাঞ্জি ২.৫.১
শ্বেতকণিকার টি-লিম্ফোসাইট ১.২.৩
শ্লেষ্মা ৬.৬.৩,১৩.২.৩

স

সমকামী ৮.১৭.১
সাইটোপ্লাজম ১.৪.৩, ১.৪.২, ১.৪.৬
সাইটোপ্লাজমিক এক্সপ্রেশন ১.৪.২
সাইটোকাইনস ১.১৪.১, ১৪.৩.২
সাইটোটক্সিক টি-লিম্ফোসাইট ১.১৪.১
সাইটোটক্সিক-টি ১.১৫.৪, ১.১৫.২
সাইটোমেগালোভাইরাস ২.২.১, ২.৭.১, ৪.১০.১, ৫.২.১, ৫.১.১, ৬.৬.২, ৭.৪.১, ৭.১
সাইটোলজি ৪.১০.১
সালমোনেলা সেপটিসেমিয়া ৪.১০.১
সাইনোসাইটিস, ৫.৮.১, ৫.২.৯
সাইটোমেগালো ভাইরাস রেটিনাইটিস ৬.৬.৩
সাইটোকাইনস ভাইরাসের আরএনএ ট্রান্সক্রিপশন ১৪.৩.৪
সাইক্লোফাইলিন ১৪.৩.১১
সাইক্লোসপোরিন গ্যাগ ১৪.৩.১১
সাইটোকাইন ১৪.৩.৬
সাইক্রিয়াটিক সার্ভিস ১২.৩.২
সাইকোসিস, ১২.৪
সাইকোথেরাপি ১২.৪.৪
সারভিক্সের মিউকোসা ৮.১৩.১, ১০.১.৪
সারভাইক্যাল একটোপি (Ectopy) ৮.১৩.১
সারভাইক্যাল প্যাপস্মিয়ার ৭.৩.১
সারভাইক্যাল ইন্ট্রাইপিথেলিয়াল নিয়োপ্লাসিয়া ৭.৩.১
সারভাইক্যাল ক্যান্সার ৭.৩.১, ৫.১১.২, ৪.১০.১
সারভাইক্যাল ইনফেকশন ৪.১.১
সারভাইক্যাল ইনট্রাএপিথেলিয়াল নিয়োপ্লাসিস ৫.১১.২
সারভাইক্যাল ওয়ার্টস ৫.১১.২
সালমোনেলা ৫.২.১, ৫.৬.১, ৬.১.১, ১৩.৭.১
সালমোনেলা এন্টারাইটিডিস ৫.৬.১
সালমোনেলা অ্যারিজোনিয়া ৫.৬.১
সালমোনেলা ডাবলিন ৫.৬.১
সালফামেথোক্সজল ১১.৪.২
সার্জিক্যাল ৯.৩.২, ৯.৮.১, ১৪.৮.১
সারফেস এন্টিজেন ৯.৩.২
সার্ভিল্যান্স ৩.১.১
সার্ভিক্স ৪.১.১, ৪.৫.১, ১০.২.২, ১০.২.১

সারভাইক্যাল ১০.২.২
সার্ভিক্যাল ক্যাপ ১০.১.৩
স্মিগমা (Smigma) ১০.৪.১
সিমেন এন্টিবডি ১০.৩.১
সিফিলিস
১০.৩,৮.৪.১,৫.১১.২,৭.১,৭.১,১৪.৮.১,৩.৩.১,৫.২.১,
২.৩.১,৮.৩.২, ৬.৯.১
সিএমভি (সাইটো মেগলো ভাইরাস) ৮.৩.২, ৫.১১.১,
১৪.৩.১
সিএমভি ইনফেকশন, ৮.৪.১
সিডি-৪ লিম্ফোসাইট, ৬.৬.১
সিফিলিস ৬.৯.১
সিএমভি রেটিনাইটিস ৪.৮.১
সিডিসি ৫.১১.২
সিফিলিস-গনোরিয়া ৫.১১.১
সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৫.৭.১
সিফিলিসজনিত কন্ডাইলোমাটা ৫.১১.২
স্লিমডিজিজ ৪.১.১, ২.২.১
স্টিভেন জনসন সিনড্রম ১৪.৫.৩
সিনথেসিস ১৪.৩.৫
সিজারিয়ান সেকশন ১৪.১১.১
সিডি-৪ রিসিপ্টর ১৪.১.১
সিউডোমোনাস অ্যারুজিনোসা এক্সোটক্সিন ১৪.৪.১
সিনক্রোনাইজড ১৪.৬.১
সিনড্রম (syndrome) ১.১.২, ১৩.৭.১
সিসিআর-৫ কো-রিসিপ্টর ১.১৪.১
সিসিআর-৫ ১.১৪.১
সিস্ট ৫.৩.১
সিস্টবহির্ভূত স্পোরোজয়েড ৫.৩.১
সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ২.৩.১, ২.৫.১,
২.৬.১
সি ভাইরাস ইমিউনিটি ৯.৬.১
সুইমিং পুলে ক্লোরিন ১৩.১৩.৩
সুস্থিরমতি (Stability) ১২.৩.১
সেরোডিসকর্ডেন্ট ১০.১.২
সেরোপজিটিভ ১০.২.১, ১১.৪.১, ৫.১১,২
সেডেটিং এন্টিডিপ্রেস্যান্ট ১২.৪.৭
স্টেরয়েড ১২.৪.৩
সেপসিস (Sepsis) ১৩.৭.১
সেলিনিয়াম ১৪.৩.৪, ১৪.৯.১
সেরোস্ট্যাটাস পজিটিভ ১৪.৮.১
সেল মেমব্রেন ১.৪.২, ১৪.১.১
সেরাম ল্যাকটেট লেভেল ১৪.৫.২
সেরাম বাইকার্বনেট ১৪.৫.২
স্টেরয়েড ১৪.৩.৪
স্টেরিলাইজেশন ১.৬.১, ৯.৯.১, ৯.৮.১, ১৪.৮.১
সেরোকনভারশন ১.৭.২, ১.১৪.১, ৪.১.১, ৪.২.৩,
স্পেসিমেন ৪.১০.১
সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, ৪.৭.১
সেরোনেগেটিভ ১.৯.১, ৫.৪.১

সেরামে এইচআইভি এন্টিবডি ২.২.১
সেফট্রায়াক্সন (Ceftrixone) ৫.৬.১
স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া ৫.২.১
সেপসিস ৫.৬.১
সেপটিক আর্থারাইটিস৫.২.১
স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া ৫.৩.১
সেফালোসপেরিন ৫.৬.১, ৫.৪.১
সেফুরক্সিন ৫.৪.১
সেরোপজিটিভ হেমোফাইলিয়াক্স ৭.২.১
সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ ৭.৪.১
স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা ৭.৩.১
সোয়াজিল্যান্ড ২.৩.১
সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ১৩.৩.১,১৩.১১.১
স্ট্যাবিলিটি ১২.৩.৪
স্ট্রেইন ২.৮.১.
স্পাইরোকিট জাতীয় ৫.২.১
স্প্লাইসড এমআরএনএ ১.৪.২
স্পারমিসাইড (Sparmicides) ৮.৩.১
স্যালাইভা ৮.১০.১

হ

হজকিন ডিজিজ ৫.৩.১
হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ১৪.১.১, ১৪.৯.৩, ১০.২.২, ১০.২.১
হাইপেরিসিন (Hypericin) ১৪.১.১
হাই হিউমিডিটি মাস্ক, ১৪.৮.১
হাইড্রক্সিইউরিয়া ১৪.১১.১
হাইব্রিড কম্পাউন্ড ১৪.৪.১
হাইপো এ্যালবুমেনিমিয়া ১৪.৮.১
হাইপারগ্লাইসেমিয়া ১৪.৫.৪
হাইপোক্লোরাইট ১৩.৩.১
হারপেস জোস্টার ৪.২.১, ৪.১০.১, ৪.১.১, ৪.৭.১, ৬.৬.১
হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ৪.১০.১, ১৪.৩.১, ৭.৪.১, ৬.৬.২
হারপেস সিমপ্লেক্স ৪.১০.১, ৪.৭.১, ৫.১১.২, ৫.২.১, ৮.৩.২, ২.৭.১, ১.৮.৩
হারপেস, ৮.৭.৩, ৭.১.১
হারপেস ভ্যাজাইনাইটিস বা এইচএসভি-২, ৩.৩.১
হারপেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ-২, ৭.১
হারপেস জোস্টার ভাইরাস ৭.১, ৭.৪.১
হার্ট (HAART) থেরাপি ১৪.৯.২, ১৪.৯.৩
হিস্পানি ২.৭.১.
হিউম্যান টি-কোষ লিউকোমিয়া ১.৬.৩
হিউম্যান-টি লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস টাইপ-১, ৭.১
হিউমান টি-লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস ৭.৪.১
হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম ১৩.১২.২
হিউম্যান লিম্ফোসাইটিক ৮.৪.১
হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ৫.১১.২
হিসটোপ্লাজমোসিস (Histoplasmosis) ৫.২.১

হিসটোলজি, ৪.১০.১
হৃৎপিন্ড ১৪.৮.১
হেটেরোসেক্সুয়াল ২.৭.১, ২.৩১, ৩.১.১, ৪.১০.১,
৮.৩.৪, ৭.৩.১, ১১.২.১, ৫.১১.২
হেমোফাইলিয়াক্স ২.৩.১, ৫.৪.১, ১.৯.২
হেপাটাইটিস ‘এ’ ভাইরাস ১.৬.১
হেপাটাইটিস ১৩.৭.১, ১০.৬.৩, ৩.১.১
হেপাটাইটিস-বি ৩.৩.১,৯.৬.১,৯.৩.২,৯.৬.৬,
৯.৬.৫,৮.৩.২,৮.৮.১, ৭.২.১,৭.১, ৭.৪.১
হেপাটিক স্ট্যাটোসিস (statosis) ১৪.৫.২
হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস ৬.৬.২
হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস (HCV) ৯.৪.১
হেপাটাইটিস-বি ইমিউনোগ্লোবিউলিন ৯.৬.১, ৯.৬.২
হেপাটাইটিস-বি সারফেস এন্টিজেন ৯.৬.১
হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন ৯.৬.২
হেপাটাইটিস-ই (HBe Ag) ৯.৩.২
হেপাটাইটিস-সি ৭.১, ৭.২.১
হেলিকোব্যাক্টার পাইলরি ১৪.৬.১
হেমোফাইলিয়া ৭.১.১, ৭.২.১, ৮.২.১, ৮.৪.১, ১৪.৫.৪
হেমোরয়েড (পাইলস) ৭.১.১
হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ৫.২.১, ৫.৩.১, ৫.৪.১
হেরোইন, ৮.৮.১
হেমোগ্লোবিন ৮.১০.২
হোমোসেক্সুয়াল ৮.৬.৩
হোস্ট সেল ট্রান্সক্রিপটেস ১৪.৩.৪
হ্যান্ডগ্ল্যাভস ১৩.৪.১
হোস্ট ক্রোমোজম ১.৪.২
হোস্ট ক্রমোজোমাল DNA ১.৪.৩

ফ্লাপ ও কভার পৃষ্ঠা

ডা. এম এ হাসানের জন্ম ১৯৫০ সনের ১৪ মার্চ। তিনি মূলত: একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং কৌতুহলউদ্দীপক। তাঁর গবেষণার বিষয় ‘অরিজিন অব লাইফ’ থেকে ‘ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন’, মাইক্রোবাইলজি, ইমিউনোলজি ও টক্রিকোলজিসহ নানা বিষয়ে বিস্তৃত। তিনি যেমন আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে তাঁর উদ্ভাবিত

নানা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছেন তেমনি দূষণের কারণ হিসাবে জলাবদ্ধতা ও অনুজীবের ভূমিকা প্রথম শনাক্ত করেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সন পর্যন্ত এক দশকের বেশী সময় ধরে তিনি একদিকে যেমন অ্যালার্জি অ্যাজমার উপর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্টাডিটি চালিয়েছেন অপরদিকে প্যাপিলোমা, হারপেস, এইডস ভাইরাসের উপর কাজ করেছেন। নতুন রোগ শনাক্তকরণ, রোগের লক্ষণ এবং নানা রোগ নিরাময়ের পেছনে ছুটা তার অন্তহীন নেশা। এ কারণেই তিনি হোচিমিন সিটির একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইনফেকশাস ডিজিজ ও ডেঙ্গু ভাইরাস নিয়ে কাজ করেছেন।

এইডস এপিডিমিওলজিও এইডস রোগের সাশ্রয়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা পত্রটি আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ এরং আমেরিকান হেলথ ডিপার্টমেন্টের এইডস ডিভিশনের বিজ্ঞানীরা রিভিউ করেছেন। তাঁর নানামুখী গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ডা. এম এ হাসান আরসকি্ এর সভাপতি ও প্রধান বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করার সাথে সাথে অ্যালার্জি অ্যাজমা রোগের গবেষক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কভার পৃষ্ঠার পেছনের পাতা

Date: 24 July 2002

Dear Dr. M.A. Hasan:

Thank you for your recent e-mail to Dr. Anthony Fauci, Director, National Institute of Allergy and

Infectious Diseases (NIAID) regarding your low cost AIDS preventive drug. Because the Division of AIDS, within the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, has the primary responsibility for basic and clinical research on HIV/AIDS at the National Institute of Health, your letter was forwarded to my office for reply.

NIAID keeps an open mind with respect to all the suggestions received regarding potential treatments and cures for AIDS. We are dedicated to advancing biomedical research and welcome the opportunity to learn more about your work. Please send any literature relevant to your work in the HIV/AIDS and we will circulate this information to our scientific staff for review. Because of the massive volume of information and inquiries received daily, you will be contacted only if there is interest or if additional information is required.....

.... Again thank you for sharing this information with us. HIV disease is of the highest concern to the Public Health Service. With the dedication of researchers around the world such as yourse lf, we hope to find ways to prevent, treat, and cure this devastating disease.

Sincerely,

Jonathan Kagan,
Ph.D.
Deputy Director
Division of AIDS
6700 B Rockledge Drive,
Room 4 140 MSC
7620 Bethesda,
MD 20892